গীতবিতানের আরশীনগর

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

একুশশতক

১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০

প্রচ্ছদ : অধ্যাপক অনুপম গুপ্ত

প্রকাশক
একুশ শতক
সুমিত্রা কুণ্ডু
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স
৫১এ, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

গীতবিতান-প্রবেশার্থীদের উদ্দেশে

সূচীপত্র

প্রারম্ভিক

(১)

কথা ও সুর- উভয়ের যুগ্ম উপাদানে রবীন্দ্রসংগীতের সৃষ্টি। তার আস্বাদনেও তাই প্রয়োজন কথা ও সুরের যুগপৎ অনুধাবন। তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে কেবল কাব্য হিসেবেও এর আস্বাদন সম্ভব। গীতাঞ্জলির সেই সুরবিহীন কাব্যপাঠশ্রবণেই পশ্চিমের জ্ঞানীগুণী শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং নোবেল পুরস্কারও এসেছে গীতাঞ্জলির কাব্যগুণেরই কারণে।

ইতিপূর্বে কয়েকটি গ্রন্থে আমি গীতবিতানের গানের সুর বিষয়ে, আলোচনা করেছি। বর্তমান আলোচনাটি এর কাব্য সম্পদবিষয়ক।

সুদীর্ঘ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-জীবনে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে নানা ভাবনা নানা চিন্তা মনে এসেছে। কিছু নানা প্রবন্ধে ও গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। সে সবের পরিমার্জিত রূপ ছাড়াও আরও কিছু প্রবন্ধ নিয়ে এ গ্রন্থের প্রকাশ।

এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রসংগীতচর্চা যতটা শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্যে, তার চেয়ে বেশী করণীয় পাঠক/গায়কের নিজের আনন্দলাভের জন্যে। এই আনন্দের খবর গীতবিতানেই আছে। তবে তার জন্যে পাঠকের ও গায়কের কিছু প্রস্তুতি বা সাধনারও প্রয়োজন আছে। কারণ,

"লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবিরে ঠাঁই— দেখরে চেয়ে আপন পানে,- পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই।"

এই পদ্ম-আসনটিকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত না করলে আনন্দ-লক্ষ্মী ফিরে যাবেন।

রবীন্দ্রনাথ গীতবিতানেই প্রকাশিত হয়েছেন সবচেয়ে বেশী। তাই গীতবিতানের গানগুলির সনিষ্ঠ অধ্যয়ন প্রয়োজন। গীতা-র ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়— 'সুগীতা কর্তব্যা গীতা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ'- রবীন্দ্রনাথের গানগুলির ক্ষেত্রেও তেমনি ভাবা উচিত।

গীতবিতানকে আমার মনে হয়েছে লালন-কথিত-'আরশীনগর'। শব্দটি শুধু লালনেরই আবিষ্কার নয়— উপনিষদ-গীতার কথাও। 'আত্মনি আত্মনা আত্মানং'। গীতবিতানেও আছে বিশ্বকবির ও বিশ্বজনের আত্মানুসন্ধান ও উপলব্ধির কথা। আরও সহজ, আরো মরমী ভঙ্গিতে। সে কারণেই চাই পাঠকের/গায়কের সনিষ্ঠ সাধনা।

রবীন্দ্রসংগীতের সুরকে বোঝবার জন্যে যেমন রাগরাগিণী গাওয়া ও শোনা প্রয়োজন,— এর ভাব-সম্পদকে পাবার জন্যেও তেমন প্রয়োজন নিবিড় অধ্যয়ন।

এখানে কয়েকটি গান আলোচনা করছি যার মধ্যে পাঠকের গীতবিতান সাধনার কিছু আদর্শ পাওয়া যেতে পারে।

(২)

শোক-দুঃখ-মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ কিছু নেতিমূলক ব্যাপার বলে মনে করেননি। তাঁর ধারণায় 'দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গো বাঁধা।' ('দুঃখ')। সৃষ্টি যদি পূর্ণ হত তাহলে হয়তো দুঃখ ব্যাপারটার অস্তিত্ব-ই থাকত না। কিন্তু তা কী করে হবে। জগৎ মানেই যা গতিশীল, যা স্থানু নয় ;— যা গতিশীল, তাকে তো এগোতে হয়। আর এগোতে গেলে তাকে অবশ্যই, শুধু মৃত্যুতে নয়, জীবনেও, বারবার 'বাসাংসি জীর্ণানি' পরিত্যাগ করতে হয়। এই পরিত্যাগটাই দুঃখ! যে পা সামনে বাড়াই তাকে পেছনে নিয়ে উঠিয়ে না আনলে তো চলাই হয় না। এরই নাম গতি বা প্রগতি— যা কিনা পূর্ণের আশায় পূর্ণের লক্ষ্যে ছুটে চলারই নাম।

সৃষ্টির অর্ধাংশ হল দুঃখ। 'সংসার' শব্দটির অর্থেও আছে প্রবাহ-আছে ওঠা ও পড়া-যার ভাবার্থ দাঁড়ায় ভাঙা ও গড়া। ভাঙা ও গড়া-র নিরন্তর ধাবমানতা। সুতরাং দুঃখকে এড়াই কী করে?

সংসারকে দুঃখময় দেখে বুদ্ধদেব শেষ পর্যন্ত নির্বাণেই সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। যুদ্ধাদি-বিধ্বস্ত ইউরোপে এক হতাশাময় দুঃসময়ে জন্মেছিলেন নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক Schopenhouer —। সে সময়ের যুগবাণী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল-Death, the only victor of all wars. জয়ের আশায় যুদ্ধ। অথচ নিরানন্দ সেই জয় হয়ে দাঁড়াল বড়োই রক্তাক্ত। সমগ্র ইউরোপের আশা ভরসা বিশ্বাস—নিঃশেষ। তাঁর দর্শন ছিল—জগৎটা দুঃখময়। দুঃখ-মৃত্যুর কোনো সুরাহা করতে না পেরে ওই বুদ্ধের নির্বাণকেই পরম গতি বলে মেনে নিলেন তিনি—যার মানে একেবারেই থেমে যাওয়া! কিন্তু জগৎটাতো থেমে থাকেনি তার পরেও। ওই দুঃখ ও সুখের চক্রাবর্তন তো স্তব্ধ হয়ে যায়নি আজও।

তাই বলে কি দুঃখের সমাধান নেই? রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিন্তার মধ্যেই দুঃখের সমাধান পেয়েছিলেন। '...যিনি সুখকর তাঁকে প্রণাম করো এবং যিনি দুঃখকর তাঁকেও প্রণাম করো।' (নমঃ শম্ভবায়, ময়োভবায় চ।)

রবীন্দ্রনাথ নাস্তিক ছিলেন না, সামগ্রিক অস্তিত্বের মধ্যে জড়িত ছিলেন। তিনি সেই অস্তিত্বের গোটা স্বরূপটাকেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ইতি নেতি—দুইই তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। সুখের মাঝে যাকে দেখেছেন, দুঃখে তাকেই প্রাণভরে পেয়েছেন। দুঃসাহসী এই কবি তাই দুঃখকে সম্পদে পরিবর্তিত করে নিতে পেরেছিলেন।—

আমরা যেভাবে শোক অশ্রু বেদনা প্রভৃতিকে দেখি, রবীন্দ্ররচনায় তারা কিন্তু ভিন্ন অর্থ বহন করে। তাই তাঁর বিভিন্ন রচনা/গান-এর বাস্তব উৎস-প্রেরণার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দেওয়াই ভালো। কোনো ঘটনার সূত্রে বা কোনো নারীর প্রেরণায় বা অন্য কোনো বাস্তব কারণে কোনো গান যদি রচিত হয়ে থাকে—তবে গাওয়া বা শোনার সময় তা স্মরণে রাখলে গাওয়া বা শোনা দু-ই ব্যর্থ হয়। যেন মনে রাখি, সৃষ্টি নিরালম্ব নয়, আকাশকুসুম নয়—তার উৎসে মাটি-গোবর থাকে, কিন্তু পরিণতিতে সে 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি/কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী' হয়ে ওঠে। উৎসগত সুখ-দুঃখ ও অন্যান্য অনুষঙ্গ নিছক আনন্দে পরিণত হয়। সে জন্যেই আমি এ কথাই

বলতে চাই যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধিতে সহায়ক হলেও গান গাওয়া বা শোনার সময় ওই জ্ঞানটি ভুলে যেতে হবে— যদি গানের সত্যিকার আনন্দকে পেতে চাই।

(৩)

আমাদের সুখ-দুঃখ যতক্ষণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকে ততক্ষণ তার সঙ্গে অন্যের, অর্থাৎ পাঠক/শ্রোতা জনতার কোনো সম্পর্ক থাকে না। আত্মীয় প্রতিবেশীরা হাসিকান্নার সমব্যথী হন, আসা-যাওয়া করেন, এবং দুদিন পরে সে সব ঘটনা ভুলেও যান। কিন্তু সুখ-দুঃখের এই ঘটনাই যখন শব্দে-বাক্যে-সুরে সমর্পিত হয়ে সাহিত্যে গানে রূপ নেয় তখন তা আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকে না, তা তখন বৃহত্তর মানব সমাজ ও বৃহত্তর কালবৃত্তে স্থান পায়। সে ক্ষেত্রে পাঠক তার উৎস বা উপাদান-কারণের সন্ধান করার প্রয়োজন বোধ করেন না। করা উচিতও নয়। Shakespeare কখনো Venice গিয়েছিলেন কিনা তা না জেনেও তাঁর নাটক উপভোগে অসুবিধে হয় না। কেউ কেউ মাঝে মাঝে কোনো বিশেষ সৃষ্টির অনুপ্রেরক কারণকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে পাঠক সমাজের কিছু যায় আসে না। বিশেষত বড়ো স্রষ্টাদের বড়ো মাপের সৃষ্টির পাঠকেরা লেখকের নাম পর্যন্ত ভুলে গেলেও কিছু ইতর বিশেষ হয় না। সৃষ্টির আনন্দটাই আসল কথা।

প্রাচীন গুহাচিত্রগুলির শিল্পীদের নাম পর্যন্ত আমাদের অজানা, কিন্তু সে সব শিল্পের সৌন্দর্যাস্বাদনে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে 'শেষ সপ্তক' কাব্যের ৮ সংখ্যক কবিতায় অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই অজানা শিল্পীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

"হে অনামা, হে রূপের তাপস,
প্রণাম করি তোমাদের।
নামের মায়াবন্ধন থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়েছি
তোমাদের এই যুগান্তরের কীর্তিতে।
নাম-ক্ষালন যে পবিত্র অন্ধকারে ডুব দিয়ে
তোমাদের সাধনাকে করেছিলে নির্মল,
সেই অন্ধকারের মহিমাকে
আমি আজ বন্দনা করি।'

...

"সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।"

আর আমাদের বহুপঠিত পঙ্‌ক্তিগুলিও মনে পড়ে :—

'এত কাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে,—
এখন আমারে লহ করুণা করে।
ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই-ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।...
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।' (সোনার তরী)।

কবি জানেন সেই 'নাম-ক্ষালন পবিত্র অন্ধকার'কে ; জানেন,—কালের সোনার তরীতে স্রষ্টার স্থান হয় না —কেবল তাঁর সৃষ্টিই থাকে।

লেখকেরা তাঁদের বেদনাকে তাই প্রকাশ করেন তার বাস্তব গন্ধটিকে নেপথ্যে রেখে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন—"বাগানে কত গাছ, গাছে কত ডাল,— এসব হিসাবে তোমার কাজ কী? তুমি বাগানে আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও।' এ কথা পণ্ডিতেরাও মানেন। অবশ্য রসিক হবার যোগ্যতা অর্জনের জন্যও কিছু সাধনা দরকার। রবীন্দ্রনাথ মানে তাঁর কবিতা বা গান। সেটুকু আস্বাদন করার জন্যে কিছু প্রাথমিক সাধনা অবশ্যই প্রয়োজন। তবে মানুষের গবেষণা বৃত্তি, কৌতূহল প্রবৃত্তি অধিক মাত্রায় বেড়ে গেলে জ্ঞান যতই বাড়ুক না কেন অন্তর্গত আনন্দকে পাওয়া যায় না, এজন্য রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন-'কবিরে পাবে না কবির জীবনচরিতে।'

(৪)

আশ্বিন ১৩২১। ইংরেজি ১৯১৪, অক্টোবর। রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন গয়ায়। এর মধ্যে একদিন বারবরা পাহাড় দেখতে যাবার ইচ্ছে হল। স্থানীয় এক ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথকে বারবরা পাহাড় যাবার জন্যে খুবই উৎসাহিত করলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁকে নির্ভর করে যাত্রা শুরু করলেন। গয়া থেকে বেলা স্টেশন পর্যন্ত রেলে গিয়ে তার পরে অনেক কষ্টে এক পালকি যোগাড় করে রবীন্দ্রনাথকে পালকিতে চড়িয়ে সেই ভদ্রলোক পদব্রজে চললেন। এদিকে মাইলের পর মাইল গরমে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে কবি চলেছেন তো চলেছেনই। কোথায় বারবরা পাহাড়। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে কবি যখন যাত্রা স্থগিত রেখে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন সে ভদ্রলোক বেপাত্তা। কিন্তু, এমন বিরক্তির মধ্যেও কবি তাঁর আপন ভাষা ভোলেননি—অর্থাৎ গান। সে অবস্থায় তিনি লিখলেন-"সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি ; দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।'-যখন তাঁর রুদ্ররসের কিংবা করুণ রসের গান লেখার কথা, অথবা কোনো গানই যখন তাঁর কাছে প্রত্যাশা করা যায় না, —তখন তিনি লিখলেন এক শান্তরসের গান। তাতে কোথায় বারবরা যাত্রার ক্লান্তি ও বিরক্তি! সে গানে ফুটে উঠেছে জন্মান্তরের অনন্ত যাত্রার কথা:—

"নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধুপারে—

তবু তুমি সেই তো আমার তুমি
আবার তোমায় চিনব নূতন করে ॥"

কোন্ অবস্থায়, কোন্ পটভূমিকায়, কী মানসিকতায় এ গান লেখা হয়েছে তা তুচ্ছ হয়ে যায়, গানটির ১৪ পঙ্‌ক্তির যাত্রা শেষে—যেখানে বারবরা পাহাড়-যাত্রার কোনো মূল্যই আর থাকে না।

(৫)

রবীন্দ্রনাথের গানগুলিতে অশ্রুধারা নয়নজল প্রভৃতি ব্যথার অনুভাবসূচক শব্দাবলীর ব্যবহার আছে বহুবার। এর পেছনে পরোক্ষ উসকানি থাকলেও, সর্বত্রই যে কোনো ব্যক্তিগত আঘাত বা বিচ্ছেদ বেদনা আছে, এমন মনে করার প্রবণতা সমর্থনযোগ্য নয় বলেই মনে করি। 'অশ্রুভরা বেদনা' গানটিতে যদি কারও অশ্রুর কথা লেখা হয়ে থাকে তো তা অলকাপুরীতে বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার। 'আজি শ্যামল মেঘের মাঝে' বাজে তারই কামনা। অথবা যক্ষের কথাও কবির মনে এসে থাকতে পাবে—যে মেঘের মাধ্যমে তার প্রিয়ার কাছে বার্তা পাঠাচ্ছে। তবে এ অশ্রু সকলেরই। "বেদনা কী ভাষায়" গানটিতেও দিকে দিকে প্রবহমান বেদনার কথা বলা হয়েছে— 'সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে ... ।' সুন্দরের জন্য কবির আকুলতা। এ বেদনা আধিভৌতিক দুঃখের নয়, আনন্দসংবেদনের।

'অশ্রুনদীর সুদূর পারে' গানটির অশ্রু যুগ যুগ ধরে সুফী-সাধক দ্বৈতবাদী ভক্ত, বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমিক—সবারই চোখে দেখা গেছে। এ ঈশ্বর-বিরহের গান। কঠোর সাধনার শেষে সিদ্ধির আশ্বাস। নিজের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বাধাবন্ধন কাটিয়ে নিশ্চিত চিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা। ভক্ত বুঝতে পেরেছেন—বাধাবিপত্তি সবই নিজের মনের, বাইরের নয়, পারের হাওয়ায় ঈশ্বরের বীণার গান বাজে—ভক্ত নীরব হয়ে মগ্ন হয়েছেন সে গানে। অশ্রুবর্ষণ সফল—ওই "ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।"

(৬)

'প্রেম' পর্যায়ের 'আমার নিখিল ভুবন হারালেম' গানটির প্রথমাংশে দেখছি সমস্ত ভুবন হারিয়ে যায় অন্ধকারে, বিশ্ববীণার রাগিণী যায় স্তব্ধ হয়ে, গৃহহারা আলোহারা হৃদয় তিমির-গুহাতলে নেমে যায়। সঞ্চারীতে আবার দেখছি—প্রিয় উদ্দিষ্টের নয়নে 'সন্ধ্যাতারার আলো।' তার সাহায্যে কবি পৌঁছতে চান অমৃততীর্থে। 'যদি হায় জীবনপূরণ' গানটিতে আছে—দিবসের দৈন্যের সঞ্চয় নিয়ে রজনীতে স্বপ্নের আয়োজনের কথা। এ সব গানের উৎস আবিষ্কারে কি গানগুলির মহিমা বাড়বে?

কবির জীবনে আন্না তড়খড়, কাদম্বরী দেবী, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো প্রমুখের মধুর সম্পর্কের অভিজ্ঞতা ছিল, সন্দেহ নেই। সেই সম্পর্কের মধু তাঁর কাব্য-গানকে মধুময় করে তুলেছে হয়তো। কিন্তু সেই প্রেরণাই তো সব নয়। ও রকম সম্পর্ক তো শত শত লোকের জীবনেই ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু অতি-সন্ধানীরা তাকে নিংড়ে এমন তিক্ত করে তুলেছেন,-যে তা প্রায় দিবাকর-কিরণময়ীর পরিণতিতে চলে এসেছে।

কেউ কেউ মনে করেন রবীন্দ্রনাথের সব প্রেমের গানেই রয়েছেন কাদম্বরী-দেবী। একটু মন খুলে দেখলেই কিন্তু বোঝা যাবে, অনাবিষ্কৃত অবচেতনে যাই থাকুক, গান গুলি কিন্তু নিরাশ্রয় 'নষ্টনীড়' হয়নি। 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'— তার প্রমাণ! কবির কাব্যে গানে যত অশ্রুপাত ঘটেছে সবই কি কাদম্বরী-প্রসূত? কবি-কথিত 'অনির্দেশ্য বেদনা'-র কথা কি মনে আসে না? ওই গানটি কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে রচিত হলেও আমরা বুঝতে পারি সম্পর্কটির মহৎ (subline) মর্যাদা; এবং গানটি সে মর্যাদা রক্ষা করেছে। গানটিকে 'পূজা' পর্যায়ের অন্তর্গত করা হয়েছে এবং ব্রহ্মসংগীত বলে গাওয়া হয়ে আসছে, শব্দে বাক্যে বিশেষ মাজাঘষা না করেই। সুতরাং স্মৃতিঅনুসঙ্গা-চিন্তা নিরর্থক।

আন্না তড়খড়ের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে আমেদাবাদে শাহীবাগে 'নিশাচর্য'- কালে যে 'বলি ও আমার গোলাপ বালা' বা নীরব রজনী দেখ' রচিত হয়েছে তার মধ্যে এক অতৃপ্ত বাসনার কথা আছে—যার কোনো সাক্ষাৎ কারণ নেই। বৈষ্ণব শাস্ত্রের পূর্বরাগ-এরও পূর্ববর্তী বয়ঃসন্ধির বেদনা আছে ওই গান দুটিতে, (এবং পরবর্তী কালের 'হৃদয়ের এ কূল ও কূল ' এবং 'আমি যে গান গাই জানিনে' গান দুটিতেও)। এ সব গানে কোনো মানবীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব আছে বলে মনে হয় না। থাকলেও তাতে কী এসে যায়।

রবীন্দ্রসংগীতে প্রেম-এর যে রূপায়ণ দেখি—তা 'পূজা' পর্যায়েরই হোক আর 'প্রেম' পর্যায়েরই হোক—তা কিন্তু একটু স্বতন্ত্র সমঝদারি বা রসবোধ দাবি করে। বৈষ্ণব তাত্ত্বিক যাকে 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' বলে পরিহার করেছেন—রবীন্দ্রসংগীতের ভাবেও সে প্রেম বর্জিত হয়েছে বললে ভুল বলা হবে না। রবীন্দ্রসংগীতের বাদী পুরুষ ভোগ ছেড়ে ত্যাগের দিকেই পা বাড়িয়েছেন।

এমন রটনাও শোনা যায়—যে, 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী' গানটি নাকি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো-কে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। অথচ 'জীবন স্মৃতি'-তে স্পষ্টই উল্লেখ রয়েছে এর রচনা সম্পর্কিত মূল প্রেরণার ('তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে' কথা। তাতে বোঝা যায় সহজেই, যে ওকাম্পো-সম্পর্কের (১৯২৪) বহু পূর্বেই ১৮৯৫ গানটি রচিত। এমন কি বরীন্দ্রনাথের পেরুযাত্রার ভ্রমণসূচীতে ওকাম্পোর কোনো উল্লেখই ছিল না। আকস্মিক অসুস্থতার কারণেই বুয়েনাস্ এয়ারিসে কবিকে থাকতে হয় এবং ওকাম্পোও তার পরেই আসেন রবীন্দ্রজীবনে।

একটি নৃত্যগীতালেখ্য দেখেছি, যেখানে মঞ্চের পেছনের পর্দায় সমুদ্রের ঢেউ দোল খাচ্ছে, তীরে গাউনপরা মেমসাহেব নাচছে, নেপথ্যে গান হচ্ছে-'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী'। এবং রবীন্দ্রনাথ? তিনি দর্শকের দিকে পেছন ফিরে আরামকেদারায় বসে মেমসাহেবের নাচ দেখছেন।

মঞ্চসফল পরিচালককে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি যে, ওই গানটি সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি' কিন্তু অন্য কথা বলে। -"বহু বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম, 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে!' ...একদিন ওই পদের মোহে আমিও একটি গান লিখিতে বসিয়াছিলাম।

স্বরগুঞ্জনের সঙ্গো প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম- 'আমি চিনিগো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী।' ...ওই সুরের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্তি মনে জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিতে লাগিল, আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে, কোন্ রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি, তাহাকেই শারদপ্রাতে মাধবীরাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই, হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল...।'

এই লেখকের কপাল ভালো যে 'সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী'কে সে মঞ্চে প্রত্যক্ষ করেছে! স্বচক্ষে!

(৭)

রবীন্দ্রনাথ নিজেকে উপস্থিত করেছেন কাব্যে, তাঁর গানে। তাঁর 'একটি কথা'কে ব্যক্ত করতে চাইছেন। কী ভাবে? —গানে গানে, তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাধ্যম—বাঁশির সুরে।

'আমার একটি কথা বাঁশি জানে।' শুধু 'বাঁশি জানে' বললেই হবে না, দ্বিতীয় বার জোর দিয়ে বলতে হবে 'বাঁশিই জানে।' মানে, একমাত্র বাঁশিই জানে। অন্য কোথাও তাকে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। কথাটি যেমন তেমন নয়, আটপৌরে কথা নয়, যে হাটে বাজারে ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে। তাহলে কথাটি কেমন। এ যেন বীজমন্ত্রের মতো। দীক্ষিত ভক্ত যেমন বীজমন্ত্রটিকে অত্যন্ত যত্নে রাখে সংগোপনে—এও তাই। অন্য কেউ জানবে না।—

"ভরে রইল বুকের তলা, কারো কাছে হয় নি বলা,
কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে।"

সারা জীবন কবি 'বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।' তাঁর জাগার সাথি নেই—তাঁর সাথি কেবল এই বাঁশিটুকু—অর্থাৎ গান।

"আমার চোখে ঘুম ছিল না গভীর রাতে,
চেয়ে ছিলেম চেয়ে-থাকা তারার সাথে।"

তারা যেমন অনন্তকাল আকাশে জেগে থাকে, কবির ভাবনাও তেমনি অনন্তের সঙ্গো যুক্ত হয়েছে। নির্বিশেষের আলোয় এর দীপ্তি ও ব্যাপ্তি।

"এমনি গেল সারারাতি, পাইনি আমার জাগার সাথি—
বাঁশিটিরে জাগিয়ে গেলেম গানে গানে।"

গানটির সুর ভৈরবী আর পীলুর মিশেলে তৈরী। ভৈরবী সুরের আরও একটি গান পাঠক শুনতে চেষ্টা করুন। —'আমার রাত পোহালো শারদপ্রাতে।' কবির অনুভূতিগুলি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে তাঁর বাঁশির মধ্যে। প্রাণের ভিতর তাঁর যে বেদনা তা তো আম জনতা জানবে না। জানবে বাঁশি। শ্রোতাকে কবি যা বলতে পারবেন না—তার সন্ধান

থাকছে ওই বাঁশির মঞ্জুষায়। 'ফাল্গুনে শ্রাবণে কত প্রভাতে রাতে' উচ্চারিত কত 'বিদায়গাথা আগমনী'-র ধ্বনি-যা কবির হৃদয়ে সারাজীবন ধরে জেগেছে, তা আছে ওই বাঁশির সুরে।

"যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি করে।"

বোধহয় পাঠককেই (শ্রোতাকেই) রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাঁশিটি দিয়ে যাবেন—

"বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে॥"

(৮)

আরও একটি ভৈরবীর গানে এমনি আরও একটি কথা শুনুন। কবির ভাবনা বড়োই চঞ্চল, ক্ষণিকের অতিথি।—

"যে কথাটি বলব তোমায় বলে
কাটল জীবন নীরব চোখের জলে,
সেই কথাটি (আমার সেই কথাটি)
সুরের হোমানলে
উঠল জ্বলে একটি আঁধার ক্ষণে—
তখন তুমি ছিলে না
(তখন তুমি ছিলে না) মোর সনে॥
ভেবেছিলেম আজকে সকাল হলে
সেই কথাটি (আমার সেই কথাটি)
তোমায় যাব বলে।
ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে
পাখির গানে আকাশ গেল পূরে,
সেই কথাটি (আমার সেই কথাটি)
লাগল না সেই সুরে
যতই প্রয়াস করি পরাণ পণে—
যখন তুমি আছো
(যখন তুমি আছো) আমার সনে॥

(বন্ধনী-বন্ধ শব্দগুলি গাওয়ার সময় পুররাবৃত্ত হয়।)

এই হল কবির 'কথা'। একে ব্যক্ত করব বললেই ব্যক্ত করা যায় না। — লাগবে না 'সেই সুরে', তাই তাকে দিয়ে যেতে হয় বাঁশির গানে পূরে। গানের শব্দগুলি কত নমনীয় অথচ কত গভীর। 'সুরের হোমানলে'—সুর যেন যজ্ঞের আগুন। যজ্ঞ থেকে যা জন্মে—সে তো আমাদের প্রাত্যহিক ঘটনা নয়, সে তো বহু সাধনার ধন। এ দুঃখের ধন। এ দুঃখের যজ্ঞ একদিনের নয়—'কাটল জীবন নীরব চোখের জলে।'

(৯)

কবিরা যা নিয়ে কারবার করেন তা হল-'অকারণ বেদনা'। সকারণ বেদনা নিয়ে গবেষণা করেন ডাক্তার, বৈদ্য, রাজনীতিক, ঐতিহাসিকেরা। কিন্তু শরতপ্রাতের আলোয় যা পাওয়া যায় তার তো নাম নেই, কেবল সুরই আছে। "তোমার নাম জানিনে, সুর জানি।" শরত প্রকৃতি 'ব্যথার বাঁশিখানি'-কে রেখে গেলেন কবির প্রাণের মাঝে। তিনিই তার "অকারণ বেদনার বীণাপাণি।" ('তোমার নাম জানি নে'-গানটিতে ভৈরবীর সুর)।

বিধাতা বা 'অকারণ বেদনার বীণাপাণি' কবির হাতে এই বাঁশিটি ধরিয়ে দিয়েছেন এবং কবিও 'কান্নাহাসির দোল দোলানো' সংসারে বাঁশুরিয়ার দায়িত্ব পালন করছেন—"চিরজীবন বইব গানের ডালা—

এই কি তোমার খুশি আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা ?।"

অথবা "তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি—
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি।"

(১০)

'নিদ্রাহারা রাতের এ গান' —এখানেও দেখছি বিনিদ্ররাতের কবি সুর খুঁজে বেড়াচ্ছেন—এমনি এক কান্নাহাসির ছবিকে রঞ্জিত করার জন্য। তাঁর ব্যথাকে প্রকাশ করার জন্যে চাই সুরের মাধ্যম। 'সুরের কাঙাল আমার ব্যথা'—এ কোন্ ব্যথা ? নীল গগনের নক্ষত্র -কুসুমের সন্ধানী এক অনুভবকে ব্যক্ত করার কঠোর সাধনা।—

'ওগো সে কোন্ বিহানবেলায় এই পথে
কার পায়ের তলে
নাম-না-জানা তৃণকুসুম শিউরেছিল শিশির জলে।

'কার পায়ের তলে' ? তার ঠিকানা খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। ঠিকানা থাকলেও গায়ক/শ্রোতার পক্ষে তা নিরর্থক। তাঁরা বরং চেষ্টা করুন নিদ্রাহারা রাতের গানটিকে আপন অন্তঃকর্ণে শুনতে। তবেই তাঁরা গীতবিতানে সার্থক প্রবেশাধিকারী হবেন।

(১১)

দিশেহারা সময়ের উগ্র নেশায় আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন, আমাদের চিরন্তন সত্তা সম্মোহিত রয়েছে সাম্প্রতিকতার কুহকে। আমাদের আত্মপরিচয় আমাদের অজানা। ফুল আমাদের চিরন্তনের সঙ্গে সম্পর্কটিকে জানিয়ে দেয় ('শ্রাবণ-সন্ধ্যা')। গানও তাই করে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গানগুলির ডাকে আমাদের চেতনা ফিরে আসে। পঁচিশে বৈশাখ আমাদের সকলেরই জন্মদিন হতে পারে। যে কুহক আমাদের অন্ধ করে রাখে, তার থেকে মুক্তি পেলে তবেই আমাদের মধ্যে 'অসীমের চিরবিস্ময়' ব্যক্ত হয়ে উঠতে পারে। 'পঁচিশে বৈশাখ'-এর আহ্বান শঙ্খের মতোই আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি সেই 'জাগরণের সঙ্গিনী।' অমর্ত্য সম্পদ।

সে গানের সাধনায় মর্ত্যকালিমার স্মৃতি-অনুষঙ্গকে ভুলতে পারলেই 'মর্ত্য-কাছে স্বর্গ যা চায় সেই মাধুরী'র পদ্মটি ফুটে উঠবে-যেখানে লক্ষ্মী এসে বসতে পারবেন। সুতরাং গায়ক/শ্রোতার কাছে এটাই জানাতে চাই-বসন্তের 'মাতাল সমীরণের' হৈ হুল্লোড় হুজুগে যাবার দরকার নেই। আপন অনুভবের অন্দরের ঘরখানিকে 'বহু যতন করে' ধুয়ে মুছে প্রতীক্ষায় জেগে থাকাটাই দরকার। কারণ-শিল্পের আনন্দ তথ্যে নেই, আয়োজনে নেই, উপকরণে নেই, আছে আপন বুকের পদ্মাসনে।

(১২)

এই যে এত কথা বললাম—একে সংক্ষেপে গীতবিতানপাঠের প্রবেশক বলা যেতে পারে। এরই পরিশিষ্ট হিসেবে একটি প্রাচীন গল্প পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চাই।

পাঠকের কিছু দায়িত্ব আছে— অস্বীকার করা উচিত নয়। তা কেবল রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্যেই নয়—নিজের জন্যও। কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীত ধর্ষিত হলে রবীন্দ্রনাথের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হবে না—যা হবার পাঠকেরই/শ্রোতারই হবে।

প্রবাদ আছে—ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। ধর্ম যদি রক্ষিত হয় তবেই সে ধার্মিককেও রক্ষা করবে। সোজা কথায় বলি— যাকে রাখো সেই রাখে। তেমনি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যদি বুকে চেপে ধরে ভালোবাসতে পারি, তবে সেও আমাদের ভালোবাসা দেবে।

এই ভালোবেসে বুকে চেপে ধরা প্রসঙ্গে পূর্বসূরীরা অনেক আলোচনা করেছেন হাজার বছর ধরে। দেশে বিদেশে। তাঁরা বুঝেছিলেন পাঠকের আলস্যেই কবিও অলস হয়ে পড়েন— শিল্পও রসদানে কৃপণ হয়। তাঁরা পাঠকদের রসিক হবার কথা বলেছেন।

দার্শনিক Locke যদিও নাস্তিক ছিলেন না, ধর্মত christianছিলেন,— তবু তিনি বলেছেন—মানুষের মন জন্মকালে থাকে একেবারে 'clean sheet (tabula rasa) and sense experience writes upon it in a thosand ways. (Story of Philosophy, Will Durant)। নাস্তিকেরাও এমনই বলে থাকেন। আমাদের ভারতীয় আস্তি পুনর্জন্মবাদীরা মনে করেন মানুষ একেবারে শূন্য মনে পৃথিবীতে আসে না—বাসনা বা সংস্কার নিয়েই জন্মায়। তবেই বাইরের জগতের নানা উদ্দীপন মানুষের আপন আপন সংস্কার বা রুচি অনুযায়ী আমাদের মনে নানা প্রতিক্রিয়া করে। তাই শিল্পাস্বাদনের জন্য মনকে 'নির্মল দর্পণ'-এর মতো করার স্বার্থে বিশেষ করে তাঁরা উপদেশ দিয়েছেন—কারণ জন্মের পরে মনের প্রবণতাই থাকে নানা ধরনের প্রতিবিম্বে মনের ভাণ্ডারকে বোঝাই করার। তাই চেষ্টা করা উচিত শিল্পাস্বাদনের জন্যে মনকে সম্ভব মতো tabula rasa যাতে রাখা যায়। তাঁরা আশা করেছেন পাঠকের মন যথাসম্ভব 'তন্ময়ীভবন যোগ্য মনোমুকুর' হোক। যথা সম্ভব।

আমাদের বাউল গানে 'আরশীনগরের' কথা আছে। সেই 'আরশী' কথাটার একটা মানে তো আয়না বা মুকুর—যেখানে পরমাত্মার প্রতিফলন হতে পারে। সুফীধর্মের একটি মতে—ঈশ্বরের মর্ত্যলোক সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল—বিশ্বের আয়নায় নিজেকে দেখা। ('বেদান্ত ও সূফীধর্ম'—রমা চৌধুরী)।

আমরা অনেক প্রাচীন আরব্যকাহিনী পড়েছি। এমনই এক গল্পের কথা বলি। গল্পটির বিভিন্ন রূপান্তর হয়েছে বিভিন্ন কালে, নানা হাতে। গল্পটির শিল্পবিষয়ক তাৎপর্য আছে মনে করি। গল্পটি এ রকম—

একবার এক রাজা এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। তৎকালীন চৈনিক এবং পশ্চিমি চিত্রকররা বিবদমান প্রতিপক্ষ/প্রতিযোগী রূপে উপস্থিত হলেন।

একটি বড়ো ঘরের দুটি মুখোমুখি দেওয়াল দুই প্রতিপক্ষকে ছবি আঁকার জন্যে দেওয়া হল। মাঝখানে থাকল একটি পরদা। পরদার দুই পাশে দুই প্রতিপক্ষ রং তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে বসে গেলেন। পশ্চিমি শিল্পীরা কয়েকমাস ধরে নানা ধরনের রঙ দিয়ে তাঁদের বিচিত্র চিত্রকলায় তাঁদের দেওয়ালটিকে ভরিয়ে তুললেন। এদিকে চৈনিক শিল্পীরা সযত্নে তাঁদের দেওয়াল টিকে দীর্ঘকাল ধরে মেজেঘষে নিষ্কলঙ্ক ঝকঝকে একটি আয়নার মতো করে ফেললেন।

নির্ধারিত সময় পার হবার পরে রাজা মাঝখানের পরদাটিকে সরিয়ে প্রথমে পশ্চিমি শিল্পীদের দেয়ালচিত্র দেখলেন এবং মুগ্ধ হলেন তাঁদের বর্ণবৈচিত্র্যে এবং কারুকার্যে।

এরপরে তিনি দেখতে এলেন চীনা শিল্পীদের চিত্রাঙ্কন। তিনি অবাক হয়ে গেলেন দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। দেখলেন নির্মল আয়নার মতো দেওয়ালে পশ্চিমি শিল্পীদের বর্ণশবল উজ্জ্বল চিত্রাঙ্কনের নিষ্কলুষ প্রতিবিম্ব।

রাজা পুরস্কৃত করলেন চীনা শিল্পীদের—যাদের কুশলী হাতে বাস্তবের প্রতিফলন হয়েছে যথার্থ এবং দেয়ালটি হয়ে উঠেছে নির্মল দর্পণ। Clean slate (গল্পটির রূপান্তরে অবশ্য পুরস্কার পেয়েছিল পশ্চিমি শিল্পীরা)।

এটা রাজার নিজস্ব বিচার। কিন্তু রসব্যাপারে দাতার চেয়ে গ্রহীতার ভূমিকাটা বড়ো। শ্রোতা-পাঠকের হৃদয় আছে বলেই, আর সে হৃদয়ে অনুভূতি আছে বলেই—তো, রামায়ণের সীতা শত শত বছর ধরে রসানন্দ দিয়ে আসছেন। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন—'বাজে বলেই বাজাও তুমি, —সেই গরবে, ওগো প্রভু, আমার প্রাণে সকল সবে।' —সেটা একবার ভেবে দেখা দরকার। বীণার বাদনযোগ্যতা না থাকলে গুণীরই বা কী গুণ, আর রাগিণীরই বা রসগর্ভতা কী ? তাই আমার মনে হয়—স্রষ্টার সৃষ্টি আর রসিকের নিজস্ব রসানুভূতি—উভয়ের মিলনেই আনন্দের সম্ভাবনা। রসিকের হৃদয়—বীণাকে 'সহৃদয়' হতে হবে। রস সদাই সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী। সুতরাং গীতবিতান আর তার পাঠক—'গাহিতে হবে দুইজনে, নির্মল আয়নায় বস্তুর প্রতিফলন হয় মাত্র ; সৃজন হয় না। সৃজন হয় সংবেদনশীল সহৃদয়তায়।

* * * * *

গীতবিতানের প্রত্যেকটি গান স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা— অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তবু বহুগানই আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে। এবং গীতবিতানের মধ্য দিয়ে যে 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা'[১] অভিনীত হয়ে চলেছে— সে পালাটির মূল

(১) জীবনস্মৃতি প্রকৃতির প্রতিশোধ।

সুরটিকে ধরতে চেষ্টা করেছি। আশা করি রবীন্দ্রসংগীতের ভাবলোকের প্রবেশার্থীরা কিছু দিশা পাবেন।

* * * * *

সারাজীবন বহু গ্রন্থপাঠের সুযোগ পেয়েছি। এ গ্রন্থে তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। প্রত্যক্ষ প্রভাবের ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখ যথাস্থানে করেছি। বহু পাঠাগারের সহায়তাও পেয়েছি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল লাইব্রেরী এবং বাংলা, ইংরেজি প্রভৃতি বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরী, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী, রবীন্দ্রচর্চা ভবন, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অফ কালচার, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, যোগদ্যান প্রভৃতি। এ গ্রন্থের প্রবন্ধ রচনায় বিভিন্ন কালে বহু জ্ঞানীগুণীজনের সহায়তা পেয়েছি। কয়েকজনের নাম উল্লেখ করছি।

অধ্যাপক অরুণ কুমার বসু, স্বামী গৌতমেশানন্দ (যোগোদ্যান), স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ), ফাদার জে. এ. নাথন্ (সেন্ট পিটার্স চার্চ, ব্যাঙ্গালোর), স্বর্গত অধ্যাপক সরোজ কুমার বসু, স্বর্গত অধ্যাপক শিবদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

বন্ধু অনুপম গুপ্ত এবং জয়ন্ত সেনগুপ্তের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এ আলোচনায় ইন্ধন যুগিয়েছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দূর-শিক্ষা বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক সনৎ ঘোষ একটি module ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

আমার প্রথম গ্রন্থ ‘রবীন্দ্রসংগীত বীক্ষা : কথা ও সুর’, ‘একুশ শতক’, ‘শিল্পিত শরক্ষেপ’, ‘বাতায়নিক’, ‘যুব-মানস’—প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কয়েকটি প্রবন্ধ রূপান্তরে এ গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। সহায়তা করেছেন ‘একুশ শতকের’ অরুণ কুণ্ড, সৌমিত্র লাহিড়ী ও অন্যান্য কর্মিবৃন্দ। সহধর্মিনী চন্দনা চক্রবর্তীর প্রেরণা ও নেপথ্য বিধান গ্রন্থ রচনায় সহায়ক হয়েছে। পুত্রদ্বয় প্রদীপ্তভাস্কর ও সৌম্যদেব অনেক উপকরণের যোগান দিয়েছে।

সব প্রতিষ্ঠান, পত্রিকা এবং ব্যক্তিবর্গকে আমার প্রণাম, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।
আশা করি গ্রন্থটি পাঠককে গীতবিতানের নিবিড় অধ্যয়নে আগ্রহী করে তুলবে।

কলকাতা

প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী

সৃজন

(১)

শিল্প-সাহিত্য-সংগীত প্রভৃতি কী দেয় আমাদের ? —আনন্দ। এদের কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকলেও তা পরোক্ষ, গৌণ। অব্যবহিত নয়। যেমন কেউ কেউ বলেন—সংগীতের প্রভাবে গাছপালা বাড়ে, গরু দুধ দেয় বেশি, মানুষের রোগ ব্যাধি সারে ইত্যাদি। এ সব যদি সত্যি হয়ও—তবু তা একটি মাত্র মুখ্য কারণের গৌণ কার্য। অর্থাৎ মনে আনন্দ পায় বলেই উদ্ভিদ বাড়ে, গরু দুধ দেয় বেশি, মানুষের রোগ সারে। মুখ্য ব্যাপারটা ওই আনন্দ।

এই আনন্দকেই মানুষ খোঁজে তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে। কখনো সূর্যোদয়ের আলোকচ্ছটায়, কখনো অরণ্যের শ্যামলিমায়, কখনো সমুদ্রের সুনীল বিস্তারে, কখনো তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে, কখনো পাখির কূজনে, বা ঝরনার কলধ্বনিতে।

কিন্তু বিধাতা এই যে এসব দিয়েছেন, এরা তো প্রাকৃত,—এরা তো সংস্কৃত নয়। এরা এলোমেলো, এরা গুছোনো নয়। প্রকৃতি যা সহজ আনন্দ দিচ্ছে তাকে আরো বাড়িয়ে তোলার জন্যে তাকে আরোও সংস্কৃত মার্জিত করা দরকার। উপস্থিত বর্তমানকেই আনন্দের পূর্ণ অভিব্যক্তি বলা যায় না। কবি বা শিল্পী তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সুসংস্থাপিত করেন। বিশ্বে, মানবসমাজে প্রতি মুহূর্তে কত ঘটনাই না ঘটছে, সময়ের কতই না উদ্ভাবন দেখা যাচ্ছে। নিয়ত সংঘটিত সেই সব থেকে বেছে বেছে বাড়িয়ে কমিয়ে কবিরা তাঁদের কাহিনী রচনা করেন। প্রকৃতির ঝংকৃত শব্দাবলী থেকে বেছে বেছে ঝেড়ে পুঁছে গায়কেরা রচনা করেন রাগ। তাই দেয় যথার্থ আনন্দ।

আমাদের পরিচিত চিরাগত পুরাণ-কাব্য-কাহিনী প্রচলিত উপমা-অলংকারাদি রবীন্দ্রনাথের হাতে পরিমার্জনা পেয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য, বৈষ্ণবপদাবলি, উপনিষদ, গীতা, সূফীবাদ, ভারতীয় দর্শন, এবং বৈভাষিক, লোকায়ত চিন্তাভাবনা, অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতি— রবীন্দ্রনাথের হাতে নতুন প্রকাশ পেয়েছে। তাকেই বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের সৃজনকর্ম। বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা, কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, গান্ধারীর আবেদন প্রভৃতি রচনায় রবীন্দ্রনাথের এই সৃজনকর্মের অফুরন্ত উদাহরণ আছে।

বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানের কিছু গানের মধ্যে এই সৃজনকর্মকে লক্ষ করতে চাই। গানগুলির মধ্যে উপাদান যা রয়েছে, তা সবই তো আমাদের চেনা। অথচ সে সবের ব্যবহার, উপস্থাপনা, কবির আপন দৃষ্টিভঙ্গির প্রসাধন প্রভৃতি নানা গুণে তাদের বহু-পরিচয়-গত মালিন্যের আবরণ ঘুচে গিয়ে দেখা দিয়েছে 'নূতন-দেখার' বিস্ময় (গীতবিতানের ভূমিকা)।

(২)

'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া'—গানটি বহু শ্রুত। কথা ও সুর উভয়ই অত্যন্ত ঘরোয়া এবং সহজ সরল। (সুর প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য নয়।)

গানটির বিশ্লেষণ : পর্যায়= প্রকৃতি-শরৎ-(১৪৫)

স্থায়ী : প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতায় 'অমল ধবল' পালের চিত্র যেন এক অভূতপূর্ব বিস্ময় এনে দেয়। 'পঁচিশে বৈশাখ' (পূরবী) কবিতায় কবি যে এক নূতনের বা 'অসীমের চিরবিস্ময়ের' কথা বলেছেন, এ গানেও তাই। —'দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া!' এ তরণী আমাদের কোনো দূর স্বর্গের নির্মলতার বার্তা বয়ে আনবে!

অন্তরা : 'কোন সাগরের পার'! 'সাগরের পার' কবির কাছে চিরদিনই বিস্ময়ের ব্যাপার। অকূল সমুদ্রের অগাধ কালোর পরপার থেকে 'কোন সুদূরের ধন' এল আজ! Romantic অচেনা, অপরিচিত, অভ্যাস বা ব্যবহারের কালিমামুক্ত। এ পারের পার্থিবতার সব চাওয়া সব পাওয়াকে ফেলে মন চলে যেতে চায় সুদূরের আহ্বানে সাড়া দিতে।

রবীন্দ্রভাবনায় 'দূর' ও 'সাগরপার' এ-দুটি শব্দ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে অলৌকিক সৌন্দর্য বোঝাতে। 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে 'দূরবর্তীর সহিত যোগ সংযোগের আনন্দ'-এর কথা বলা হয়েছে। 'গোরা' উপন্যাসের গোড়াতেই যে 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি'-র আসা যাওয়ার কথা বলা হয়েছে—সেও ওই দূরের পাখি। দূরত্বের মহিমার কথা 'লিপিকা'-র রচনাগুলিতেও আছে। দূরবিষয়ক গান—কোন সুদূর হতে, আমার দিন ফুরালো, বহুযুগের ওপার, দূরে কোথায় দূরে, প্রভৃতি। 'সাগরপার' তাঁর পূজার গানে অলৌকিক আধ্যাত্মিক জগতের ইঙ্গিত দেয়। Romantic সুদূরের হাতছানি আছে 'আমি চিনি গো চিনি,' আমি চঞ্চল হে', 'মোর পথিকেরে বুঝি', প্রভৃতি গানে।

সঞ্চারী : আমাদের জীবনের পিছনে, অর্থাৎ 'এই কিনারায়' আছে 'ঝরঝর জল,' 'গুরু গুরু দেয়া' আর তারই ফাঁক দিয়ে ওই 'পঁচিশে বৈশাখের' সকালের মতো আলো দেখা যায়—'অরুণ কিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।'

আভোগ : 'ওগো কান্ডারী, কে গো তুমি,
কার হাসি কান্নার ধন...'।

সঞ্চারীর ওই অরুণ কিরণের মধ্যে আমরা পেতে পারি নূতনের প্রকাশ—'কুহেলিকা করি উদঘাটন।' আজ আসবে নতুন সুরের আভাস, নতুন মন্ত্রের চিরবিস্ময়কে সামনে তুলে ধরে। নতুন গানের পালে লাগবে হাওয়া।

'কান্নাহাসির ধন' জিনিসটি কী!

'কান্ডারী'-টি কে?

এই কান্ডারী হচ্ছে-মানুষের মধ্যে যে একজন কবি বাস করে,-সে। জীবনের ভালোমন্দ সব অভিজ্ঞতাকে মন্থন করে যে নবনীতে পরিণত করতে পারে, বা অন্য উপমায় বলা যায় অঙ্গারকে হীরকে বা সমুদ্রকে অমৃতে পরিণত করতে পারে—সে। সেও নিশ্চয়ই আমাদের প্রাত্যহিকতা থেকে মুক্ত—দূরের মানুষ।

'কান্নাহাসি' শব্দটি 'পূজা' পর্যায়ের প্রথম গানটির প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। —'কান্নাহাসির দোল দোলানো, পৌষফাগুনের পালা।' বিধাতা কবিকে এই কান্নাহাসির মধ্যেই গানের ডালাকে বহন করতে বলেছেন। অর্থটি আরও পরিষ্কার হয় 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ' গানটির সঞ্চারী অংশে কবির অঙ্গীকারে—

'তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার বাজাই আমি বাঁশি,
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্নাহাসি।'

'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' গানটিতে 'হাসিকান্না' শব্দটিকে 'জন্ম মৃত্যু', 'মুক্তি বন্ধ' প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়েছেন।

বিধাতা কবিকে সৃষ্টি করেছেন এই হাসিকান্নার অভিজ্ঞতার উপাদান-মিশ্রণে। গান তো জীবন-সাধনারই সিদ্ধি। এই হাসিকান্নাগুলিকেই গানে পরিণত করাই কবির কাজ।

'কান্নাহাসির দোলদোলানো' গানটির মিল রয়েছে 'আকাশ হতে আকাশপথে' গানটির সাথেও। প্রথম গানটির মধ্যে বিধাতার 'খুশি' বা ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় গানটিতে আছে—জগৎ প্রবাহ ও 'শরীর মনের অধীর ধারা'—এ উভয়ের 'ঘাতে ঘাতে' প্রাণে গানের জন্ম হচ্ছে। 'বিশ্বপরানে'র ব্যাকুলতা নিত্য আমায় জাগিয়ে রাখে। প্রথম গানটিতেও আছে 'শান্তি কোথায় মোর তরে।' 'চিরদিনের কান্নাহাসি উঠছে ভেসে রাশি রাশি'—(দ্বিতীয় গানটির পঙ্‌ক্তি) সেটা দেখছে কে? তার নয়নের সাথে কবি নয়ন মেলাতে ইচ্ছুক। কান্নাহাসির গান যার ইচ্ছায় রচিত হচ্ছে—সে-ই দেখছে অবিরত। সুতরাং সে=বিধাতা। আর 'অমল ধবল পালে' গানটির কান্ডারী হল বিধাতার নিজের হাতে গড়া কবিসত্তা।

এ গানটির উপাদান উপকরণ অতি সামান্য ও সাধারণ। একটি পাল তোলা নৌকো-র ভেসে যাওয়া। —তার background-এ আছে মেঘবৃষ্টি এবং ছিন্ন মেঘের ফাঁকে আসা রোদের ছটা। এর মধ্যে অসামান্য বা অসাধারণ যা কিছু —তা কবিরই বানিয়ে তোলা। কবির সৃজনে এই কান্ডারী হয়েছে বিধাতারই অবতার। এই কান্ডারীই আমাদের পরিচিত এপার থেকে অপরিচিত ওপারে নিয়ে যেতে এসেছে। এই 'কিনারায়' প্রতিদিনের সব চাওয়া পাওয়াকে ফেলে দিয়ে অকূল বিস্ময়ের ওকূলে পৌঁছে দেবে। 'হাসিকান্নার ধন' বাক্যাংশটি সীমাহীন আদরের সূচক। এ কান্ডারীর কণ্ঠে আছে বিস্ময়ের গান, তার উচ্চারণে আছে স্বর্গলোকের দুয়ার খোলার মন্ত্র। এ কান্ডারীর গঠনে উপাদান যাই থাকুক —সে সব দিয়ে আমরা কি এমন 'হাসি কান্নার ধন'-কে গড়ে তুলতে পারি—যার পানে চেয়ে বিস্ময়ে বলে উঠতে হয়—

'তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে
কে কৈল বাহির!'

তা সম্ভব হয় রবীন্দ্রনাথেরই হাতে।

(৩)

বৈষ্ণব পদাবলিতে গোবিন্দদাস প্রমুখ কবির অভিসারের পদগুলি কালজয়ী। একালে তেমন বর্ষা নামে না আর, অভিসারের পথের বাধাগুলিও অনতিক্রম্য নয়। কিন্তু পাঠক

যখন বৈষ্ণব পদাবলির কবিতাগুলি পড়েন—তখন অবশ্যই তাঁকে চলে যেতে হয় জন্মান্তরের দূরত্ব পার হয়ে সেই অতীতের স্মৃতির জগতে। বাস্তবকঠোর সময়ে বাস করেও রোমান্টিক না হয়ে উপায় থাকে না। কাল ও পরিবেশের পরিবর্তনে আধুনিক কবিতায়-ও বর্ষার স্থান নেই। তবু রবীন্দ্রনাথের গানে আমরা ফিরে পাই বৈষ্ণব পদাবলীর বর্ষাকে।

বৈষ্ণব পদাবলির প্রেমময়ী কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার অভিসারের পদগুলিতে আছে বর্ষার ঝড়ঝঞ্ঝাবিঘ্নিত তরঙ্গিত যমুনাতীরে রাধার কৃষ্ণমিলনের অভিলাষী অভিযান। প্রেমিকার অভিসার যাত্রায় আছে নানা বাধা। 'মন্দির বাহির কঠিন কপাট।' (গোবিন্দদাস) রাধা অবশ্য সে সব পরোয়া করে না। বলে—'কুল-মরিযাদ কপাটই' যখন উদঘাটন করা গেল—তখন আর কাঠের কপাট কী বাধা দেবে? আরো আছে শাশুড়ি, ননদিনী, আছে ঝড় জল শ্বাপদসংকুল জঙ্গাল। এসব কিছুকে অতিক্রম করার দুঃসাহস নিয়ে রাধা চলেছে প্রিয় মিলনের অভিপ্রায়ে। সে যেতে চায় 'মানস-সুরধুনী পার।'

রাধা যাচ্ছে পরপুরুষের আকর্ষণে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই পরকীয়া প্রেম ব্যাপারটির গুরুত্ব অশেষ! সামাজিক দৃষ্টিতে নিন্দনীয় হলেও—রাধার বিপদ তুচ্ছ করে এগিয়ে যাবার এই দুঃসাহস—ঈশ্বর-ভক্তকে অনুপ্রাণিত করে এসেছে বহুকাল থেকেই। পরপুরুষ সেক্ষেত্রে পরমপুরুষ। এভাবেই লৌকিক প্রেমের গান আধ্যাত্মিক গানে উত্তীর্ণ হয়েছে। অসামাজিক পরকীয়া প্রেম যেমন মানুষকে গোপন অভিসারে দুর্গম পথে টেনে নিয়ে যায়, ঈশ্বরের প্রতি দুর্নিবার প্রেমও তেমনি অভ্যস্ত জীবনযাত্রা থেকে মানুষকে কৃচ্ছ্রসাধনের অগম পথে আকৃষ্ট করে।

আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দেখলে মানুষ স্বতঃই বিরহী। সে জানে না কোথা থেকে তার উদ্ভব আর কোন্ গন্তব্যেই বা তার যাওয়া। তবু যেহেতু সে যায়, সে হেতু সে জানে—কোনো আপাতঅনিকেত ঠিকানায় রয়েছে তার বহুকাল বিস্মৃত একান্ত আপনজন, যার আকর্ষণ সে উপেক্ষা করতে না পেরে পথে বেরিয়ে পড়ে। সূফী, সন্ত, মীরাবাইদের জীবনে ও গানে এই আকর্ষণের কথা আছে। ভক্ত যেন ঈশ্বরের সঙ্গে আবশ্যিক অচ্ছেদ্য অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা। কোনো কারণে ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে থাকলেও তাঁর আকর্ষণ যেন জ্ঞানে অজ্ঞানে প্রত্যক্ষে পরোক্ষে নিয়তই মানুষকে গৃহাতিগ আকর্ষণে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অনির্দেশ্য সেই 'নিজনিকেতনে'। অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটিতে এই তীর্থ যাত্রার কথা আছে। তবে প্রেমিকের অভিসারের ভাবটি সেখানে নেই—তা আছে বৈষ্ণবপদাবলী বা সন্ত কবিদের গানে। আধিভৌতিক আধিদৈবিক—সব রকমের বাধা বিপদগুলিই তুচ্ছ হয়ে যায় ঈশ্বরের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে। এখানে St. John of the Cross-এর 'Dark Night of the Soul' কবিতাটিও মনে করা যেতে পারে। (এ গ্রন্থের 'গীতাঞ্জলি এবং ...' প্রবন্ধ দেখুন)

আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের গানগুলিতেই বোধহয় এই অভিসারের, এই প্রেম বিরহের কথা সবচেয়ে বেশি আন্তরিক ব্যাকুলতায় প্রকাশ পেয়েছে। এই নাস্তিকতার দিনেও আধুনিক মানুষকে এসব গানের টানে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়; যেমন,—

'কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে,
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে-
সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়॥
ঝর্ণা যেমন বাহিরে যায়
জানে না সে কাহারে চায়...
পুষ্প যেমন আলোর লাগি—
না জেনে রাত কাটায় জাগি,
তেমনি তোমার আশায় আমার হৃদয় আছে ছেয়ে॥ (পূজা-৩৩)

এই বহুব্যাপ্ত বিরহ আধুনিক মানুষের মনকেও উন্মনা করে, যখন সে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি শোনে মন দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের গানের এই বিরহবোধ নিশ্চয়ই ঈশ্বর-বিরহ। তবে ঈশ্বরধারণা হয়তো রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় একটু স্বতন্ত্র।

প্রকৃতপক্ষে অভিসারের শ্রেষ্ঠ প্রযোগ হয়েছে 'পূজা'-র গানে। 'প্রেম'-এর গানের অভিসারের ব্যাপারটা অতি সাধারণ। 'প্রকৃতি'-র গানে যে অভিসার আছে, তাকে পূজার গানের অন্তর্গতই বলা যায়। পূজা-র গানগুলিতে প্রথম থেকেই দেখছি, নানা রূপে যেন অভিসারের কথাই বলা হয়েছে। এ যেন অনন্ত অভিসার। জীবাত্মা পরমাত্মার জন্যে, ভক্ত ভগবানের জন্যে, খণ্ডপ্রাণ পূর্ণপ্রাণের জন্যে, পার্থিবতা স্বর্গীয়তার জন্যে, যেন অভিসারের পথে চলেছে। অপূর্ণ ধরিত্রী প্রকাশ-পিয়াসী,—প্রকাশই তার পূর্ণতা। 'প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে' গানটিকে 'পূরবী' কাব্যের 'লিপি' কবিতাটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে। 'প্রকাশপিয়াসী ধরিত্রী' খুঁজে ফেরে তার প্রকাশের সুর, ভাষা। 'লিপি'-র ধরণী যেন তার প্রণয়ীর জন্যে প্রতিনিয়ত তার প্রেমপত্র লিখে চলেছে, প্রতিনিয়ত তার অঙ্গসজ্জার পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। 'বাষ্পের গুণ্ঠনখানি প্রথমে পড়িল যবে খুলে'—সেই প্রথম দেখা,—তখন থেকেই দেখার 'সে প্রথম বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে।' 'অমর জ্যোতির মূর্তি'র-জন্যে তার কামনা। 'মাঝখানে আকাশ অনন্ত ব্যবধান', এই ব্যবধান দুরতিক্রম্য। তাই পত্র লেখার মধ্য দিয়েই যেন তার অভিসার যাত্রা, অন্তহীন পথের ক্লান্তিহীন যাত্রা। প্রকৃতপক্ষে কবিদের সব কাব্যসাধনাই যেন সুন্দরের জন্যে অভিসার যাত্রা। গীতবিতানের গানে, বিশেষত পূজা-র গানে যে অভিসার, তা সুন্দরের পূর্ণতার জন্যে অপূর্ণের, ক্ষান্তিহীন অভিসার। 'পূর্ণমদঃ'-এর জন্যে 'পূর্ণমিদং'-এর অভিসার। অব্যক্ত অখণ্ড-পূর্ণের জন্যে ব্যক্ত, দৃশ্য, খণ্ড-পূর্ণের অভিসার। এ যেন কবির নিজেরই পূর্ণরূপের জন্যে তাঁর অপূর্ণ সত্তার অভিসার। 'কাণ্ডারী-র' 'তরণী বাওয়া'।

"... ভিতরের মানুষ বলছে 'আমার চিরদিনের সেই আর একজনটি কোথায়...।' ভাবছি—'কী করি। কে আছে যার ডাকে কাজের বেড়া ডিঙিয়ে এখনি আমার বাণী সুরের প্রদীপ হাতে বিশ্বের অভিসারে বেরিয়ে পড়বে।... সেই আমার সর্বনেশে ভিখারি রাস্তার কোন্ মোড়ে?"— (মেঘলা দিনে)

কৃষ্ণের বাঁশির আহ্বানে রাধা চলেছে অভিসারে। সাহিত্যে বাঁশি'র ব্যবহার এল কোথা থেকে? গ্রাম্য গানগুলিতে দেখা যায় বাঁশির প্রতিপত্তি। সে কি কৃষ্ণ উপাখ্যানের প্রভাব? না কি কৃষ্ণ উপাখ্যানের বাঁশিই আমদানি হয়েছে গ্রাম্য উপাখ্যান বা গান থেকে। জালালুদ্দিন রুমি প্রভৃতি সুফীদের গানেও বাঁশির প্রয়োগ আছে। 'I rest a flute Laid on Thy lip.'

'দিনের বেলায় বাঁশি' গানটিতে বাঁশির আকর্ষণে ভক্ত চলেছে বাঁশুরিয়ার সন্ধানে। কিন্তু বহির্ভুবনে নানাজনের নানা বাধা ও ধাঁধা। বহু বিচিত্রের কোলাহল। 'নানান নামে ভোলায় তারা নানান দ্বারে বেড়াই ঘুরে।' আসলে স্থায়ীর দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতেই তো বলা হয়ে গেছে 'আপনি তুমি রইলে দূরে। অন্তরাটি তারই বিস্তার। যিনি বাঁশি বাজান তিনি তো দূরেই থাকেন সর্বদা।

'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে॥
তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে,—
বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলা যে।'... ॥ (পূজা-১৯)

বা 'এ তার বাঁধা কাছের সুরে,
ওই বাঁশি যে বাজে দূরে।' (পূজা-১২)

এই দূরত্ব, পূর্ণমদঃ আর পূর্ণমিদং(১)-এর ব্যবধান, সহজে ঘুচবার নয়। চোখের আলোয় দেখা যায় না যাকে, তাকে দেখবার জন্যে চাই অন্তরের আলোর দিশা। এই ব্যবধান ওই 'মানস—সুরধুনীর' ব্যবধান। তাই বাইরের দিনের বেলার আলো নয়, ইন্দ্রিয়ের আলো নয়, তাকে দেখতে হবে অন্তরের আলোয়। তাই—

...'এখন আকাশ ম্লান হল, ক্লান্ত দিবা চক্ষু বোজে—
পথে পথে ফেরাও যদি মরব তবে মিথ্যা খোঁজে।
বাহির ছেড়ে ভিতরেতে আপনি লহো আসন পেতে—
তোমার বাঁশি বাজাও আসি আমার প্রাণের অন্তঃপুরে॥' (পূজা-৬০৩)

অন্য গানে শুনুন—'চিত্ত আসন দাও মেলে, নাই যদি দরশন পেলে
আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ॥'

অথবা আঁধার এল বলে
তাইতো ঘরে উঠল আলো জ্বলে।'...
যখন সকল শব্দ হয়েছে নিস্তব্ধ
বসন্তবায় মোরে জাগায়-পল্লব কল্লোলে॥'... (পূজা-৬০০)

(১) পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ খং ব্রহ্ম। (বৃহদারণ্যক-৫/১/১)

অন্তরে চাই গভীর প্রেম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—'Love, highest emotion.' এই প্রেমের টানে অভিসার যাত্রার কথা আছে 'আমার মিলন লাগি,' 'ওই শুনি যেন চরণধ্বনি', 'তোরা শুনিস নি কি,' 'কেন চোখের জলে,' 'দুঃখের বরষায়,' 'তুমি যে এসেছ,' এমন বহু গানে।

(৪)

'হরি রহ মানস-সুরধুনী পার'—বৈষ্ণব পদাবলীর এই পদটির এই ছোট্ট বাক্যবন্ধটিতে অনেক বেদনাই লুকিয়ে আছে। পুরুষ-রমণী যবে থেকে সৃষ্ট হয়েছে, তখন থেকেই তো অভিসার চলে আসছে। মধ্যযুগে সামাজিক প্রতিবন্ধ যখন থেকে সমাজে এসেছে তখন থেকে অভিসারে দুর্দম গতিও এসেছে। কিন্তু এ যুগের মানুষ হয়ে রবীন্দ্রনাথ কেন এই অভিসারকে নিয়ে গান বাঁধতে বসলেন? নারী-পুরুষের পরস্পর আকর্ষণ এবং উভয়ের মিলন নিয়ে তো সামাজিক উপন্যাস প্রচুর রচিত হয়েছে। সে সবই রক্ত মাংসের স্থূল ইন্দ্রিয়তাড়িত মানুষের কথা। পরপুরুষ এবং পরনারীর গল্পও সে সব সাহিত্যে রয়েছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ প্রেমাকর্ষণ কার প্রতি? ঈশ্বর নামক যার জন্যে তাঁর অভিসার এবং ঈশ্বর নামক যিনি কবির কাছে অভিসারে আসেন—তাঁরা সংস্কৃত সাহিত্যের বা বৈষ্ণব পদাবলির নায়ক নায়িকার মতো ভিন্ন ভিন্ন সত্তাধারী পুরুষ বা নারী নন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের অন্য সত্তার আকর্ষণে মিলিত হতে চান। 'দ্বা সুপর্ণা' বা দুই পাখি যেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরেই একই বৃক্ষে 'সযুজা সখায়া।'[১] নিজের ভেতরকার এই মনের মানুষটিকে ধরা তাঁর পক্ষে সত্যই দুঃসাধ্য। মনের মধ্যেই যমুনা, মানসসুরধুনী। --এপার আর ওপারে—'ঋতুর দুধারে থাকে দুজনে, মেলে না যে কাকলি ও কূজনে, নিঃশ্বাস ফেলে মুহু মুহু হায়।' তাঁর কেকা ও কুহু একই সুরে গায় না। বেলা যে যায়... তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।' এই মিলন কোনো দিনই হয়তো হবে না। তাঁর 'পূর্ণমিদং' কোনো দিনই হয়তো 'পূর্ণমদঃ' ছুঁতে পারবে না। তবু তাঁর সমগ্র সাহিত্য জুড়েই এই অনিকেতের অভিসার।

তাই এত দীর্ঘশ্বাস, এত অশ্রুপাত, এত বিরহের গান। স্থূল দৃষ্টিতে যদি কেউ দেখতে চেষ্টা করেন যে কবির সব কান্না কোনো কোনো রক্তমাংসের নারীর জন্যে, তিনি ভুল করবেন। আমি বলবো তিনি গীতবিতানের 'স্বপ্নলোকের' হারিয়ে যাওয়া চাবিটির[২] সন্ধান করুন। উদ্দীপনে তেমন কিছু বাস্তব কারণ থেকে থাকলেও পরিণাম একবারেই অনুষঙ্গহীন।

---

(১) "সর্বদা-সংযুক্ত সমান-স্বভাব দুইটি পাখি (অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই দেহ-বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটি (জীবাত্মা) বিচিত্র-স্বাদ-বিশিষ্ট সুখ দুঃখ রূপ কর্মফল ভোগ করে, অপরটি (পরমাত্মা) কিছুই ভোগ না করিয়া কেবল সাক্ষীরূপে দেখেন।"—শ্বেতাশ্বতর ঔপনিষদ্ (হরফ)।

(২) "...কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি॥ (বিচিত্র-২২)

বৃন্দাবনে 'মানসগঙ্গা' নামে কোনো জলাভূমি ছিল হয়তো। হয়তো বৈষ্ণব কবি সেই দুর্গম মানসগঙ্গার পারের কথাই বলেছেন তাঁর কবিতায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানস-সুরধুনী এই ভূগোলের বাইরে। তাই এই দূরত্ব যোজন-মাইল-কিলোমিটারে মাপা যায় না। এ অপরিমেয়। রবীন্দ্রনাথের এ মানসসুরধুনী পার হবার সাধনাই 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।' কবির কামনা—'এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।' (লিপিকা-সন্ধ্যা ও প্রভাত) কিন্তু তা কি সম্ভব? মানস-সুরধুনী যে নিজেরই মনের অকূল অথৈ সমুদ্র।

লিপিকা-র রচনায় দেখেছি — 'আমার অনন্তের সঙ্গে তার অনন্তের বিরহ' বা 'সেই আকাশ পৃথিবীর বিবাহ মন্ত্রগুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের পরে।' (মেঘদূত)। 'শ্রাবণসন্ধ্যা'-র বর্ষণে বিদ্যাপতির 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া'-র পঙ্‌ক্তিগুলি কবির মনে আসে। তাঁর বিরহে পূজা, প্রেম, প্রকৃতি (বর্ষা) একাকার।

রবীন্দ্রসাহিত্যে কালিদাস-বিদ্যাপতির উদ্দীপন আছে, কিন্তু পরিণতিতে সত্যই রবীন্দ্রনাথ ওই সব উপাদান-আলম্বনকে ছাড়িয়ে গেছেন অভিসারের গানগুলিতে।

'শাপমোচন-এর অরুণেশ্বর 'জননান্তর' বিরহ সঙ্গে নিয়ে এসেছে,—একদিন সে কমলিকার সঙ্গে মিলিত হবে,—কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের বিরহের অভিসার কখনো সার্থক হবে কি? কালিদাসের যক্ষ তো তার প্রিয়ার সঙ্গে মিলিত হবে। গীতবিতানের বিরহী কি কেবল 'জননান্তর সৌহৃদানি' স্মরণ করেই জীবন কাটাবে!

(৫)

তবে কি রবীন্দ্রনাথ পূর্ণের সঙ্গে মিলিত হবার বেদনাই গীতবিতান-জুড়ে বয়ে বেড়িয়েছেন? তা তো বটেই। তবে তিনি আশাবাদী, তাই প্রতীক্ষাও তাঁর ক্লান্তিহীন। তিনি মনে করেন—'ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায়'—

সেই তো ঘরে লবে। (পূজা-৮৩)

তবে সে ঘর কোন্ ঘর? 'আমার' ঘর থেকে টেনে বার করে, 'তাঁর' নিজের ঘরে নেবার জন্যই কবির 'ঈশ্বর' হাত বাড়িয়েছেন। তিনি 'বিজন ঘরে নিশীথ রাতে', যদি শূন্য হাতেই আসেন, তবু কবি জানেন,—সে হাত তার বন্ধুরই হাত। 'দুখের' বেশে এলেও তিনি আসেন, তাঁকে চিনে নিতে হয়। এবং মিলন হতে পারে—সুখের ঘরে নয়—ঈশ্বরের দেওয়া দুঃখের ঘরে,— যাঁকে নিজের বলে ধরতে গেলেই 'দুঃখ', আর 'তাঁর' বলে ধরতে গেলেই 'আনন্দ'। বন্ধু আসবেন, আসছেন, এ আভাস তাঁর গানে পেয়েছি, তাঁর চরণধ্বনি শোনা গেছে। স্বর্গ নেমে আসছে মর্ত্যের সঙ্গে মিলিত হতে, সেখানেই সব বিরহের অবসান।

'নামল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হতে আশিস আনি—
অমর শিখা আকুল হল মর্ত্যশিখায় উঠতে জ্বলে।' (বিচিত্র-৯৭)

'রাজা' নাটকের সুরঙ্গমা-র মতোই গীতবিতানের কবিও বিশ্বাস করেন—

"অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।...
যে নিশীথে আপনহাতে নিবিয়ে দিলেম আলো
তারি মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো।
তোমার পথে চলা যখন ঘুচে গেল, দেখি তখন
আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে।" (পূজা-৮৪)

মানস-সুরধুনী যে কবির অন্তরেই আছে, পাঠক তা অনেক গানেই দেখতে পাবেন। 'আমার দিন ফুরালো' গানটিতে বর্ষা-সন্ধ্যার মেদুর আবহাওয়ায় নায়কের সঙ্গে নায়িকার মিলন হয় কবির ভাবনালোকেই, মানসলোকেই। তাই তিনি ব্যবহার করেছেন—'যেন' 'মনে হয়', প্রভৃতি শব্দ। 'আমি তখন ছিলেন মগন' গানটিতে প্রিয় মিলন হয়েছে স্বপ্নলোকে—

'আমার স্বপ্নস্বরূপ বাহির হয়ে এল, সে যে সঙ্গ পেল
আমার সুদূরপারের স্বপ্নদোসর সাথে...'। (প্রকৃতি-বর্ষা ১০৫)

কালিদাসের 'মেঘদূতম্' আর রবীন্দ্রনাথের দূতপ্রেরণে পার্থক্য আছে। কালিদাসের মেঘ একটি বস্তুজসত্তা, (ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ), আর রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত তাঁর আপন ভাবনা, আপন চিত্ত, আপন গান। কালিদাসের মেঘ-এর গন্তব্য অলকাপুরী, আর রবীন্দ্রনাথের দূতের গন্তব্য অনিকেত, ('জানি নে সে কার উদ্দেশে', 'সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে' 'কোথা যে উধাও হল') অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ওই মানস-সুরধনীর পারে—যার কোনো ভৌগোলিক মানচিত্র নেই। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সৃজন—কালিদাস, বৈষ্ণবপদাবলি প্রভৃতির খড়কুটো দিয়ে একটি প্রায়-নিরালম্ব নীড় সৃষ্টি করা। উদ্দীপন-আলম্বন যে কত অনায়াস মসৃণতায় সৃজনে উন্নীত হতে পারে—গীতবিতান তার উদাহরণ।

(৬)

রবীন্দ্রনাথ বরাবরই আপন জীবনসত্তার ভিতরে, সঙ্গোপনে গভীরতর আর একটি সত্তাকেও বহন করে চলেছিলেন। সেই সত্তার সঙ্গে তার মিলনের বাসনাই তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে চালিত করেছে। তাকে অনেক নামেই চিহ্নিত করা যায়। অসীমের সঙ্গে সীমার মিলন কামনা, চিরনূতনের জন্য মালিন্যক্লিষ্ট ইহজীবনের আর্তি, মর্ত্যের মধ্যে স্বর্গকে খোঁজা, ইত্যাদি।

এখানেই যেমন বিরহবোধ, তেমনি অভিসারেরও শুরু। কিছু গানের মধ্যে ঈশ্বরের আহ্বানের অস্পষ্ট ধ্বনি শোনা যায়। যেমন, 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি—,

সে যে আসে আসে আসে।...' (পূজা-১৩০)

অথবা ওই শুনি যেন চরণ-ধ্বনি রে, শুনি আপনমনে।'... (পূজা ৩৮০)

অথবা চরণধ্বনি শুনি তব নাথ

জীবন তীরে কত নীরব নির্জনে
কত মধু সমীরে।।'...(পূজা-৩৯৯)

যখনই ঈশ্বরের পদধ্বনি আপন অন্তরে অনুভূত হয় এবং সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিতেও লক্ষিত হয়, তখনই ঘর ছেড়ে অভ্যস্ত জীবনযাপন ছেড়ে ভক্ত বরিয়ে পড়ে পথে। এখানেই শুরু অভিসার যাত্রার—ঈশ্বরের জন্যে মানবের এবং মানবের জন্যে ঈশ্বরের।

অভিসার ব্যাপারটি পুরাকালে যেমন ছিল, রবীন্দ্রনাথের কালে তেমন ভাবে বর্তমান ছিল না। তাহলেও সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলি-বাহিত হয়ে অভিসার ব্যাপারটি রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রবেশ করেছে। সমাজে নিন্দিত হলেও কাব্যরসে সিঞ্চিত হয়ে তা পাঠককে বরাবরই আনন্দ দিয়েছে—তা লৌকিক সাহিত্য মারফতই হোক, আর আধ্যাত্মিক ভাবসমৃদ্ধ কবিতাই হোক। এই অভিসারকে বাহন করেই রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রেম তাঁর পূজার গানকে সুন্দর করেছে—এমন কি প্রকৃতি বা প্রেম পর্যায়ের গানকেও উন্নত করেছে। এ যেন এক আবিষ্কার। ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করেও, পুরাতনকে বিদায় না দিয়েও তাকে নতুন সাজে সাজিয়ে তার বাঁশিকে নতুন সুরে ভরিয়ে আমাদের মনকে নতুন প্রাপ্তিতে ভরিয়ে দিয়েছেন কবি। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সৃজন প্রতিভার পরিচয়।

ভানু সিংহের পদাবলিতে রবীন্দ্রনাথ যা কিছু করেছেন—তা বৈষ্ণব পদাবলির অনুকরণ। তার তুলনায় পরবর্তীকালের গানগুলিতে অভিসারের যে প্রয়োগ ও রূপায়ণ তা সত্যই নবসৃজনের মতোই।

(৭)

এবারে বিরহবোধমূলক অভিসারের কয়েকটি গান এবং তার সঙ্গে মেঘদূত সুলভ দূতপ্রেরণ বিষয়ক কিছু গানের কথা বলি।—

কালিদাসের 'মেঘদূতম্' কাব্যের দূত প্রেরণের ভঙ্গিমায় রবীন্দ্রনাথের যা কিছু গান আছে তার মূল্য অনুকরণের উর্ধ্বে উঠে গেছে।

'আমি যে গান গাই'—এ গানে আছে গানকে দূত করে পাঠানোর কথা।—

'আমি যে গান গাই জানিনে সে কার উদ্দেশে।
যবে জাগে মনে অকারণে চঞ্চল হাওয়ায়,
প্রবাসী পাখি উড়ে যায়—
সুর যায় ভেসে, কার উদ্দেশে।।'

এখানে যার উদ্দেশে গানকে দূত করে পাঠানো তার ছবিটি খুব স্পষ্ট নয়—

'কভু জাগে মনে আজো যে জাগেনি এ জীবনে
গানের খেয়া সে মাগে আমার তীরে এসে।।' (প্রেম-২৩১)

'প্রবাসী পাখী উড়ে যায়'—কথাটি অনেক গভীর কথা বলে।

'শ্রাবণের পবনে আকুল বিষন্ন সন্ধ্যায়
সাথিহারা ঘরে মন আমার
প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে চায়
দূর কালের অরণ্যছায়াতলে।'...(প্রেম-২৬৬)

মানুষ কি এখনো প্রবাসী? সে কি কোনো সুদূর আরণ্যক যুগের প্রাচীন আপন নিকেতন থেকে নির্বাসিত হয়ে যক্ষের মতো একাকী। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে, গানে এমন কথা অনেকে বার শোনা গেছে।

—'কোন্ গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে
কোন্ দূর জনমের কোন্ স্মৃতিবিস্মৃতি ছায়ে॥'... (প্রেম-২৬৮)

প্রবাসী বলেই তাকে দূত পাঠাতে হয় ফেলে আসা আপন জনের উদ্দেশে। কালিদাসের ক্ষেত্রে, যক্ষের প্রিয়জন অনির্দিষ্ট নয়, এবং তার সঙ্গে মিলনের আশ্বাসও আছে—অভিশপ্ত একবছরের ওপারে। কিন্তু, রবীন্দ্রকাব্যে যে বিরহের গান—সেখানে তো এমন কোনো মিলনের আশ্বাস নেই। সেখানে তো বৈষ্ণব কবিতার শ্রীরাধার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাসই ধ্বনিত হয়ে ফিরছে।

'কৈসে করবি অভিসার
হরি রহ মানস সুরধুনী পার।'

যক্ষের মেঘ পর্বত নদী পার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু নদী যেখানে 'মানস-সুরধুনী'—সেখানে তা অতিক্রম কোনো মেঘের ভেলার পক্ষেই সম্ভব নয়। আপন মনের গহনে কবির যে সত্তাটি বিরাজ করছে, সেখানে পৌঁছাবার ক্ষমতা একমাত্র গানেরই আছে।

এই মানস অভিসার ব্যাপারটা বৈষ্ণবসাহিত্যে শ্রীরাধার ভাবসম্মিলনের স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। সমস্ত যৌবন বিরহে অতিক্রম করে রাধা শেষকালে এমন অনুভবের জগতে এসে পৌঁছালেন যে তাঁর সমস্ত বিরহকে, সমস্ত শূন্যতাকে, আচ্ছাদন করে রয়েছে কৃষ্ণভাবনা—ফলে সমস্ত জগতই তাঁর কৃষ্ণময়।

রবীন্দ্রসংগীতের বিরহী নায়িকার অভিসারও মানস-অভিসার। কালিদাসের যক্ষের দূত-প্রেরণ আর বৈষ্ণব পদাবলির রাধার মানস-অভিসার উভয়ে যেন মিলে মিশে গেছে গীতবিতানের গানগুলিতে। রবীন্দ্রসংগীতের নায়িকা চলে গেছে 'মানসলোকের নিরুদ্দেশে।'

উত্তর মেঘ এবং ভাবসম্মিলন—উভয়েই রবীন্দ্রসংগীতে মিলিত হয়ে গানগুলিকে ভাবী দূরকালের সম্পদ করেছে। যক্ষ দূত পাঠিয়েছেন মেঘকে। রবীন্দ্রনাথ দূত পাঠালেন আপন হৃদয়কে। আপন ভাবনা, আপনার গান এবং আপন প্রতীক্ষার পথচাওয়া দৃষ্টিখানিকেই করলেন তাঁর 'মেঘদূত'।

দু-একটি উদাহরণ—

'কোথা যে উধাও হল মোর মন উদাসী
আজি ভরা বাদরে।...
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে অশান্ত বাতাসে॥' (প্রকৃতি-বর্ষা-৮০)

কিংবা 'নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে—

'ওগো প্রবাসিনী, স্বপনে তব
তাহার বারতা কি পেলে॥' (প্রকৃতি-বর্ষা-১৩৫)

কিংবা

'পথে চেয়ে থাকা মোর দৃষ্টি খানি।
শুনিতে পাও কি তাহার বাণী।'...(প্রকৃতি-বর্ষা ১২৮)
'আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে
আমার ভাবনা যত উতল হল অকারণে॥' —এ গানটিতে মানস

অভিসারের কথা আছে উজ্জ্বলতর ভাবে।

'সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে
মানসলোকে গানের শেষে
চিরদিনের বিরহিণীর কুঞ্জবনে॥' (প্রকৃতি-বর্ষা-৬৫)

'ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী' গানটিতে নায়িকা আসবে অভিসারে, তার জন্যে 'অভিসারের পথে পথে স্মৃতির দীপ জ্বালা...'।

'আজি পরজে বাজে বাঁশি
যেন হৃদয়ে বহুদূরে আবেশবিহ্বল সুরে।
বিকচ মল্লিমাল্যে
তোমারে স্মরিয়া রেখেছি ভরিয়া ডালা॥' (প্রেম-২৩৩)

'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার'—গানটিতে বিরহী প্রিয় আসছে অভিসারে। সেখানে অভিসারপথের দুঃখকষ্টের কথা আছে। 'ঝরঝর বরিষে বারিধারা' গানটিতেও গৃহহারা পথবাসীকে অধীরা তরঙ্গ-আকুলা যমুনার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'আজি ঝড়ের রাতে' গানটি প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের 'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা' পদটি মনে আসে। এ-পদটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত ব্যাখ্যা-"ভগবান আমাদিগকে কখনই ছাড়েন না...সংসারাসক্তচিত্ত আমরা সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাট ছাড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারি না। তিনি দুর্গম পন্থায় দাঁড়াইয়া আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন—পাপীর কাছে আসিতে কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁহার পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়, তথাপি তিনি আমাদের ত্যাগ করেন না।' (বৈষ্ণব পদাবলী-চয়ন, কলি,' বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭২)

(৮)

'ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী' গানটির অভিসারের কাল বোঝা গেলেও ঋতু বোঝা যাচ্ছে না। 'আজি ঝড়ের রাতে' গানটির কাল রাত্রি, ঋতু বর্ষা। 'প্রখর তপন তাপে' গানটির সময় গ্রীষ্মের দুপুর। গানটির ভাববস্তু ঈশ্বরমুখী। এরমধ্যে আধ্যাত্মিক অভিসারের তীর্থযাত্রা আছে। যাত্রী জানে না কবে কার আহ্বানে সে বাহির হয়েছে।—

'বাহির হয়েছি কবে কার আহ্বান রবে,
এখনি মলিন হবে প্রভাতের ফুলহার।'

পথে এসেছে ক্লান্তি। বুকে বাজে সংশয়ের কম্পন। তার সমস্ত বেদনার বিরহের গানকে সে সমর্পণ করতে চায় তার উদ্দিষ্টের কাছে।—

'আজি সারাদিন ধরে প্রাণে সুর ওঠে ভরে,
একেলা কেমন করে বহিব গানের ভার॥
খোলো খোলো খোলো দ্বার॥'—

'পথ এখনো শেষ হল না, মিলিয়ে এলো দিনের ভাতি।
তোমার আমার মাঝখানে হায় আসবে কখন আঁধার রাতি।'—

দুটি গানই ভাবরসে সমধর্মী, সময়ের দিক থেকেও একই,—সন্ধ্যা-আগমনে ক্লান্ত। এখনো দ্বার খোলেনি। পথিকের সংশয় ঘোচেনি। যার জন্যে আসা—তার দেখা পাওয়া যাবে কি? তবে 'পথ এখনো'-তে পথিকের মনে আশা আছে।—

'শেষ কথাটি জ্বালবে এবার
তোমার বাতি আমার বাতি।'

গানটি 'পূজা-র অন্তর্গত, যদিও পূর্বের গানটি গ্রীষ্ম (প্রকৃতি) ঋতুর পর্যায়ভুক্ত।

(৯)

'তিমিরময় নিবিড় নিশা।'

বৈষ্ণব পদাবলিতে যেমন আছে সখীদের শঙ্কিত চিত্তে বারণ, মিনতি এবং রাধার অপ্রতিরোধ্য কৃষ্ণাকর্ষণবেগের টানে যেমন আছে সে সব তুচ্ছ করে অভিসারে যাওয়া,—রবীন্দ্রনাথের এ-গানটিতেও তেমনি আছে বাধা বিপত্তির বর্ণনা এবং তা তুচ্ছ করে তীর্থযাত্রীদের পথযাত্রা। তীথযাত্রীদের উদ্দেশে আকুল প্রশ্ন—

'একেলা ঘন ঘোর পথে পান্থ কোথা যাও।'

পান্থ-র মনে আছে অভয় আত্ম-বিশ্বাসের সুর।—

'দীপ হৃদয়ে জ্বলে,
নিবে না সে বায়ুবলে
মহানন্দে নিরন্তর এ কী গান গাও।
সমুখে অভয় তব, পশ্চাতে অভয় রব,—
অন্তরে বাহিরে কাহার মুখে চাও।' (বিচিত্র-১০১)

গানটিকে নিঃসংশয়ে পূজা পর্যায়ে রাখা যেত (গীতবিতানে আছে 'বিচিত্র' পর্যায়ে) যেমন আছে 'যেতে যেতে একলা পথে' গানটি—বর্ষার পটভূমিকা থাকা সত্ত্বেও।

'যেতে যেতে একলা পথে' গানটিতে এ অভিসার যাত্রার একটি সুন্দর চলচ্ছবি আছে। প্রদীপ হাতে অভিসারের পথে যেতে যেতে ঝড়ের হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে। এই অন্ধকারে কী করে পথিক যাবে তার অভিসারের পথে? তার তীর্থ মন্দিরে? প্রিয় মিলনে? সে জানে তার আপন নিরুপায় অক্ষমতার কথা। তাই সে আত্মসমর্পণ করে ঝড়েরই হাতে। ঝড়ই যে তার 'সাথি'। আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক গানের ইতিহাসে এ-গানটি একটি শ্রেষ্ঠ অনুভবের গান। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা পাওয়া যাবে এ-গানটিতে। যিনি আকর্ষণ করেন তিনিই পথের বাধাকে পার করে দেবেন। যেমন অন্য গানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'যা হবার তা হবে।
যে আমারে কাঁদায় সে কি অমনি ছেড়ে রবে?

পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে পথ যে কোথায় সেই তা জানে,....
-(পূজা-৮৩)

বলেছেন আরও একটি গানে—

'অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক...
ধরায় তখন তিমির গহন রাতি।'
ঘরের লোকে কেঁদে কইল মোরে—
'আঁধারে পথ চিনবে কেমন করে'
আমি কইনু 'চলব আমি নিজের আলো, ধরে,—
হাতে আমার এই যে আছে বাতি।'

নিজের অহংকারের আলোতে কি পথ চিনে তাঁর কাছে যাওয়া যায়?—

'চেয়ে দেখি পথ হারিয়ে ফেলেছি কোন্ কালে...।
...'শক্তি আমার রইল না আর কিছু।
সেই নিমেষে হঠাৎ দেখি কখন পিছু পিছু।
এসেছে মোর চিরপথের সাথি।।' (পূজা-৩৫১)

'যেতে যেতে একলা পথে' গানটিতেও তাই—অভিসারিকা, ভক্ত বা তীর্থ পথিকের আপন শক্তি নিঃশেষিত—তখন তাকে নির্ভর করতে হয় আকর্ষকের পরেই। যিনি ডেকেছেন, তিনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। তাই বলা যায়-

'...ঝড়কে পেলেম সাথি।।...
যে পথ দিয়ে যেতে ছিলেম ভুলিয়ে দিল তারে—
আবার কোথা চলতে হবে গভীর অন্ধকারে।
বুঝিবা এই বজ্ররবে নূতন পথের বার্তা ক'বে—
কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে প্রভাত হবে রাতি।' (পূজা-২০৫)

প্রাচীন সাহিত্যে অভিসারের রাশি রাশি পদ আস্বাদন করার পরেও রবীন্দ্রনাথে এসে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানে, বিশেষত পূজার গানে, অভিসার এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ভক্ত রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরবিরহের আকুলতাকে সাহিত্যমহিমার এমন এক গভীর উপলব্ধির পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন যা এক কথায় অনাস্বাদিতপূর্ব। দুঃখকে অনুভবের এমন এক শীর্ষে এনে স্থাপিত করেছেন—যার তুলনা প্রাক্-রবীন্দ্র সাহিত্যে নেই।

ধর্মীয় বাতাবরণে বসে বৈষ্ণব কবিরা যা দিয়ে গেছেন—রবীন্দ্রনাথ নাস্তিক্যের যুগের সংশয়ের আবহাওয়ায় বসে পাঠককে তার চেয়ে অনেক বেশি দিতে পেরেছেন। সব উপাদান উপকরণ বা উদ্দীপনের উদাহরণই তো প্রাচীন, তবু রবীন্দ্রসংগীতে তা নতুন মহিমা পেয়েছে।

'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি' গানটিতে দেখেছি বা 'অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক' গানটিতে দেখেছি—ভক্তের অভিসার কুসুমাস্তীর্ণ পথে নয়, দুঃসহ কষ্টের, বাধা-বিপত্তি বিপর্যয়ের পথেই হয়। ঈশ্বরের অভিসারও তেমনি

দুঃসময় দুঃখ বিপদ ঝড় ঝঞ্ঝার বাহনেই ভর করে আসে। 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।'

ওই দুঃসময়-বিপর্যস্ত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর অভিসারে আসছেন—একে মেনে নেওয়াতেই প্রেমের পূর্ণতা—ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণমিলন। 'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে তুমি আমার বন্ধু' বা 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে'—গানগুলিতে এই দুঃসময়ের চিত্র আছে। 'যে রাতে মোর' গানটিতে ঝড়ের আগমনে বিহ্বল প্রেমিক বুঝতে পারেনি— 'ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি!' ঝড়ের রাত্রি পার হবার পরে প্রেমিক বুঝতে পারে—

'সকালবেলা চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি
ঘর-ভরা মোর শূন্যতারই বুকের পরে।' (পূজা-২২০)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা তার অগ্রিম আভাস রবীন্দ্ররচনায় পাওয়া যায় 'বলাকা' কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে। ব্যক্তির ক্ষেত্রেই হোক বা সমগ্র মানবসমাজের ক্ষেত্রেই হোক, বা সাধকের জীবনেই হোক মুক্তির আবির্ভাব আসে দুঃসময়ের মধ্য দিয়েই। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন কালান্তর বা যুগান্তর আসন্ন। তারই প্রসববেদনা সমগ্র বিশ্বের আবহাওয়ায়। তাঁর প্রত্যয় ছিল—'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন'।

ব্যক্তিগত ভাবনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ এই প্রত্যয়ের কথাই বলেছেন তাঁর দুঃখাভিসারের গানে। 'বলাকা'র একটি কবিতায় (সংখ্যা-২) তাঁর ওই প্রত্যয়ের প্রেরণাতেই বলেছেন—'এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।' তাকে তো বরণ করতেই হবে।—...

'কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না।
চরণে তোর রুদ্র তালে
নূপুর বেজে উঠবে না?
এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল,—সকল তেজে
রক্ত পথে আয় রে সেজে
আয় না বধূর বেশে গো।
ওই বুঝি তোর এল সর্বনেশে গো।'

এ কবিতাটির (৫-২-১৩২১) তিন মাস পরে রচিত (২৬-৫-২১) 'যেতে যেতে একলা পথে' গানটিতেও এই 'সর্বনেশে'র জন্য অভিসারের কথা আছে। এর ৮মাস পূর্বে লেখা (১৪-৬-২০) একটি গানের কথা বলি—যে গানে এই সর্বনেশে রুদ্রকে বন্ধু হিসেবে বরণ করার আনন্দের কথা আছে। এই দুঃখদাতা রুদ্রকে পাওয়া যাবে 'দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে' গানটিতেও। বর্তমান আলোচ্য গানটি এরকম।—

'লুকিয়ে আস আঁধার রাতে তুমি আমার বন্ধু।
লও যে টেনে কঠিন হাতে তুমি আমার আনন্দ।'

দ্বিপঙ্‌ক্তিক প্রতিটি পদেই এই বন্ধু এবং আনন্দকে বরণ করা হয়েছে। সুখ ও

দুঃখের যোগফলেই যে পূর্ণানন্দময় ঈশ্বর—এ বোধ কখনোই রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে যায়নি। পরের পঙ্‌ক্তিগুলি—

'দুঃখ রথের তুমিই রথী, তুমিই আমার বন্ধু।
তুমি সঙ্কট তুমিই ক্ষতি, তুমি আমার আনন্দ।।
শত্রু আমারে করো গো জয়, তুমিই আমার বন্ধু
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়, তুমি আমার আনন্দ।
বজ্র এসো হে বক্ষ চিরে, তুমি আমার বন্ধু।
মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে, তুমি আমার আনন্দ॥ (পূজা-৯০)

(১০)

'শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা-র একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনের পরে, শ্রীকৃষ্ণের অকল্পনীয় অপরিমেয় ঐশ্বর্যবিভূতি দর্শনে বিস্ময়াপ্লুত দীনমন্য অর্জুন বলেছেন—[১] তোমাকে এতদিন বন্ধু বলে জেনেছি বলে কত না অসম্মান করেছি, কখনো নাম ধরে ডেকেছি, কখনো মূঢ়তায় হাস্য পরিহাসে একাকী বা লোকসমাজে তোমাকে অবমাননা করেছি, একই শয্যায় তোমার সঙ্গো কখনো বসেছি, শয়ন করেছি,—হে অচ্যুৎ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। (১১/৪১/৪২)। রবীন্দ্রনাথের—

'আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে—
তখন কে তুমি তা কে জানতো,
তখন ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে,
জীবন বহে যেত অশান্ত।' —ইত্যাদি গানটিতেও অনুরূপ অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে। এবং অর্জুন 'বিশ্বরূপ'— এর পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের যে সখা-রূপকেই (সখেব সখ্যু : ১১/৪৪) দেখতে চাইলেন, —বর্তমান রবীন্দ্রসংগীতটি বা গীতবিতানের অধিকাংশ গানেই তাই দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ ঈশ্বর বন্ধু, প্রিয়জন। তবে এখানে কোনো অপরাধবোধ বা ক্ষমা চাওয়া নেই। গানটিকে তাই অনুকরণ না বলে উত্তরণই বলা ভালো।

...'তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত
যেন আমার আপন সখার মতো,
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলাম ছুটে
সেদিন কত-না বন-বনান্ত॥

(১) 'সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ (১১/৪১)
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঅসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঅথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ (১১/৪২)

...'হঠাৎ খেলার শেষে আজ কি দেখি ছবি—
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি,
তোমার চরণপানে নয়ন করি নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত॥ (পূজা-৬৪)

'যথা নদীনাং বহবোঅম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি। ...(গীতা ১১/২৮)

নদীরা সব সমুদ্রগামী—এধরনের চিত্র উপমা রবীন্দ্রনাথের গানে নতুন রূপ পেয়েছে—
"...তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে।..." (পূজা-৩৫৯)

"তোমা-পানে ধায় প্রাণ সব কোলাহল ছাড়ি,
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে।" (পূজা-৩৭০)

The Lord is my shephard; I shall not want...Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life : and I will dwell in the house of the lord for ever.-PSAM-23/1, 23/6, —of David/Bible

মেষপালক যীশুর বা গোচারণকারী কৃষ্ণের পশুচারণ এর ঘটনার প্রভাবেই যে রবীন্দ্রনাথের গান প্রভাবিত হয়েছে—এমন বলছি না। তবে ঘটনাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর গানে উপস্থিত করেছেন তা অতুলনীয়।-

"এই তো তোমার আলোকধেনু সূর্যতারা দলে দলে-
কোথায় বসে বাজাও বেণু চরাও মহা গগন তলে॥
...আশাতৃষা আমার যত ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত-
মোর জীবনের রাখাল ওগো, ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে॥" (পূজা-৫২০)

গীতবিতানের বাদীপুরুষ (protagonist) আপন বেদনা নিবেদন করেছেন তাঁর প্রিয়তমের উদ্দেশে। উপাদান যাই হোক, তিনি নিজস্ব প্রতিভার প্রাণরসে প্রস্তুত করছেন তাঁর অঞ্জলি—।

(১১)

গীতবিতানের এই আংশিক আলোচনায় উদ্ধৃত উদাহরণগুলির উপাদান সবই পূর্ব পরিচিত। সেই নৌকাবাওয়া, সেই বর্ষাবাদলের অভিসার, সেই তীর্থযাত্রা— এ সবই আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে, বৈষ্ণব পদাবলীতে, লোকসাহিত্যে—পেয়েছি। তবু গীতবিতানের এ-গানগুলি যে আমাদের অনভিজ্ঞাত বিস্ময়ের জগতে পৌঁছে দেয়,—তার কারণ,— রবীন্দ্রনাথের সৃজন প্রতিভা। এর দ্যুতি এখনো আমাদের সংস্কৃতির মধ্যগগনে।

(১২)

শিল্পকলায় উপাদানটা বড়ো কথা নয়। উপাদানকে আনন্দে পরিণত করাটাই শিল্পীর কাজ। এ কাজটি যিনি করেন, তাঁকেই বলি স্রষ্টা—তিনি বিধাতাই হোন আর কবিই হোন। ধর্মসংস্থাপনের জন্যে (গীতা) স্রষ্টাকে অনেক ঝাড়াই বাছাই, সংশোধন-সংযোজন করতে হয়েছে, কবিকেও বাস্তব অথবা বিধাতার দেওয়া প্রাকৃত আকর-উপকরণকে অনেক গ্রহণ-বর্জন-উদ্ভাবন দিয়ে তাঁর কাব্য-গান নির্মাণ করতে হয়। গীতবিতান তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃজন।

গীতাঞ্জলি এবং..........

(১)

'গীতাঞ্জলি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। কাব্যটিতে গানের/কবিতার সংখ্যা ১৫৭। এর মধ্যে ৮৫টিতে সুর দেওয়া হয়েছে। বাকি কবিতাগুলি গানের আকারে থাকলেও তা সুরবন্ধ গান নয়।

গীতাঞ্জলির গানের মধ্যে কবির ঈশ্বর ভাবনার এক নবরূপ প্রকাশিত হয়েছে। তা পূর্বেকার গানগুলি থেকে স্বতন্ত্র। পূর্বেকার পূজার গানগুলির অধিকাংশ রচিত হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদির প্রয়োজনে। তাদের আকার-প্রকার আলাদা। তবে প্রয়োজন ভিত্তিক রচনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের কবিসত্ত্বার প্রকাশ অবরুদ্ধ থাকে নি। ঈশ্বরের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক ভক্ত কবির গানে তখনো দেখা গেছে। 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে'— এর মতো গান তার প্রমাণ। এ গান শুনেই মহর্ষি তাঁর এই তরুণ সন্তানটিকে পুরস্কৃত করেছিলেন। প্রয়োজন ভিত্তিক রচনাগুলির মধ্যেও কবি-প্রতিভার স্পর্শ নেই তা নয়। তবু 'গীতাঞ্জলি'-র যুগের গানে ঈশ্বরপ্রেম ও কবিপ্রতিভার যুগল সম্মিলন ঘটে তাকে সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় করে রেখেছে। এতদিন যে ঈশ্বর ছিলেন জ্ঞানসাধ্য তিনি যেন ধরা দিলেন প্রেমের বন্ধনে। মানব, প্রেম, প্রকৃতি ও ঈশ্বর যেন একসূত্রে আবন্ধ হয়ে অসীমের চরণে গীতাঞ্জলি রূপে নিবেদিত হয়েছে।

গীতাঞ্জলি-র গান রচিত হবার পূর্বে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু, কন্যা রেণুকার মৃত্যু, পিতা দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু— এবং সবচেয়ে বেদনাদায়ক পুত্র শমীন্দ্রের মৃত্যু— কবিকে স্বভাবতই বিচলিত করেছে। ফলে চিরবন্ধু চিরনির্ভর ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও নির্ভরতা বৃন্ধি পেয়েছে। এবং গীতাঞ্জলি-র যুগের গানে ঈশ্বরপ্রেমের আকুল আন্তরিকতাও সেভাবেই অধিকতর প্রকাশ পেয়েছে।

তবে কবি যতই আহত হন— সব বেদনাই তাঁর চিত্তবীণার তন্ত্রে তন্ত্রে সুর হয়ে বেজে উঠে, ভাব থেকে রসে পরিণতি পেয়েছে। গীতাঞ্জলিতে তার পরিচয় আছে। ফলে 'ব্রহ্মসঙ্গীত' রবীন্দ্রনাথের হাতে যথার্থ আধ্যাত্মিক গানে পরিণত হয়েছে। অনেকের মতে এগুলি যথার্থ ব্রহ্মসঙ্গীত নয়। আমার মনে হয় ব্রহ্মের সংকীর্ণ সংজ্ঞা এ যুগের গানে ব্যাপকতা পেয়েছে এবং এগুলি ব্রহ্মসঙ্গীতেরই নব রূপায়ণ। এ গান সহজ সরল ঈশ্বরপ্রেমের গান। এর জন্যে শ্রোতাকে কোনো বিশেষ মত-ধারণায় দীক্ষিত হতে হয় না। আঁদ্রে জিদ তাই বলেছিলেন- '-what I admire in Gitanjali is that one does not need any preparation to read it.'

১৯১০-এ শিল্পী রোদেনস্টাইন কলকাতায় আসেন এবং শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখে আকৃষ্ট হন এবং রবীন্দ্রনাথের একটি

স্কেচ-ও এঁকে নিয়ে যান। সেই সময়েই জার্মান দার্শনিক কাইজারলিং-ও কলকাতা এসে কবিকে দেখে মুগ্ধ হন। তাঁর মনে হয় কবি এক '......guest from higher, more spiritual world. Never perhaps have I seen so much spiritualised substance of soul condensed into one man.' (রবীন্দ্রজীবনী-২)।

ইতিমধ্যে অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্ররচনার কিছু কিছু ইংরেজিতে অনুবাদ করে Oxford-এর ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করেন এবং তাঁদের মধ্যে এ ধারণার প্রতিষ্ঠা করেন যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের এক মহৎ কবি। এ সময়ে শিল্পতাত্ত্বিক আনন্দ কুমারস্বামীর সহযোগিতায় অজিত কুমারের কিছু অনুবাদ Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর সঙ্গে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, পান্নালাল বসু প্রমুখের রবীন্দ্র কবিতার অনুবাদও প্রকাশিত হতে থাকে।

এর পরে লনডনে ১৯১২-তে রোদেনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আবার দেখা হয়। ইতিমধ্যে রোদেনস্টাইন সিস্টার নিবেদিতার অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি পড়েন।

রবীন্দ্রনাথ নিজের অনূদিত গীতাঞ্জলি-র কবিতার একটি খাতা তাঁকে দেন। সে খাতার পাতায় পাতায় ছিল গীতাঞ্জলি-র ইংরেজি পাণ্ডুলিপি।

রোদেনস্টাইন এই অনূদিত গীতাঞ্জলির কপি ব্রাড্‌লে, স্টপফোর্ডব্রুক, ইয়েট্‌স্ প্রমুখ কয়েকজন বিদ্বদ্‌জনকে পড়তে দেন। এসময় ইংল্যাণ্ডের আরও কিছু চিন্তাবিদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে।

কবিতাগুলি সম্পর্কে ব্রাড্‌লে-এর মন্তব্য এরকম— 'It looks as though we have at last a great poet among us again. (ঐ) স্টপকোর্ড ব্রুকের মন্তব্য I have read them with more than admiration; with gratitude for their spiritual help, and for the joy they bring and confirm and for the love of beauty which they deepen and for more than I can tell. I wish I were worthy of them. (ঐ)

রোদেনস্টাইন তাঁর বাড়িতে ৩০শে জুন, ১৯১২-তে এক সাহিত্যপাঠের (রবীন্দ্রকবিতা পাঠের) আসরে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের আমন্ত্রণ করেন। সেখানে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন। এরপরে জুলাই মাসে একটি হোটেলে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়— ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে। (এই ইণ্ডিয়া সোসাইটি-ই প্রথম রবীন্দ্রকবিতা প্রকাশের বন্দোবস্ত করে।) এই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন এইচ. জি. ওয়েলস, মে. সিন্‌ক্লেয়ার এবং আরো সব বিখ্যাত সাহিত্যকেরা। কবি ইয়েট্‌স্ ছিলেন সভাপতি। তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে বললেন— 'আমার সমসাময়িক এমন কোনো ব্যক্তিকে আমি জানি না যিনি এমন কোনো রচনা ইংরেজি ভাষায় রচনা করিয়াছেন এই কবিতা গুলির সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে।' (ঐ) তাঁর আবৃত্তির তালিকায় 'আজি শ্রাবণ ঘন গহনমোহে' গানটিও ছিল।

ব্র্যাড্‌ফোর্ড লিখেছেন— 'যেদিন প্রথম বাইবেলের কয়েকটি অংশ পাঠ করিয়াছিলাম সেই দিনটি বাদে, আমার মনে পড়ে না যে গতরাত্রে যেমন অনুভব করিয়াছিলাম

জীবনে আর কোনোদিন সেরূপ অনুভব করিয়াছি কিনা।' কুমারী সিনক্লেয়ার লিখলেন— 'আপনার কবিতাগুলির যে কবিত্ব হিসেবে একটি সম্পূর্ণতা এবং অখণ্ড সৌন্দর্য আছে মাত্র তা নয়— কিন্তু যে অতীন্দ্রিয় জিনিস বিদ্যুতচমকের মতো আসে, যাহা অনিশ্চয়তার বেদনায় অন্তরকে পীড়া দিতে থাকে— সেই তাহারই একটি চিরন্তন রূপ ইহাদের মধ্যে আমি পাইলাম।' (ঐ) তিনি এ প্রসঙ্গে St. John of the Cross-এর Dark Night of the Soul কবিতাটির উল্লেখ করেছিলেন। তিনি আরো বললেন- 'আপনি একটি পরিপূর্ণ অদ্বৈতবোধে এবং একটি অধ্যাত্ম তত্ত্বদৃষ্টিতে St John এবং অপর সকল খ্রীষ্টান কবিকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।' (ঐ)।

১৯১৩ সালের ১৩ই নভেম্বর এই গীতাঞ্জলির জন্যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন। পুরস্কার ঘোষিত হবার পরে নানা পত্রিকায় সে সংবাদ প্রচারিত হয়। সে সংবাদগুলিতে অনেকক্ষেত্রেই কবিকে Hindoo, Bengali Prophet, Hindu Prophet, Sage ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। যদিও 'হিন্দু' শব্দটি 'ভারতীয়' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে— তবে তাঁর কবিতার Mysticism এর উল্লেখের মধ্যে কোনো দ্ব্যর্থ নেই।

আমরা কেউ রবীন্দ্রনাথকে Godman বা sage বা অবতার বলতে চাই না, তবে Mysticism বা ঈশ্বরের সঙ্গে মরমীভাবনার সম্পর্কটিকে তো এড়িয়ে যেতে পারি না। Shelly বা Wordsworth কেও আমরা mystic বলে থাকি।

'গীতাঞ্জলি'র কবিতার মধ্যে ওই বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী কী পেয়েছিলেন? ভাষান্তরে তো ছন্দ ছিল না, অনুপ্রাসও ছিল না, গানের সুরও ছিল না। তাঁরা একে গদ্যকবিতা হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রমতে কাব্যগুণ অবশ্যই ছন্দের উপরে নির্ভরশীল নয়। রসাত্মক হলেই সে বাক্য কাব্য বলে গৃহীত হতে পারে,— গদ্য হলেও। 'লিপিকা'-র ছন্দোহীন রচনাগুলি থেকেও তো আমরা কবিতার রসই গ্রহণ করি। রবীন্দ্রনাথের হাতে 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক' প্রভৃতিতে গদ্যকবিতা একটি স্বীকৃত আঙ্গিক হিসেবেই দেখা দিয়েছে। তাঁর গানের সুরেও কখনো কখনো পদাবলী কীর্তন, কথকতার মতো ছন্দোহীন স্বরবিন্যাস নতুন বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে।

ভাষান্তরিত গীতাঞ্জলির কাব্যগুণ কেবল রসগর্ভতার ওপরে নির্ভর করেছে। এবং রস যেহেতু সংবেদনশীল— তাই শ্রোতার হৃদয়ে তার সংক্রমণের মাত্রা দেখেই আমরা গীতাঞ্জলির কাব্যশক্তিকে অনুমান করতে পারি।

অনেকে মনে করেন— রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ মোটেই উন্নত মানের হয়নি। সে বিষয়ে বিচার আমার ক্ষমতার বাইরে। তবে নোবেল পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলী বা ৩০শে জুন, ১৯১২-এর সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন বা গীতাঞ্জলির কবিতার পাণ্ডুলিপি পকেটে নিয়ে যাঁরা পথে ঘাটে চলতে ফিরতে-সুযোগ পেলেই কবিতাগুলির ওপরে চোখ বুলিয়েছেন,— সেইসব বিচারক, কবি, সাহিত্যিকরা তো ওই অনুবাদেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। একথা অনুমান করা যেতে পারে বাংলা গীতাঞ্জলির তুলনায় অনূদিত গীতাঞ্জলি কিছুটা ম্রিয়মান। অরবিন্দ ঘোষের মতো কেউ কেউ তাই মনে করেছেন।

গীতাঞ্জলির অঞ্জলি কার উদ্দেশ্যে অর্পিত? অবশ্যই, ঈশ্বরই তার উদ্দিষ্ট। এই ঈশ্বর প্রেম সার্বজনীন। তাই পশ্চিমের শ্রোতারাও তাঁদের ঈশ্বর প্রেমের উদ্দীপক হিসেবে একে গ্রহণ করেছেন। আর St. John of the Cross-এর 'Dark Night of the Soul'-এর মধ্যে ঈশ্বরমিলনের অভিসার, আর্তি, সাধনা, ব্যর্থতা ও আনন্দের যে আন্তরিক সংবেদ, ঈশ্বরের সঙ্গো প্রত্যক্ষ যোগ-এর সীমাহীন যে আনন্দানুভূতির প্রকাশ,—তা প্রাতিষ্ঠানিক বিধিনিয়মানুশাসন- ক্লান্ত মানুষকে আনন্দ দিয়েছে,—গীতাঞ্জলিতে আবার তার আবির্ভাবে একালের মরমীরা স্বভাবতই বিমোহিত হয়েছেন।

গীতাঞ্জলির গানগুলির উদ্দিষ্ট ঈশ্বর। এই ঈশ্বরমুখী আধ্যাত্মিকতার কারণ হিসেবে অনেকে মনে করে থাকেন যে সমসাময়িক বা কিছুকাল পূর্বের কয়েকটি মৃত্যুর ঘটনার আঘাতে রবীন্দ্রনাথ এই আধ্যাত্মিকতার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। অত্যন্ত নিকটজনের মৃত্যু, পরিবেশ বা সমাজের বিরূপ ব্যবহার—বা নানাবিধ হতাশা— এসব কারণ স্বভাবত মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে তোলে। গীতাঞ্জলিও হয়তো তারই অনুপ্রেরিত প্রকাশ।

তবে আমার ধারণা, অতি শৈশব থেকেই উপনিষদ-গীতার ভাবাদর্শে রবীন্দ্রনাথের মনোভূমি প্রস্তুত হয়েছিল। তাঁর মনের আধ্যাত্মিকতা এবং ঈশ্বরমুখীনতা এভাবেই গড়ে উঠে তাঁকে সমস্ত রকম দুঃখ-আঘাতকে বক্ষে ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছিল। তিনি রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক আদর্শকে শ্রদ্ধার সঙ্গো অনুসরণ করেছিলেন এবং তাই লিখতে পেরেছিলেন—'দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝংকারে' (১৯১০)। গীতাঞ্জলিতে এসে তিনি ঈশ্বরের কাছে নতুন করে মৃত্যুশোকের সান্ত্বনা চাননি বা কোনো পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে ঈশ্বরের শরণ নেন নি। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন—সব শোক দুঃখ বিপদ সহ্য করার ক্ষমতা।—

'দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাইবা দিলে সান্ত্বনা,—
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।' (১৯০৭)

ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার যুগ থেকে তাঁর সব আধ্যাত্মিক ভাবনাগুলিই পূর্ণ পরিণত রূপ পেয়েছে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালিতে। যেমন, 'চরণধ্বনি শুনি তব নাথ (১৯০৩)' পরিণতি পেয়েছে 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি' (১৯১০) গানটিতে। যেমন 'আমি হেথায় থাকি' প্রভৃতি অনেক গানে ঈশ্বরকে গান শোনাবার যে বাসনা গীতাঞ্জলিতে প্রকাশ পেয়েছে—তার বীজ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে 'মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত...' গানটিতে।

'... ক্ষুদ্র এই কণ্ঠলয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত॥...
গাহে যেথা রবিশশী সেই সভা মাঝে বসি
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত॥ (১৮৮১)

'গভীর রাতে ভক্তি ভরে (১৯০৫)' গানটির ভাবটি—('আজ যদি রোস ঘুমে মগন চলে যাবে শুভলগন, লক্ষ্মী এসে যাবেন সরে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে 'সে যে পাশে এসে বসেছিল' (১৯১০) গানটিতে।

আকৈশোর লালিত অর্জিত যে ঈশ্বর-নির্ভর আধ্যাত্মিকতা তাই উন্নতরূপে প্রেম-স্নিগ্ধ পূর্ণ রূপে, বিকসিত হয়েছে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির গানে। ১৮৮১ সালে যে ঈশ্বর ছিলেন 'মহা সিংহাসনে বসি'—গীতাঞ্জলির যুগে তিনি নেমে এসেছেন ভক্তের কাছে। 'তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে। মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়ালে নাথ থেমে' ॥

স্পেনের মধ্যযুগীয় কবি ও Mystic St. John of the Cross (মৃত্যু ১৫৯১)-এর Dark Night of the Soul কবিতাটি তাঁর Ascent of Mount Carmel কাব্যের অনুসৃতি বা অংশ। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমে মিলিত হবার জন্যে Mystic-দের সাধনার ক্রম বর্ণনাই এ কবিতাটির (ও তার ব্যাখ্যার) বিষয়বস্তু। আত্মা অন্ধকার পথে নিজের অসংখ্য (সাতটি) পাপকে শোধন (Purgation, Cathersis) বা মোক্ষণ করতে করতে অমল রূপে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়। কখনো active, কখনো passive-রূপে এই শোধন হয়—অবশ্যই ঈশ্বরের কৃপায়। ঈশ্বরও তো চান ভক্তকে শোধন করে নিজের কাছে টেনে নিতে।

Aristotle তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে tragedy-র রসপরিণতি প্রসঙ্গে এই Cathersis-এর কথাই বলেছেন। বোঝা যায়, সাহিত্যের রসাস্বাদ ব্রহ্মাস্বাদসচিব।

St. John চৈতন্য-পরবর্তী মধ্যযুগের মানুষ। মধ্যযুগটা সারা পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলিতেই প্রেম-এর মরমী স্পর্শ দিয়ে মানুষকে ঈশ্বরসামীপ্যে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছে। খৃষ্টধর্ম, ঈসলাম, ভারতীয় ধর্ম—সর্বত্রই তা দেখতে পাই।

'Dark Night of the Soul'—এর দুটি ইংরেজি অনুবাদ আমি পেয়েছি। অনুবাদক—

(১) E. Allison Peers—(Image Books)

(২) Arthur Symons—(Mysticism—E. Underhill)

দুটি অনুবাদেই কেন্দ্রিয় ভাব অপরিবর্তিত। তবে ভাষায় কিছু পার্থক্য আছে। দুটি অনুবাদের অনুসরণে 'Dark Night...' কবিতাটির সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এরকম ঃ

"আত্মার আঁধার রাত্রি"

"কোনো এক অন্ধকার রাত্রে আত্মা বের হল অভিসারে—তার দয়িতের (ঈশ্বরের) সঙ্গে মিলনের জন্যে। অন্তরে এবং গৃহে যখন নিঃঝুম শান্তি—তখন সংগোপনে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে ছদ্মবেশের অবগুণ্ঠনে, গোপন সিঁড়ি বেয়ে গহন অন্ধকারে, কেবলমাত্র প্রেমের আলোকশিখাকে দিশারী করে সে চলল অভিসারে। হৃদয়ের এই শিখা দিনের আলোর চেয়ে উজ্জ্বল। তারই আলোকে আলোকিত পথে সে এসে পৌঁছল তার প্রেমিকের কাছে। মিলিত হল পরস্পর (Divine Union)। তার পুষ্পাকীর্ণ বক্ষে দয়িতের সুখনিদ্রা, প্রেমিকের আদরে। এই মিলনানন্দে আত্মা তার সত্তা হারিয়ে ফেলল।"

দু'একটি শব্দের ব্যাখ্যা ঃ

সিঁড়ি। মধ্যযুগে অভিসারের প্রসঙ্গে গোপন সিঁড়ি, মই বা Ladder-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঈশ্বরের সাধনাও তো সাধকদের ব্যক্তিগত গুহ্য অনুভবের ব্যাপার। তাই

তার জন্যেও গোপনীয়তা প্রয়োজন। একে প্রতীক হিসেবে নেওয়া হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। সাধনার ১০টি ধাপকে Ladder বা সিঁড়ির ধাপগুলির সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে। Ladder-এ যেমন আরোহণ, সাধনার ক্রমেও তেমনি আরোহণ আছে। খৃষ্টীয় ধর্মে St. Bernard বা St. Thomas-এর সাধনক্রমে এর পরিচয় আছে। 'Jacob's ladder' কথাটিও পরিচিত। Francis Thompson-এর 'In No Strange Land' কবিতাটিতে উল্লেখ আছে—

'... Jacob's ladder
Pitched Betwixed Heaven and
Charing Cross, (বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর প্রবন্ধ 'ইংরেজী মিষ্টিক কবিদের ভাবনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ'—উদ্বোধন-১১২ বিশেষ সংখ্যা।)

বৌদ্ধ সাধনপথে আছে অষ্টাঙ্গিক মার্গ। পতঞ্জলির যোগ-ও অষ্টাঙ্গ। এ সব সাধনার ধাপ বা ক্রম।

আর একটি শব্দ—গৃহ বা ঘর। Dark Night of the Soul-এ উল্লেখ আছে—My house being now at rest (নিঝুম শান্তি এখন আমার বিজন ঘরে)। 'ঘর' বলতে বোঝানো হয়েছে নিজের মন বা সত্তার আভ্যন্তর পটভূমিকে, যেখানে ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটতে পারে। সব রকমের অপরিচ্ছন্নতা, লোভ মোহ মদ প্রভৃতি রিপুর তাড়না বা নানাবিধ পাপ (sin) থেকে মন যখন সম্পূর্ণ নির্মল হবে তখনি সে ঈশ্বরের আসন পাতার যোগ্য হবে। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে

'... আমার এ ঘর বহু যতন করে
ধুতে হবে, মুছতে হবে মোরে।' (পূজা-১৪৬)

অথবা 'সকল জনম ভরে...।
আছ হৃদয় মাঝে সেথা কতই ব্যথা বাজে ...
... এই দুয়ার দেওয়া ঘরে কভু আঁধার নাহি সরে ...
সেথা আসন হয়নি পাতা, সেথা মালা হয়নি গাঁথা,
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা...।'

এই মানসভূমি (house being now at rest) একটা নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মতো অচপল বৃত্তিহীন অবস্থায় পৌঁছলে ('...নীরব মন্ত্রে হৃদয় মাঝে শান্তি শান্তি শান্তি বাজে' পূজা-২৫৬।) তবেই ঈশ্বরের সঙ্গে Divine Union হতে পারে।

চর্যাপদের গানগুলিতে এবং রামপ্রসাদী দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানগুলিতেও, যেমন পঞ্চবি ডাল', 'সোনা, রূপা', 'ভবনদী', 'দেহখাঁচা' প্রভৃতির সাংকেতিক প্রয়োগ এক একটি বিশিষ্ট ধর্মপথের ইঙ্গিত দেয়—'Dark Night...' কবিতাটির 'গুপ্ত সিঁড়ি' প্রভৃতির সাংকেতিক প্রয়োগও একটি ধর্মসাধনমার্গের ইঙ্গিত দেয়।—তার নাম Mysticism যা খৃস্টধর্মের সঙ্গে যুক্ত অথচ একটি স্বাধীন সাধনপথ। এই ধর্মপথটি St. John of the Cross-এর ওই কবিতাটিতে গূঢ়ভাবে ও তাঁর ব্যাখ্যায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এবং মুক্তমনা অধ্যাত্মপিপাসু সহৃদয় মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করেছে। পৃথিবীর বহু মনীষী

দার্শনিকের আলোচনায় mysticism একটি বিরাট বহু শাখায়িত ধর্মশাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। খৃষ্টধর্মের গীর্জা নির্ভর আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত হলেও এর মধ্যেও নানা মত ও নানা শাখার জটিলতা প্রবেশ করেছে। এ কারণেই Evelyn Underhill এর সম্পর্কে পাঠকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন—'Darkness' প্রভৃতি শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়ে নানা 'Confusion'-এর সৃষ্টি হয়েছে।

ঈশ্বরকে আত্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বাঁধা—এটাই এ ধর্মের মূল উদ্দেশ্য। আমরা উপনিষদ গীতা প্রভৃতির মধ্যেও এর পূর্বাভাস দেখতে পাই। বৈষ্ণব পদাবলীর কবিতাগুলির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হয়তো সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তের অনধিগত, তবু কবিতাগুলিতে যে মানবহৃদয়সম্ভব আর্তি আছে তাই তাদের ভক্তিকে তীব্রতর করে তোলে। এই 'Dark Night...'এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বাদ দিলেও এর মধ্যে যে একটি অভিসার এবং প্রিয়-মিলনের আকুল আনন্দমাধুরী আছে—'গীতাঞ্জলি'-র পশ্চিমি শ্রোতারা 'গীতাঞ্জলির' গানগুলির মধ্যে সেই প্রিয়-মিলনের অভিসারের আনন্দ মাধুরীকেও অনুভব করতে পেরেছেন—যা ইংরেজি কাব্যে দীর্ঘদিন অনাস্বাদিত ছিল।

আমাদের সাহিত্যে বরাবরই ঈশ্বরমুখী কবিতায় মানব-প্রেমমিলনের আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের মিলন বর্ণনা জয়দেবের কাব্যে আছে। 'গীতগোবিন্দ'-এ 'বিলাসকলার' উল্লেখ থাকলেও প্রথমেই বলা হয়েছে 'হরিস্মরণ'-এর কথা। এই 'হরিস্মরণ' পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীতে বড়ো স্থান পেয়েছে এবং অন্তিমত ভাবসম্মিলনে গিয়ে পৌঁছেছে। গীতবিতানের (বা গীতাঞ্জলির) গানের ('পূজা' পর্যায় তো বটেই, 'প্রেম' পর্যায়ের গানেরও) পরিণতিতে দেহকে উত্তীর্ণ হবার কথা আছে। প্রেমিকের চেয়ে প্রেমটিই কবির কাছে বড়ো ছিল। প্রেমিক চলে গেলেও '...একা বসে হৃদয় ভরে/আমার বেদন খানি আমি রেখে দেব মধুর করে। বিদায় বাঁশির করুণ রবে সাঁঝের গগন মগন হবে, চোখের জলে দুখের শোভা নবীন করে দেব রাখি॥' (প্রবাহিনী-৭৫)।

রবীন্দ্রনাথ 'Dark Night...' বা পশ্চিমি mysticism-এর অনুকারী নন। আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীতেও অভিসার বা প্রিয় মিলন আছে। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলী ও ঔপনিষদিক দর্শনে প্রভাবিত, —তবে সে প্রভাব তাঁর কবিত্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলেনি। চিরন্তন অনুভবগুলি যুগন্ধর কবিদের হাতে নূতন মহিমা নিয়ে প্রকাশিত হয়। গীতবিতান বা গীতাঞ্জলির গানেও তাই।

রবীন্দ্রনাথের গানগুলির মধ্যে কোনো সাংকেতিকতা নেই—যেমন আছে চর্যাপদে, বা দেহতত্ত্বের গানে, বা 'Dark Night...' কবিতাটিতেও। Mysticism-এর মূল কথা ভক্ত-ভগবানের আন্তরিক বন্ধন বা সীমাতে অসীমের প্রত্যক্ষ মিলন সাধনা। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ সত্যিই mystic কবি। তবে তাঁর গানে কোনো ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা নেই। তাই বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শ্রবণে—বা পাঠে পশ্চিমি শ্রোতারা mysticism-এর নির্যাসটুকুকেই নতুন করে খুঁজে পেয়েছিলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার মিলনে দেহলগ্নতার মর্ত্যরূপ আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে। St. John of the Cross-এর Dark Night...এর শেষ পর্যায়ে Divine Union-এর বর্ণনা এরকম :—

... Upon my flowery breast, kept wholly for himself alone, There he stayed sleeping, and I caressed him. And the faning of the cedars made a breeze. The breeze blew from the turret. As I parted his locks, with his gentle hand he wounded my neck. I remained lost in oblivion. My face reclined on the beloved. অনুবাদ E. Allison Peers. এখানে ঈশ্বর প্রসঙ্গে, he, himself প্রভৃতিতে ঈশ্বরবাচক Capital অক্ষর ব্যবহার করা হয় নি। অর্থাৎ মিলনের দেহ-ভিত্তিকে অস্বীকার করা হয়নি।

এই ধরনের অভিসার, দেহলগ্ন মিলনের চিত্র রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মরমী, অন্তরঙ্গ ও আধ্যাত্মিক করে তুলেছেন তাঁর গানে। সেখানে মানুষের দেহকে অস্বীকার না করেও তার দেহলগ্নতার মাধুরীটুকু গ্রহণ করেছেন। যেমন,

'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর, সুন্দর, হে সুন্দর ॥...
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,-
এই তোমারি মিলনসুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি করে, নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর সুন্দর হে সুন্দর ॥ (গীতিমাল্য)।

অভিসারের চিত্র আছে এ সব গানে—

(১) যেতে যেতে একলা পথে (গীতালি), (২) আজি শ্রাবণ ঘন (গীতাঞ্জলি), (৩) অমন আড়াল দিয়ে (গীতাঞ্জলি), (৪) আজি এই গন্ধবিধুর, (গীতাঞ্জলি), (৫) আজি ঝড়ের রাতে (গীতাঞ্জলি) প্রভৃতি।

ওই আসরে পঠিত অন্যতম গান—'আজি শ্রাবণঘন গহন মোহে'।

গানটিতে ঈশ্বরের গোপন অভিসার, নীলাকাশ-ঢাকা ঘনমেঘের অবগুণ্ঠনের ছায়াবৃত নির্জনতায় দয়িতের আগমন এবং নিবিড় মিলনের আশ্বাস,— রবীন্দ্রনাথের মতো মহাকবির লেখনীতে মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল।— মরমী শ্রোতা সহজেই মোহিত হবেন।

নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধে হয় না—শ্রীমতী সিনক্লেয়ার প্রমুখ মরমী শ্রোতারা 'গীতাঞ্জলি' শ্রবণে কেন মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কৃত অনুবাদ—

In the deep shadows of the rainy July,
with secret steps, Thou walkest,
silent as night, eluding all watchers.
To-day the morning has closed its eyes, heedless of
the insistenet calls of the loud east wind,
and a thick veil has been drawn over
the evere-wakeful blue sky.
The woodlands have hushed their songs,
and doors are all shut at every house.
Thou art the solitary wayfarer in this deserted street.

Oh my only friend, my best beloved,
the gates are open in my house-
do not pass by like a dream.

৩

এবারে গীতাঞ্জলির যুগের গান সম্পর্কে আলোচনা। যে বৈশিষ্ট্যে গীতাঞ্জলি বিশিষ্ট—তা ছড়িয়ে আছে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি—এ তিনটি কাব্য জুড়ে। সুতরাং এ আলোচনায় তিনটি কাব্যের গানই থাকবে। এবং থাকবে আরো দু'একটি গানও—।

'গীতাঞ্জলি' রচনার পূর্বে জমিদারী পর্যবেক্ষণের সময় অনেক বাউলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। প্রথম বয়সের ব্রহ্মসঙ্গীত-রচনার কালে তাঁর জীবনবৃত্ত ছিল পারিবারিক রীতিনীতি ও ধর্মবোধের দ্বারা সংকীর্ণ; যেমন প্রথানুযায়ী ধর্মসঙ্গীত-রচনা, বিষ্ণুপুরের গানের বন্দেশ ভেঙ্গে সুর রচনা এবং অগ্রজদের প্রভাবে সাংস্কৃতিক জীবনে অবগাহন। তবে তারই মধ্যে থেকেও,—বোধ হয় মহর্ষির চরিত্রের দৃষ্টান্তে... কবির মনের মধ্যে যে একটা শাশ্বত প্রগতির বেগ ছিল সেটাই কবিকে ধর্মপথযাত্রায় চিরনূতনত্ব জুগিয়েছে। বাউলদের সঙ্গে মেলামেশা এবং বাউল-সংগীত সংগ্রহ পাঠ করার পরে তাঁদের মরমী ঈশ্বরানুভূতি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করে থাকবে। দেবেন্দ্রনাথ সূফী কবি হাফেজের কবিতা পাঠ করতেন,—সূফীধর্মের মরমী ভাবনাও পরোক্ষভাবে কবিকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। আকৈশোর বৈষ্ণব পদাবলী পাঠেরও কিছু প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। ভক্তিমার্গী সাধনায় ঈশ্বরের সঙ্গে সহজ সম্পর্কের দিকটি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে। অবশ্য বাউল কিংবা ভারতের যে কোন সাধনাই উপনিষদের বীজ থেকে জাত বলা যায়। এমন কি সূফীধর্মেও বেদান্ত-প্রভাব থাকা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। তবু একথা অন্ততঃ বলা যায় যে, উপনিষদে মননধর্মই প্রধান; আর বাউল প্রভৃতি ভক্তিধর্মে হৃদয়ের সাধনাই বড়। ওই মননপ্রধান সাধনায় ক্লান্ত হয়েই মানুষ বার বার হৃদয়প্রধান সাধনার দ্বারে আশ্রয় নিয়েছে। তাছাড়া ঋষিদের মননাধিক্যের মধ্যেও যা ছিল সত্যানুভূতি, পরবর্তীদের কাছে তাই হল বাঁধাধরা পথের অনুবর্তন, আবৃত্তি। ধর্ম যদি প্রাণ হারায়, তবে সেই মৃত ধর্ম কেবল আচারের খাঁচায় মানুষকে আশ্রয় দেবে কেমন করে? রবীন্দ্রনাথ বাউলদের ধর্মে দেখলেন এক প্রাণবান স্বাধীন ব্যক্তিগত সাধনার পথ, যে পথে ঈশ্বরকে একেবারে আপন হৃদয়ের অধিবাসী করে নেওয়া যায়। Mysticism-এর সবচেয়ে বড় কথা প্রত্যক্ষযোগ; বাউলের সাধনায় এই প্রত্যক্ষযোগ রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন। গীতাঞ্জলির উপরে বাউলের প্রভাব প্রমাণ করা বর্তমান উদ্দেশ্য না হলেও এটুকু বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রচিত্তে 'গীতাঞ্জলি'র অনুভবের পটভূমিকার প্রস্তুতিতে কিছু অবদান অবশ্যই আছে বাউলদের মরমী সাধনার। তবে সঙ্গে সঙ্গে বারবারই এ কথাটা বলতে হয় যে, বাউলের প্রভাব থাকলেও, অন্যান্য ধর্মমতের ক্ষেত্রেও যেমন, এখানেও তেমন, রবীন্দ্রচেতনার একটা স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য থাকেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ Mystic সাধু ছিলেন না, তিনি ছিলেন Mystic কবি। সিদ্ধির চেয়ে লীলা-উপভোগই তাঁর কাম্য; তাঁর কাম্য মুক্তি নয়, সাযুজ্যের বন্ধন।

গীতাঞ্জলির গানগুলি রচিত হয় ১৩১৩ থেকে ১৩১৭ সালের মধ্যে। এই কালসীমায় রচিত গানগুলির মধ্য দিয়ে যে মরমী ভাবনার প্রকাশ হয়েছে তার মধ্যে মোটামুটি তিনটি স্তর দেখা যায়। এই স্তর-বিভাগ কালগত নয়, ভাবগত ঃ

(ক) বিরহবোধ, (খ) আত্মশুদ্ধি, (গ) মিলন—'গীতাঞ্জলি'র গানে এই তিনটি ধারাই প্রধান।

এই গানগুলির মধ্যে যে বিরহবোধের কথা আছে, তা চিরকালীন। মানুষ ঈশ্বরের খেলার ঘুঁটি ; তাঁর হাত থেকে ছড়িয়ে পড়েছে বিপুল বিচিত্র বিশ্বের আঙ্গিনায়। এই বিরাট বিশ্বের নানা বৈচিত্র্যের খেলায় কোন্ আদিকাল হতে সে মজে এসেছে। 'ঘরে 'ফেরা'র কথা তার মনে হয়নি। হঠাৎ একদা নিজের মনের গহনে 'ঘরে ফেরা'র এক তাড়া সে অনুভব করে। এরই নাম আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা। সব সাধনাতেই এই 'ঘরে-'ফেরা' আছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে 'ঘরে-ফেরা'র অর্থ খেলায় ক্ষমা দেওয়া নয়, গৃহকর্তার সঙ্গে সংযোগ পুনরুদ্ধার করা মাত্র ; তাঁর জন্য ব্যাকুলতা। তখনই মনে হয়—মানুষ চির-বিরহী। অনাদিকালের বিরহবেদনা সমস্ত আকাশে রণিত হয়ে হৃদয়কে অশ্রুতে কানায় কানায় ভরে তোলে। ১২৯৮ সালে 'মেঘদূত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম্য-তীরে বাস করিতেছে ; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই। আমিই বা কোথায়, আর তুমিই বা কোথায় ? মাঝখানে একেবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে ? অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে ?" এই অগাধ বিস্তৃত বিরহবোধ প্রকাশ পেয়েছে সবচেয়ে বেশী 'গীতাঞ্জলি'র যে গানটিতে, সেটি এই—

'হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে, ...
ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায় তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়
কত প্রেমে হায়, কত বাসনায়, কত সুখে দুখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমার বিরহ উঠিছে ভরিয়া আমার হিয়ার মাঝে হে॥

আরও অনেক গানেও এই বিশ্বব্যাপ্ত বিরহ ব্যক্তি-হৃদয়ের অপ্রাপ্তির বেদনায় অশ্রু মুক্তার রূপ ধরেছে প্রতীক্ষার ব্যাকুল মুহূর্তে। যথা ঃ

... ...
'আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার পায়ের ধ্বনিখানি। (পূজা-২২)

সূফীরা বলে থাকেন, সূফীবাদ সাধনলব্ধ নয়, ঈশ্বরদত্ত। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা ঈশ্বরেরই দান। Mystic সাধকগণ একটা বিশেষ শক্তির উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। এই অধরা উপলব্ধি তাঁদের ব্যাকুল করে তোলে। উপরি-উক্ত গানটিতে এই উপলব্ধির সন্ধান আছে। এই ব্যাকুলতা ভক্তকে কাঁদায়, পথে বার করে দুর্লভের অভিসারে।

ইসলামের প্রথম Mystic রাবেয়ার মধ্যে এই ব্যাকুলতা। ভারতের মীরাবাঈও কৃষ্ণের বাঁশির গানে আকুল হন। Hopkins তার "Mysticism : Old and New" গ্রন্থে কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, যেখানে এই 'অধরা' উপস্থিতির কথা আছে, তার পায়ের ধ্বনির কথা আছে, ঈশ্বরের স্পর্শের কথা আছে।

আর একটি গানে দেখা যায়—জাগতিক কর্মকোলাহল থেকে সরে নির্জন নিশীথে নিঃসঙ্গতায় বসে কবি এই 'অধরা'র ক্ষণিক স্পর্শ লাভ করেন। এই স্পর্শ কবিকে ব্যাকুল করে তোলে। বাউল গানে যেমন আছে,—

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।'

রবীন্দ্রসঙ্গীতটিতেও তেমনি—

'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝংকার।।'

এই ক্ষণিকের আসা যাওয়া এবং ক্ষণে ক্ষণে বীণার তারের ঝংকার বিরহবোধকে জাগিয়ে তোলে। আবু সঈদ আবু খৈর বলেন, "তোমার বিরহে যে অশ্রু ঝরে তাকে আমি মুক্তো বানাই, জীবনের সুতোয় মালা করি। তোমার বিরহ ভোগ করি, তোমার বিহনে স্বর্গও আমার নরক মনে হয়।" (দ্রষ্টব্য ঃ Sufis, Mystics and Yogis of India—by Banke Behari) এঁরা সকলেই ঈশ্বরের সুদূর বংশীধ্বনি শুনেছেন। তাই সারাজীবন এঁদের অভিসার বিরহের পথ ধরে। কেবল এক জন্মে নয়, জন্মজন্মান্তর ধরে এই অভিসার। বিরহই প্রেম। বিরহ প্রেমের একটি ঘনীভূত রূপ। তাই এই বিরহবোধ জাগিয়ে রাখা প্রয়োজন :

'যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু, এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাই নি যেন সে কথা রয় মনে।'

বিরহের আর্তি সুন্দর রূপে ফুটে উঠেছে 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' গানটিতে। বর্ষা বিরহের ঋতু। সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ অংশের বিকাশ হয়েছে বর্ষার পটভূমিকায়। সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বর্ষার পটভূমিকায় রচিত। বর্ষা ভারতীয় ঋতুচক্র ও জীবনে যেমন প্রভাবশালী, পৃথিবীর অন্য কোথাও মানুষের ভাবজীবনে বা জৈবজীবনে বা ঋতুচক্রে এমন প্রধান স্থান অধিকার করে না। বর্ষার নিবিড় মেঘ-সমাগমে সমস্ত আকাশ ব্যেপে যে একটা যাদুর ছায়া মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়, তার স্বপ্নরাজ্যে মন এক বিস্তৃতি লাভ করে। সংসারের যে বাহ্য বৈচিত্র্যে মানুষের মন ভুলে থাকে, বর্ষার মেঘমেদুর অন্ধকার সেই সব বিচিত্রতার হাতছানি থেকে মনকে নিঃসঙ্গতায় টেনে আনে,— নির্জন একাকিত্বে মন চায় আপন নিঃসঙ্গ আত্মার দিকে, —শোনে বিরহক্রন্দন— মন ব্যথিয়ে ওঠে কোন্-এক না-পাওয়া বা পেয়ে-হারানো প্রিয়তমের জন্য। ১৩১৭ সালের 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' প্রবন্ধে কবি বলেছেন, "এই-যে এই মুহূর্তেই শ্রাবণের ধারাপতনে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে এ আমাদের কাছে তার সমস্ত কাজের কথা গোপন করে গেছে।.... আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই

শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে, কিন্তু সেখানে তার আপিসের বেশ নেই; সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন করতে তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলই করুণ গান জেগে উঠছে—

তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী,
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া?

প্রহরের পর প্রহর ধরে এই বার্তাই সে জানাচ্ছে, 'ওরে, তুই যে বিরহিণী— তুই বেঁচে আছিস কী করে? তোর দিনরাত্রি কেমন করে কাটছে?'

'সেই চিরদিনরাত্রির হরিকেই চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ। সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে তুলে এই কথাটা আজ আর নিঃশেষ হতে চাচ্ছে না।"

'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' গানটি গীতবিতানের 'প্রকৃতি' পর্যায়ে বর্ষার গান বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। 'প্রেম' পর্যায়ে থাকলেও বেমানান হত না। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'তে থাকায় গানটি 'পূজা' প্রসঙ্গেই মনে আসে। কারণ, 'গীতাঞ্জলি' মুখ্যতঃ প্রেমের বা নিসর্গের কাব্য নয়। গানটির উদ্দীপন-বিভাব প্রকৃতি হলেও আলম্বন ঈশ্বর। রবীন্দ্রনাথের কাছে ঈশ্বর পার্থিব সব-কিছুর বা হৃদয়ের লৌকিক ভাবনাগুলির বাইরে নন। তাই প্রকৃতি-প্রভাবিত বা প্রেম-উন্মাদিত হৃদয়ের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে অধিষ্ঠিত করতে চান।

গানটির নিরলংকার সরলতার উলঙ্গ মাধুর্য মনকে যে অনির্বচনীয় বিরহ-বেদনায় অশ্রুব্যাকুল করে, তার কারণ এর গীতিধর্মিতা এবং সুরের সহযোগ। কেমন নিঃসংশয়ে সহজ করে বলা হয়েছে, সঞ্চারীতে—

'তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল-বেলা।'

এমন সহজ করে বলা রবীন্দ্রসঙ্গীতে খুব অল্পই আছে।

পটভূমি যদিও বর্ষার, তবু বর্ষাকে অতিক্রম করে এই ব্যাকুল প্রতীক্ষা সমস্ত জীবনকে বসিয়ে রাখে 'একা দ্বারের পাশে'। 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' প্রবন্ধে অন্যত্র বলেছেন, "আজ কেবলই মনে হচ্ছে, এই-যে বর্ষা, এ তো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যত দূর চেয়ে দেখি, আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহসন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার—তারই দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণের প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্‌ ঝর্‌ করে বলছে, 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিন-রাতিয়া?"

রবীন্দ্রনাথের অন্তর বিরহে কখনো অন্ধকার হয় না, কারণ ঈশ্বরবিরহের অন্ধকার ঈশ্বরেরই অরূপ আলো—বিরহ মিলনেরই অঙ্গ। এই ভাবটি সুন্দর ব্যক্ত হয়েছে একটি গানে—

'আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল আঁধার যামিনী,
সে যে তোমার বাঁশরি।' (পূজা-৩৬)

এই বিরহ ঘুচবে কেমন করে? ঈশ্বরের সাযুজ্যলাভে। ঈশ্বরের সাযুজ্যলাভের প্রথম বিঘ্ন অহং এর মার্জনা না হলে চিত্তশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি ঘটে না। অহংবিলোপই সমস্ত অধ্যাত্মসাধনার প্রথম ধাপ। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের প্রথম শর্তই অহংকারের লোপসাধন। "অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে" (গীতা ৩।২৭)। 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম গানটি অহংকার-মার্জনের গান :

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥

আর একটি গানে আছে—

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহংকার।

অধিকাংশ ধর্মসাধনায় অহংবিনাশ অর্থে 'আমি'কে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেওয়া—তবেই নির্বিকল্প মুক্তি। কিন্তু লীলাপথিক রবীন্দ্রনাথের মুক্তির আদর্শ স্বতন্ত্র। 'আমি'কে তিনি লোপ করেন না—মার্জনা করেন। এই জীবন একটি যন্ত্র। মহাগুণীর হাতে যদি বাজে, তবে যন্ত্রের কৃতিত্ব তো কম নয়। তাই অহংমাত্রই ত্যাজ্য নয়। কবির প্রার্থনা—'তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবনমাঝে'। এই জীবন-যন্ত্র ঈশ্বরের মহাসঙ্গীতের সুরে বাঁধা হোক। যে 'আমি' ধনে জনে জড়ায়ে আছে, তাকে মুক্ত করতে হবে। তবেই আত্মশুদ্ধি।

এই শুদ্ধির পথে ঈশ্বরের দয়া প্রয়োজন :

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে?

কিংবা : না হয় আমার নাই সাধনা, ঝরলে তোমার কৃপার কণা,
তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল, চকিতে ফল ফলবে না?

(পূজা-৩৬৫)

এই দয়ার স্বরূপ কি? দয়া সম্পর্কে আমাদের ধারণা এই যে—এ যেন মলিনতার ক্ষতের উপরে শান্তির এক সুখকর প্রলেপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের দয়াকে কেবল সুখের মাঝেই দেখেননি, দুঃখেও প্রাণ ভরে পেয়েছেন। ১৩১৪ সালে 'দুঃখ' (ধর্ম) প্রবন্ধে বলেছেন—"হে ভীষণ, তোমার দয়াকে, তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব? কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতংকতায়? ...হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। ...হে প্রচণ্ড, আমি তোমার কাছে সেই শক্তি প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার দয়াকে দুর্বলভাবে নিজের আরামের, নিজের ক্ষুদ্রতার উপযোগী করিয়া না কল্পনা করি—তোমাকে অসম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে না প্রবঞ্চিত করি। ...তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে উদ্ধার করিতেছে, সেই-যে উদ্ধারের পথ সে তো আরামের পথ নহে, সে যে পরম দুঃখেরই পথ।" রবীন্দ্রনাথ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

করেন না, তিনি চান পাপের মার্জনা। "কারণ তিনি ক্ষমা করেন না, সহ্য করেন না, তাঁর কাছে এই প্রার্থনা, 'তুমি মার্জনা করো'।" (পাপের মার্জনা, ১৩২১, শান্তিনিকেতন)। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করতে হলে তাঁর রুদ্ররূপকেও গ্রহণ করতে হবে। "রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে।" (আত্মপরিচয়)। গানে কবি বলেছেন—

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সেকি সহজ গান!
সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান॥
... ...
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান্।
অথবা আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন তারে ঝংকারো।

বস্তুতঃ এ এক বীররসের সাধনা। দুঃখের ক্রন্দন নয়—সাহসের বক্ষবিস্ফারণ। তাই ক্ষতচিহ্ন হয় অলংকার। দুঃখ হয় গৌরব। মিলনের জন্য এ দুঃখ সাধনা দেবতার নেই। এ গৌরব কেবল মানবের।

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস, খাঁটি রতন তুই তো চিনিস—
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস, এ মোর অহংকার।

কতকগুলি গানে মিলনের জন্য ব্যাকুলতার ভাবটি পরিস্ফুট। ধনে জনে জড়ানো নয়, আপনাকে প্রচার নয়, আত্মসুখে মগ্ন হওয়া নয়।

ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
... ...
হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর, এ জীবনে যা কিছু সুন্দর,
সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে
প্রভু তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে।

ভক্তের এই ব্যাকুল আহ্বানে ভগবান সাড়া না দিয়ে পারেন না। তখনই চলে মিলনের লীলা। ভক্ত যখন "কুল মরিয়াদ কপাট উদঘাটলু" (গোবিন্দদাস) তখন ঈশ্বরও পথে নামেন ভক্তের অভিসারে। 'গীতাঞ্জলি'র গানেই প্রথম ঈশ্বরের অভিসারের বর্ণনা পাই। রবীন্দ্রসঙ্গীতে বৈষ্ণবতাও এই যুগ থেকেই দেখা যায়—ভাবে ও ভঙ্গীতে।

অভিসারের পথে নেমে তিনি বীণা বাজান দূর থেকে। সেই ধ্বনি ব্যাকুল করে

ভক্তকে। তিনি আসেন পথে—ভক্ত-ও সেই পথচারীর বীণা-ধ্বনির অনুসরণে যাত্রা করেন।—

আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া ধরণীতে।
এখন চল্ রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে। ...
জানিনে আর ফিরব কি না, কার সাথে আজ হবে চিনা—
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে॥

বিরহের দহনদীপ্তিতে আলোকিত হোক অভিসারের দুর্গম দুস্তর অন্ধকার পথ-ঘাট।

কোথায় আলো, কোথায় ও রে আলো!
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো॥...
বেদনাদূতী গাহিছে, 'ও রে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।

বিরহে যখন হৃদয়ে রক্ত ঝরে, তখনই 'তোমার লাগি জাগেন ভগবান'। তিনি আসেন 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে...সবার দিঠি এড়ায়ে'। 'সুদূর কোন নদীর পারে, গহন কোন বনের ধারে'র পথ দিয়ে 'ঝড়ের রাতে' তাঁর অভিসার। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'র গানে ঈশ্বরপ্রেমে ব্যাকুলতা যত বেশী, প্রাপ্তি তত নয়। তাই ভগবানের পায়ের ধ্বনি শোনা যায় মাত্র। 'বাতাস আসে হে মহারাজ তোমার গন্ধ মেখে।' বাতাসে তাঁর গন্ধ, কিন্তু স্পর্শের বাইরে তিনি।

কিন্তু প্রাপ্তি কি একেবারেই নেই? যতক্ষণ 'মহারাজ', ততক্ষণ মিলনে সমতা নেই। তাই আপনার করে পাওয়াও নেই। কিন্তু এই প্রাপ্তির অন্য একটি রূপ গীতাঞ্জলিতেই পাওয়া যায়। মহারাজসুলভ দূরত্ব নয়, প্রিয়সুলভ একান্ত নৈকট্য—তা না হলে যথার্থ প্রাপ্তি সম্ভব নয়। ঈশ্বরমিলনের ক্ষেত্রে যে দ্বৈত ও অদ্বৈত-তত্ত্ব ভারতের অতি পরিচিত—রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তার যে বিশ্লেষণ তা জানা থাকলে তাঁর এই মিলনলীলাকে বোঝা সহজ হবে। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রেমের মূলমন্ত্র—'যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর এক দিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ আর এক দিকে মিলন, একদিকে বন্ধন আর এক দিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা আর অসীম এক হয়ে গেছে...।' (আত্মপরিচয়—৩)। এই মিলনতত্ত্বটি 'সীমার মাঝে অসীম তুমি' (পূজা-৬৫) গানটিতে ভালো বোঝা যেতে পারে। এখানে দ্বৈত এবং অদ্বৈত যেন এক হয়ে মিলে গেছে। 'দ্বয়' না হলে লীলা হয় না। আবার কোথাও কোথাও অদ্বৈতবোধ প্রবল। সমধর্মী 'হে মোর দেবতা' গানটিতে দেবতা ও মানবের মধ্যে একটা ভেদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন,—

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান?।

অথচ ঐ গানেই যখন বলেন—

আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান॥ ...
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান॥

তখন মনে হয়, ঈশ্বর নিজেই নিজেকে আস্বাদন করছেন। অর্থাৎ অদ্বয় আপন ইচ্ছায় আনন্দের লোভে রসের লোভে নিজেকে ইন্দ্রিয়ময় সত্তায় পরিণত করেছেন। সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর (পূজা-৬৫) গানটিতে 'আমি'-র মধ্যে যে প্রকাশ তা 'তুমি'-রই। "তোমায় আমায় মিলন হলে সকলই যায় খুলে।" এই মিলন কী রকম? দৃষ্টির বিভ্রম ঘুচে যাওয়া। যা সীমা তাই অসীম। "তোমার আলোয় নাই তো ছায়া"—কিন্তু "আমার মাঝে পায় সে কায়া।" অরূপ রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। এ প্রকাশ সুন্দর। ঈশ্বর তাঁর হলাদিনী-বৃত্তিকেই চরিতার্থ করছেন। তাই এক-ই দুই-রূপে প্রতিভাত হচ্ছেন। দ্বয় প্রতিভাত, কিন্তু মূলে অদ্বয়। "তাই তোমার আনন্দ" গানটির

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে,
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।

অংশে দ্বৈত-লীলা দেখা যায়। কিন্তু শেষদিকে যখন 'ভক্ত প্রাণের প্রেমে" ঈশ্বর নেমে আসেন, এসে দুই মিলে এক হন, তখনই, সেই "যুগল সম্মিলনে" ঈশ্বরের 'পূর্ণপ্রকাশ' হয়। অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টা, মানব ও ঈশ্বর যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন ততক্ষণ নয়, যতক্ষণ দ্বয় ততক্ষণ নয়,—যখন অদ্বৈতে অভিন্ন যোগে সম্মিলিত, তখনই ঈশ্বরের মূর্তি "পূর্ণ প্রকাশিছে"। পরের গানটিতে দ্বৈতাদ্বৈতবোধের সুন্দর প্রকাশ হয়েছে।

ঈশ্বর তাঁর প্রেমময় সত্তার আস্বাদনের জন্য রূপজগৎ সৃষ্টি করেন—এবং মানবকে রূপজগতে প্রেরণ করেন। মানব যতক্ষণ ভ্রমাচ্ছন্ন, ততক্ষণ কেবল রূপজগৎকেই নানা বৈচিত্র্যের বেশে দেখে। যখন তার ভ্রম সরে যায় তখন নানা বৈচিত্র্যের অন্তরালবর্তী এক-কে সে আবিষ্কার করে। এই বিচিত্রতা যে এক-এরই বিকার তা বুঝতে পারাই লীলার চরম। এই রূপজগৎ এবং মানব—সবই ঈশ্বরেরই স্বেচ্ছারূপান্তর—এই বোধে দ্বৈতবোধের পরিসমাপ্তি।

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে। ...
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর বাকী না রবে।
মরে গিয়ে বাঁচব আমি, তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে। —গীতাঞ্জলি ১৩০

ক্ষুদ্রতার মৃত্যুশেষে বৃহত্ত্বর জন্ম। তখনই আসে বিশ্বব্যাপ্ত ঐক্যের—অভেদের বোধ।

'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি' (১৩১৬, পূজা-৬০৭) গানটিতে এই রূপ জগতের অন্তরালবর্তী অরূপ-এর সন্ধানের চেষ্টা। এই অরূপ transcendent নন, immanent—তিনি বিশ্বব্যাপ্ত। রূপের মধ্য দিয়েও অরূপই প্রকাশিত হচ্ছেন। রূপজগতে সন্ধান করলেই অরূপকে পাওয়া যাবে। তার জন্য প্রয়োজন—'সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি।' যে গান কান দিয়ে শোনা যায় না, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অন্তরালে যে নীরব সঙ্গীত, তাই দিয়ে সকল শব্দময় স-রব সঙ্গীতকে ঢেকে দিতে হবে। আলংকারিকরা যাকে বলেন 'ধ্বনি'—সেই ধ্বনিময়তার আরোপ ঘটলেই রূপের মধ্যে অরূপ উপলব্ধ হন।

প্রতীয়মান বিশ্বজগতের অভ্যন্তরের যে শক্তি নানা রূপ ও আকারের মধ্য দিয়ে প্রকাশমান সেই শক্তিই যে ব্যক্তির মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হচ্ছে এই বোধই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতাকে এক অভিনব রূপ ও গতি দান করেছে। বিশ্বের সঙ্গে যোগেই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ—এই pantheistic বোধটি 'গীতাঞ্জলি'র কয়েকটি গানে প্রকাশিত হয়েছে। উপনিষদে ব্রহ্ম বা আত্মার সর্বব্যাপিতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে—'গীতাঞ্জলি'র গানে তা সুন্দর কাব্য-ভাষা পেয়েছে। যথা—

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও॥
নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে—
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারো॥

এই যোগ যখন সত্য-সত্যই উপলব্ধ হয়, তখনই—

গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর—
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখীর ডোর।

কিংবা, নিশার স্বপন ছুটল রে এই ছুটল রে, টুটল বাঁধন টুটল রে॥
রইল না আর আড়াল প্রাণে, বেরিয়ে এলেম জগৎপানে,—
হৃদয়শতদলের সকল দলগুলি এই ফুটল রে এই ফুটল রে॥

যখন একবার দৃষ্টি খুলে যায়, তখন বিশ্বের প্রতিটি ধূলিকণায় বিশ্বস্রষ্টার স্পর্শ পাওয়া যায়, সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দনের মধ্যে তাঁর নৃত্যবেগ ধরা পড়ে। "আলোয় আলোকময়", "এই তো তোমার প্রেম" প্রভৃতি গানে বিশ্বে বিশ্বেশ্বরের সেই আনন্দময় প্রেমময় মধুময় উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। এ কি দ্বৈতবোধ না অদ্বৈতবোধ ?—না উভয়ের মিশ্রণ ? সর্বব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে নিত্য প্রকাশমান যিনি, তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে ? তিনি প্রকৃতির মধ্যেও যেমন, সাধারণ মানুষের মধ্যে সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যেও তেমনি প্রকাশিত। ঈশ্বর নিজেকে নিজে যখন এই সৃষ্টির রূপের প্রগতিশীল ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত করেই চলেছেন—তখন মুক্তি কোথায় ?

মুক্তি ? ও রে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে ?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে
বাঁধা সবার কাছে। (গীতাঞ্জলি-১১৯)

গীতমাল্যের রচনাকাল ১৩১৬ থেকে ১৩২১ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর গানগুলিতে ঈশ্বর ও ভক্তের সম্পর্ক আরো নিবিড়। ১১ সংখ্যক (ওগো পথিক ...) কবিতাটিতে এই নিবিড় মিলনের ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে। এ কাব্যের সাধনা গীতাঞ্জলি থেকে আরও মরমী। ১১ সংখ্যক কবিতাটির কিছু পংক্তিতে Dark Night of The Soul-এর মিল আছে।—

জগৎ-জোড়া সেই সে ঘরে
কেবল দুটি মানুষ ধরে,
আর সেখানে ঠাঁই নাহি তো কিছুরি ;.....। (গীতিমাল্য-১১)

'হিয়ার কাছে' 'গোপন দুয়ার'— সেখানে নিশীথে যেতে হয়— সেখানে 'কেবল দুটি মানুষ ধরে'। এখানে 'বিশ্বসাথে' যোগে-বিহারীর সঙ্গো যোগ হয়—গোপনে।

অপূর্ব তার আসা-যাওয়া গোপনে। (ঐ)

'গীতিমাল্যে'র প্রথম গানটির মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রায় স্পষ্ট অনুভব।

'রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে—
তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহনার ধারে॥'

এই অভিনব অনুভূতি আরও কয়েকটি গানে পাওয়া যায়। সচেতন মনের অগোচরে কেউ এসে তার উপস্থিতির পদচিহ্ন রেখে যায়। এই পদচিহ্ন ধরে ধরে কবির যাত্রা শুরু হবে।

ভোরের বেলা কখন এসে
পরশ করে গেছে হেসে।

কিন্তু আপনারই ঘুমে-জড়ানো আলস্যে পরম ধন কাছে এসেও ফিরে যায়। এই ঘুমের ঘোরের প্রতি তাই ধিক্কার। এই মোহাচ্ছন্নতাকে তাই ভাঙাতে হবে।

এখনো ঘোর ভাঙ্গে না তোর যে, মেলে না তোর আঁখি,
কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে জানিস নে তুই তা কি ?

এই ফুল ফোটার কথা বাউলের গানেও আছে।[১] পাঁপড়ির পর পাঁপড়ি মেলে যিনি বিকশিত হতে হতে চলেছেন, তিনি যে অত্যন্ত কাছেই। আবার, মানুষের হৃদয়কমলও পাঁপড়ির পর পাঁপড়ি মেলে কখন যে ফুটে ওঠে নিভৃতে তাঁরই ভোরবেলাকার পরশ লেগে।—

যে দিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই,
আমি ছিলেম অন্যমনে।
যাঁর স্পর্শে এই ফুল ফোটা—
কে জানিত দূরে তো নেই সে—

১. বিশা ভুঞিমালীর 'হৃদয়কমল চলতেছে ফুটে' কিংবা মদন বাউলের 'নিঠুর গরজী, তুই কি মানসমুকুল ভাজবি অগুনে' প্রভৃতি গান দ্রষ্টব্য।

তাঁরই জন্য পথ-চাওয়া। তাঁরই জন্য বাঁশির ডাকের অপেক্ষায় বসে থাকার দুঃসহ প্রতীক্ষা।

বাতাস বহে মরি মরি আর বেঁধে রেখো না তরী—
এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয়মাঝারে॥ (পূজা-১৯)।

হয়ত তরী আসবে, হয়ত আসবে না। কিন্তু বিরহ-বেগে প্রাণ চঞ্চল। আর প্রতীক্ষা নয়। 'এখনো ঘোর ভাঙো না তোর যে' গানটিতে যাত্রার উদ্যোগ আছে। পথে সহস্র বাধা-বিপত্তি থাকলেও এ যাত্রা থেকে নিবৃত্ত হওয়া যায় না। 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে' গানটিতে যাত্রা আছে। 'আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়' গানটিতেও যাত্রা আছে।—

আজকে পথে বাহির হব বহি আমার জীবন জীর্ণ।

যাত্রার লগ্ন প্রথম গানটিতে ঊষালগ্নে 'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো' গানটিতেও তাই—

প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি
নিবিয়া গেল কোণের বাতি, ...।

'এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে' গানটিতেও তাই—

ভোরের আকাশ রাঙা হল রে,
আমার পথ হল সুন্দর।

কিন্তু গীতিমাল্যের ১১নং কবিতায় যাত্রার লগ্ন সন্ধ্যাবেলা, 'ওগো পথিক দিনের শেষে যাত্রা তোমার.....।' 'হাওয়া লাগে গানের পালে'— গানটির লগ্নও সন্ধ্যাবেলা।—

দিন গিয়েছে এল রাতি.......

'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি' গানটির লগ্নও সন্ধ্যাবেলা। বাঁশিতে বাজে 'বেলাশেষের তান।'

সকালবেলায় যাত্রার মধ্যে উৎসাহের ভাব। সন্ধ্যাবেলার যাত্রায় একটা মরীয়া ভাব। যাত্রার এই গানকটিতে বাধা-বিপদের সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করা হয়নি। 'গীতিমাল্যে'র গানে, ভক্তহৃদয়ের অন্তর্নিহিত প্রাণবেগে সেসব বাধা ভেদ করে, আশার কথাই বড় হয়ে জাগে। 'গীতালি'-তে যে দুঃখ-সাধনার ভাবটা বিস্তারিত করে প্রকাশিত হবে, 'গীতিমাল্যে' তার আভাস আছে। কবির মনে এ ধারণা পূর্ব থেকেই আছে যে, দুঃখের পথেই আনন্দময়ের আবির্ভাব। মানুষের ব্যথা যেখানে, সেখানেই তাঁর কোমল করপরশ। সমসাময়িক 'রাজা' নাটকে রাজার যে ভয়ংকর রূপ, 'গীতিমাল্যে' তা নেই— 'গীতিমাল্যে'র ঈশ্বর প্রেমময়। এ কাব্যে যাত্রায় যে দুঃখের অশ্রু তা শেষ হয় ঈশ্বর-মিলনে। ৬০নং কবিতায় আছে—

দুঃখ নিয়ে দিন কেটে যায় অশ্রু মুছে মুছে—
চোখের জলে দেখতে না পাস দুঃখ গেছে ঘুচে।

কিংবা— আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাকো তারে॥

অন্য গানেও আছে—

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে॥

গীতিমাল্যের প্রথম গানটির ('রাত্রি এসে যেথায় মেশে') মধ্যে পরমের যে আগমন, তাতে কিছু অস্পষ্টতা থাকলেও কবির বিশ্বাস এত প্রবল যে, এই 'দেখি-দেখি দেখতে না পাই'-র মধ্যেও 'তোমায় আমায় দেখা হল' ভাবটি প্রবল।

গীতাঞ্জলির গানে প্রেমাসম্পদ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের কথা আছে। গীতিমাল্যের গানে এই মিলনের অনাদ্যন্ত অভিসারের কথা আছে।—

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা॥

এই জগতের রাত্রি, ঊষা, ফুল্ল পৃথিবী প্রভৃতির বিকাশের মধ্যে দিয়ে বিশ্বদেব যেন রূপ উন্মোচিত করেই চলেছেন। আর মানবচিত্ত তার আশা নিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে যুগে যুগে ক্লান্তিহীন মহাপথিকের পশ্চাতে অক্লান্ত অনুসরণে ধেয়ে চলেছে। লৌকিক নায়ক-নায়িকার অভিসার-যাত্রার রূপকের মধ্য দিয়ে জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনের কথা বলা হয়েছে,— কিন্তু তত্ত্ব ঢাকা পড়েছে আন্তরিক উপলব্ধির ঘনিষ্ঠতায়, গীতিকাব্যসুলভ সরস কোমলতায়।

ঈশ্বরের ঐশ্বর্যময় রূপ নয়, মাধুর্যময় রূপই 'গীতিমাল্যে'র প্রধান উপলব্ধির বিষয়। উপনিষদে আছে, এক আনন্দের উৎস থেকে বিচিত্র এই জগৎ সৃষ্টি। বৈষ্ণব-অধ্যুষিত দেশে এই ভাবের চরম প্রকাশ শ্রীচৈতন্যের জীবন-সাধনায়। তবে বৈষ্ণব ধর্মে মানবের স্থান মঞ্চে নয়, দর্শকাসনে। রবীন্দ্রনাথের বোধে মানব বিশ্বরঙ্গমঞ্চে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ। জগতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ মানবের মধ্যে। তাই মানব কেবল লীলা-দর্শক নয়, লীলানাট্যের কুশীলব। 'তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে' গানটিতে কবি বলেছেন— আকাশের গ্রহনক্ষত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর যে অনিমেষ আঁখি মেলা রয়েছে, মানবের চোখের সঙ্গে শুভদৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তা সফল হবে না। বসন্তের অনন্ত পুষ্পবিকাশের মধ্যেও তাঁর তৃপ্তি হবে না, যতক্ষণ না মানবহৃদয়ের একতম কুঁড়িটি বিকশিত হয়। (পূজা-২০১ ও ৭৭) মানব ক্রীড়নক হলেও তার ভূমিকা অপ্রধান নয়। এই ভাবটি 'গীতাঞ্জলি' থেকেই আরম্ভ হয়। কিন্তু 'গীতিমাল্যে' এসে তা চরম মানবিক প্রেমের স্বচ্ছতা লাভ করে। প্রেমসম্পর্কে লঘু-গুরু ভেদ নেই। তাই ঈশ্বরকে নেমে এসে দাঁড়াতে হয় মানবের দুয়ারে। মানবের সঙ্গে, মানবের মধ্য দিয়ে এই মধুর সহজ সম্পর্কের উপলব্ধি যদি ঘটে, তবেই তাঁর আনন্দ—

অসীম ধন তো আছে তোমার, তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে কণায় কণায় বেঁটে॥

আমায় তুমি করবে দাতা, আপনি ভিক্ষু হবে—

... .

তুমি রইবে না ওই রথে, নামবে ধুলাপথে—

যুগ-যুগান্ত আমার সাথে চলবে হেঁটে হেঁটে॥

বহিরঙ্গের ভূষণহীন রিক্ততা প্রেমের একটি স্বভাব। 'সূফী' প্রভৃতি মরমীয়া সাধকদের যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ,— যথাসম্ভব আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করে হৃদয়োৎসারিত সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই যেমন তাঁরা ঈশ্বরে মিলিত হতে চান, কবিরও তেমনি সমস্ত আড়ম্বর ত্যাগ করে আন্তরিকতার ভূষণে নিজেকে সাজানোয় আনন্দ। প্রেমের ক্ষেত্রে ভোলানো নয়, ভোলাটাই বড় কথা। (পূরবী-র 'প্রকাশ' কবিতা দ্রষ্টব্য)। যদি ভোলাতে হয়, তবে 'রূপে তোমার ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব।' ('রাজা' নাটক)।

কবির পূজা-ও প্রেমেরই পূজা। তাই মহামূল্য মণিহারে,—

কণ্ঠ যে রোধ করে,

সুর তো নাহি সরে ;

কবির বাসনা—

ফুলমালার ডোরে

বরিয়া লও মোরে—॥ (পূজা-৪৮৯)

কখনো ফুলমালাকেও কবি বর্জন করতে চেয়েছেন। -- 'ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁওয়া' 'স্তবের বাণী' যেন ঈশ্বর আর কবির মাঝখানে এক আড়াল সৃষ্টি করে দাঁড়ায়। তাই 'আপন মনের একটি কোণায়' তাঁকে দেখবার জন্য 'আছে তো মোর তৃষ্ণা-কাতর আপন আঁখি।' (পূজা-১৩২)

কবি জানেন, যদি পণ্ডিত জ্ঞানী ধর্মযাজকেরা—

'বলে কঠিন তিরস্কারে'

'পথ দিয়ে তুই আসিস্ নি যে, ফিরে যা রে।' (পূজা-২৯১)

তবে প্রেমিক ভগবান্ 'ফেরার পন্থা বন্ধ করে' আপনি আপন বাহুডোরে বাঁধেন। Mystic সাধকদের প্রসঙ্গে যে আড়ম্বরহীনতার কথা বলা হয়,— কোন-না-কোন ভাবে তবু কিছু-না-কিছু সেই আড়ম্বর থেকেই যায়। Mystic-দের সাধনার বিধি মানতে হয়, পোশাকে-পরিচ্ছদে কিছু স্বাতন্ত্র্যও রীতিবিধিতে দাঁড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ কোন আড়ম্বরই চান না। ঈশ্বর কবির বঁধু।—

বঁধুর কাছে আসার বেলায় গানটি শুধু নিলেম গলায়,

তারি গলার মাল্য ক'রে করব মূল্যবান্॥ (পূজা-২০।)

নিজেও তাই চান—

সাজাও আমারে সাজাও।

যে সাজে সাজালে ধরার ধুলিরে সেই সাজে মোরে সাজাও (পূজা-৯৯।)

মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের প্রেম আরও ব্যাপক, আরও গভীর। আরও তীব্র তার টান।

মানুষের প্রণয়ে এক পক্ষের বিস্মৃতি অন্য পক্ষের বিস্মৃতিকে বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে দূরে ছেড়ে দিয়েও টেনে রেখেছেন।—

আমায় ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয়।
আমার ভোলার আছে অন্ত, তোমার প্রেমের তো নাই ক্ষয়॥
দূরে গিয়ে বাড়াই যে ঘুর, সে দূর শুধু আমারি দূর—
তোমায় কাছে দূর কভু দূর নয়॥

ঈশ্বর কখনো তাঁর প্রেমিককে মুক্তি দেন না।[১]

তাই কেবল বাইরের জগতের ঘাটে-ঘাটেই নয়, আপন প্রাণের নির্জনতায়-ও এই মিলনের আকর্ষণে ফিরতে হবে।—

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি।
তোমায় দেখতে আমি পাইনি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাইনি॥

কেবল ভেতরে-বাইরে স্থানগতভাবেই নয়, অনুভূতির বিচিত্রতার মধ্যেও তাঁরই প্রেম। কেবল সুখে নয়, দুঃখেও তাঁর প্রেমের প্রকাশ। তাই দুঃখসাধনাকে কবি এড়িয়ে যাননি। ঈশ্বরকে যদি কেবল সুখের মূর্তিতেই দেখতে চাওয়া যায়, তবে তাঁর প্রেমকে ছোট করে দেখা হয়। তাই জীবনে যদিও বারবার বাতি নেভে, ঝড়ের রাতি বার বার গর্জে ওঠে, বাঁধ ভেঙ্গে বারবার কান্নার ব্যথা জেগে ওঠে, তবু—

ওগো রুদ্র, দুঃখে-সুখে এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা॥

(পূজা-২৩৫)

'তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা।' যতই দুঃখ আসুক তাঁর হাত থেকে, পরিত্রাণও তাঁরই হাতে। যিনি ভিখারী করে মানবকে পথে নামান, ভিক্ষার ধন হরণ করেন, তিনিই আবার মানবকে কাছে টেনে নেন।—

ভেবেছিল চির-কাঙাল সে এই ভুবনে, কাঙাল মরণে জীবনে।
ওগো মহারাজা, বড়ো ভয়ে ভয়ে দিনশেষে এল তোমারি আলয়ে—
আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে নিজ মালা দিয়ে বরিলে॥

(পূজা-৭৪)

১. তুলনীয় ঃ 'রাজা' নাটকে—
সুদর্শনা॥.... আমার ইচ্ছে করছে—দূরে চলে যাই, এত দূরে যাই যেখানে তোমাকে আমার আর মনে আনতে হবে না।
রাজা॥ আচ্ছা তুমি যত দূরে পার, তত দূরেই চলে যাও।
... ...
সুদর্শনা॥... আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতো দিয়ো না।
রাজা॥ ছেড়ে দেব, কিন্তু যেতে দেব কেন?

(৫)

'গীতালি'তে (১৩২১) দুঃখসাধনার গানই অধিকাংশ স্থান জুড়ে আছে। তবে প্রতীক্ষার গানও আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে যেমন, পূজার গানেও তেমনি, পাওয়ার আনন্দ-সংবাদের তুলনায় না-পাওয়া এবং পাওয়ার জন্য প্রতীক্ষার কথাও কম নয়। কবি Milton যেমন বলেছিলেন,— "They also serve who only stand and wait." (On His Blindness). রবীন্দ্রনাথও তেমনি বলতে পেরেছেন—

নাই বা ডাকো রইব তোমার দ্বারে,
তোমার তরে যে জন গাঁথে মালা
গানের কুসুম জুগিয়ে দেব তারে॥

প্রতীক্ষার ঈশ্বররাহিত্য ঈশ্বরসান্নিধ্যেরই নামান্তর! প্রতীক্ষা সাধনার প্রস্তুতি।

'গীতালি'তে দুঃখসাধনাই প্রধান কথা। রবীন্দ্রনাথের কাছে দুঃখ জিনিসটি কিন্তু নেতিমূলক নয়। (তাঁর 'দুঃখ' প্রবন্ধের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।) ঈশ্বরের একাংশ সুখ, অপরাংশ দুঃখ। এই দুই মিলেই তাঁর আনন্দময় স্বরূপ। যিনি প্রতিনিয়ত জগৎকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তিনি গড়েনও যেমন ভাঙেনও তেমন। ভাঙা বৈ গড়া নেই। তাই পূর্ণতা দুঃখ ও সুখ উভয়ের সমষ্টি। দুঃখকে ভয় বা ঘৃণার দ্বারা দূরে রাখা কবির অভিপ্রেত ছিল না।

ধনী যে তুই দুঃখধনে সেই কথাটি রাখিস মনে—
ধুলার 'পরে স্বর্গ তোমার গড়তে হবে॥ (পূজা-২৫৯)

মৃত্যু যাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁর ছায়া— এ কথাটি কবির জীবনে ও সৃষ্টিতে অত্যন্ত গভীর সত্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে। এই সময়কার সমগ্র কাব্য সৃষ্টি তাঁর গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সময়ের গানগুলির মধ্যে দুঃখসাধনার প্রাধান্য। এর কারণ, মনে হয়,— প্রথমতঃ বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়া; সমসাময়িক 'পাপের মার্জনা' প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে কবি আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, এই সময়ে "কবির মন খুব ক্লান্ত। আধ্যাত্মিক, পারিবারিক, পারিপার্শ্বিকের বিচিত্র ঘটনাস্রোতকে কোন একটি বিশেষ অবস্থায় সংহত করিয়া আপনার আদর্শকে রূপায়িত করিতে পারিতেছেন না বলিয়া আত্মগ্লানিতে কবির মন ভারাক্রান্ত।" (রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খণ্ড, 'প্রথম মহাযুদ্ধ'।) "দিনরাত্রি মরবার কথা এবং মরবার ইচ্ছা আমাকে তাড়না করেছে। ...... কেবলি মনে হচ্ছিল যখন এ জীবনে আমার idea-কে realise করতে পারলুম না তখন মরতে হবে" (ওই অংশে উদ্ধৃত কবির পত্র।) একটা অবসাদ কবির মনে থাকায় 'গীতালি'র গানে দুঃখবোধের প্রাধান্য দেখা দিয়েছে মনে হয়। তবে চিন্তায় যদিও হতাশা, গানে তারই মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি অটুট বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়।

কবি ঈশ্বরকে বলেছেন— 'ব্যথা পথের পথিক'। তাই কবির সাধনাও—

কাঁদন দিয়ে সাধন আমার চিরদিনের তরে গো,
চিরজীবন ধ'রে॥ (পূজা-২১৮)

দুঃখ আত্মশুদ্ধির উপায়। 'না বাঁচাবে আমায়' গানটিতেও এই দুঃখের মহিমা

কীর্তিত হয়েছে—

বক্ষ আমার এমন ক'রে বিদীর্ণ যে করো
উৎস যদি না বাহিরায় হবে কেমনতরো ?
এই-যে আমার ব্যথার খনি জোগাবে ওই মুকুট-মণি—
মরণ দুখে জাগাবে মোর জীবনবল্লভে॥

রবীন্দ্রনাথের গানে দুঃখের নিষ্ঠুর বাণকে বুক পেতে গ্রহণ করার কথা আছে। কবি গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গো বলতে পারেন—

আমি মারকে তোমার ভয় করেছি বলে—
তাই তো এমন হৃদয় ওঠে জ্বলে।
যে দিন সে ভয় ঘুচে যাবে সেদিন তোমার বাণ ফুরাবে গো — (পূজা-২১৭)

প্রেম স্বার্থপর হয়। ঈশ্বরও মানুষকে নিজের প্রেমে নিজের কাছে একান্ত করে টেনে নেবেন বলে তাঁর প্রিয় মানবকে আরামে বসে থাকতে দেবেন না। তাঁর দেওয়া আঘাত তাঁর প্রেমেরই নামান্তর। সব দুঃখশেষে একদিন মনে হয়—

এত দিনে জানলেম যে কাঁদলেম সে কাহার জন্য।
ধন্য এ জাগরণ, ধন্য এ ক্রন্দন, ধন্য রে ধন্য। (পূজা-৪৮)

'গীতিমাল্যে'র ১১ সংখ্যক কবিতায় ('ওগো পথিক' ইত্যাদি) দিনের শেষে যে যাত্রা আরম্ভ হয়েছে সারারাতের দুঃখ-দুর্গমতার শেষে 'গীতালি'-তে এখন—

আলো যে যায় রে দেখা—
হৃদয়ের পূব-গগনে সোনার রেখা॥

লক্ষ্য করা উচিত— 'হৃদয়ের' কথাটি। ঈশ্বরের আবির্ভাব আসলে হৃদয়ের মধ্যে হৃদয়ের অনুভূতিতেই হয়। হৃদয়-নিরপেক্ষ তাঁর কোন অস্তিত্ব অন্ততঃ ভারতবর্ষের ভক্তিসাধনায় নেই। 'চিত্তমাঝে' অরূণ বহ্নি জ্বালিয়ে তিনি দুঃখের মূর্তিতেই আসুন— আর ভয় নেই। 'তোমারি হউক জয়'।

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়, তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়, তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে—
অরূণ বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে, মৃত্যুর হোক লয়॥ (পূজা-৩৭৩)

তাঁর কোনো স্থির রূপ কবির কাছে মনোরম হতে পারে না। তিনি পান্থ, তিনি পথিক বঁধু। তাঁর প্রেমের সঙ্গীকেও তাই পান্থ হতে হয়। পান্থ হলে তবেই পান্থ-র প্রেম মেলে। তিনি পান্থজনের সখা। তাঁর সঙ্গো অন্তহীন চলাতেই কবির আনন্দ। 'গীতালি'-তে এই অন্তহীন সাধনার সুরটিই প্রধান। 'নিত্য পথের পথী' (পূজা ৫৬৫) কবির সমস্ত জীবন এই পথ চলাতে কেটে যায়। সেখানেই মুক্তি, সেখানেই প্রেম, সেখানেই সাধনা।—

নানা মতে তুমি লবে

মানুষ ইন্দ্রিয় দিয়েই জগৎকে দেখছে—অথবা জগৎ ইন্দ্রিয়-মাধ্যমেই অনুভূত হচ্ছে। ঈশ্বরকে জগদ্ব্যতিরিক্ত ভাবা কঠিন। তাই আপনা থেকেই ঈশ্বরের সঙ্গে কোনো না কোনো সম্পর্কে সে জড়িয়ে যাচ্ছে। বেদ-উপনিষদের কাল থেকেই একথাটা সকলেরই জানা যে, 'এক'-ই একাধিক হয়েছেন। 'একং রূপং বহুধা যঃ করোতি' (কঠ-২/২/১২)। রবীন্দ্রনাথেরও বিশ্বাস, এই বিশ্বের মধ্য দিয়ে পরম তিনি প্রকাশিত হতে হতে চলেছেন। তাই এই রূপজগতের নিত্যপ্রগতিশীল চলা— এরই মধ্যে ঈশ্বরের উপলব্ধি, এরই মধ্যে এরই সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখা, নিজেকে এই খেলায় অংশীদার মনে করা, —এটিই রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ। ঈশ্বর নিজেই পান্থ, তাই পান্থজনের সখা। তিনি পথের সাথী, কবি তাই নিত্য-পথের পথী।

আরশীনগরে তাঁকেই খোঁজেন সাধকেরা। সেই অচিনপাখিকে খাঁচায় বাঁধার জন্যেই সৃষ্টি হয় তাঁদের নানা উপায়, নানা পন্থা। এক-এর সঙ্গে বহুরূপের সম্পর্ক নিয়েই দ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদের আশ্রয়েই আছে এসব পন্থা। এবার রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করে দেখা যাক।

॥ বৈষ্ণবতা ॥

রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়স থেকেই বৈষ্ণবসাহিত্যের পাঠক। পারিবারিক বিদ্যোৎসাহিতা এবং বৈষ্ণবপদাবলি পাঠ করার ফলে কালক্রমে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। ভারতের ধর্মসাধনার ইতিহাসে বৈষ্ণবধর্মের ভূমিকা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবধর্মই ভারতের ঈশ্বর সাধনাকে সরস করেছে, প্রাণবান্ করেছে। মনন-প্রাধান্য থেকে মুক্তি দিয়ে, আচারের শৃঙ্খল মোচন করে, হৃদয়ের স্নেহরসে পরিপ্লুত করে ঈশ্বরভাবনাকে কোমল করেছে। নির্গুণ ঈশ্বরকে সগুণ করে মানবের ধরাছোঁয়ার মধ্যে এনেছে। নানা দুঃখবিপর্যয়ে মানুষ ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় পেয়েছে, যে-আশ্রয় মানুষ পায় স্নেহশীল মানুষের কাছে। বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে মানুষ ঈশ্বরের আরও কাছে পৌঁছবার সোপান পেয়েছে। ঈশ্বরের এই স্নেহশীল রূপের মধ্যেই লীলাবাদের সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত। এই প্রেম-সম্পর্কেই ঈশ্বর মানুষের বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষের জীবনে প্রেম-সম্পর্কই সবচেয়ে বড়ো সম্পর্ক। তাই ঈশ্বরকে প্রেম-সম্পর্কে বেঁধে তাঁর সঙ্গে অন্তহীন সাযুজ্যলাভ—এটাই মানুষকে আকৃষ্ট করেছে।

বৈষ্ণবীয় এই দৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে দেখেছেন। যদিও 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার'—একথা রবীন্দ্রনাথে দেখা যায় না,—তবু প্রেমসম্পর্ক তাঁর অধিকাংশ গানে গৃহীত হয়েছে। 'পঞ্চভূতে'র 'মনুষ্য' প্রবন্ধে বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই।... বৈষ্ণবধর্ম সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে।...যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকটে আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এই সমস্ত পরমপ্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।"

ঈশ্বর যে মানুষকে নিয়ত আকর্ষণ করছেন--মানুষের ভূমিকা না থাকলে জগৎ-রঙ্গামঞ্চ যে একেবারে ফাঁকা—এই বোধ রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ও গানে প্রকাশিত হয়েছে। 'বলাকা'-র 'আমি এলেম ভাঙল তোমার ঘুম' বা 'গীতাঞ্জলি'র 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে' প্রভৃতি বিখ্যাত অতিপরিচিত পঙ্‌ক্তিগুলি ছাড়াও তাঁর বহু গানে এই লীলার প্রকাশ দেখা যায়। যেমন—

'ভুলে যাই থেকে থেকে—
তোমার আসন-পরে বসাতে চাও নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।' (পূজা ৭২)
কিংবা 'তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে?' (পূজা ৭৩)

মোট কথা, রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে যে মানব-গর্ববোধ এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের লীলার কথা আছে তা এসেছে অনেকাংশে বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ থেকে। তবে বৈষ্ণবধর্মের জ্ঞান-কর্মবিহীন কেবল-ভক্তি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেনি। 'যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে' ('নৈবেদ্য' ৪৫নং) সে ভক্তি রবীন্দ্রনাথের কাম্য নয়। রবীন্দ্রনাথ জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম এই তিনের পরাকাষ্ঠা যে ঈশ্বর, তাঁকেই চেয়েছেন। 'অচলায়তন' নাটকে তাই মহাপঞ্চক, দর্ভকগণ ও শোণপাংশুগণ—সকলেরই উপযোগিতা স্বীকার করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাধনা নিছক ধর্মসাধনা নয়, তাঁর মানবতাবোধও এই বোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্মে চূড়ান্ত যে মহামানব তিনিই পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের 'পূজার' গানের ঈশ্বরের স্থান দখল করেছেন।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। বৈষ্ণবধর্ম মানবের অধিকারকে বেশীদূর স্বীকৃতি দেয়নি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু মানব-অধিকারকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। জগৎ প্রগতিতে মানব, প্রকৃতি, সম্পূর্ণ গ্রহনক্ষত্র ও শূন্যতা-সমন্বিত আকাশ—সকলেরই মহান ভূমিকা আছে। এদের চলার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের চলা। এই Pantheistic মনোবৃত্তিই রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণ বৈষ্ণবতা থেকে দূরে রেখেছে। তিনি বৈষ্ণব পদাবলির মধ্যে মানুষের ও কবির ব্যক্তিগত প্রেমকে বড়ো করে দেখেছেন ও মূল্য দিয়েছেন। যে মানুষের মধ্যে মানবীয় প্রেমের বোধ নেই সে ঈশ্বরকে কী ভাবে প্রেম-সম্পর্কে বাঁধবে? যার মধ্যে বাৎসল্যের বোধ নেই সে কী করে ঈশ্বরকে সন্তান-স্নেহে বাঁধবে? শুষ্ক হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা হয়

না। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ,' 'বিসর্জন' প্রভৃতির মধ্য দিয়েও কবি একথাই বলেছেন। বৈষ্ণব কবিতার মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

'দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'
(বৈষ্ণব কবিতা —সোনার তরী,)

অথবা — 'যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা।'
(পুণ্যের হিসাব —চৈতালি,)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে মানুষ কেবল লীলাদর্শক। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। কোথায় পূর্ণানন্দৈশ্বর্য মায়াধীশ কৃষ্ণ আর কোথায় মায়াধীন জীব! দৈবী প্রেম আর মানবিক প্রেম এক হতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্য দিয়ে যে ঈশ্বরারাধনা তা যতটা আধ্যাত্মিক, তার চেয়ে বেশী রসিক। তাই তাঁর মরমীয়া সাধনায় ঈশ্বরের সাযুজ্য একান্ত প্রয়োজন। দৈবী প্রেম তো মানবিক প্রেমেরই উন্নত রূপ (sublimation)। ঈশ্বর এসেছেন মানবের সীমানায় মানবকে ঈশ্বরত্বে আকর্ষণ করবার জন্যে—মানুষ না হলে তাঁর আনন্দ নেই। ঈশ্বর তাই কৃষ্ণ (আকর্ষক)—মানুষ রাধা (আরাধিতা)। পৃথিবীর তাবৎ Mystic-দের সাধনায় এই প্রেম-সাধনার স্বীকৃতি আছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম মূলত কবির ধর্ম। তাই রূপজগৎ তাঁর কাছে অরূপ মাধুরীর আস্বাদ এনে দেয়। সীমা অসীমের হাত ধরে চলে। তাই বাহ্য জগৎ, রবীন্দ্ররচনায়, মানবকে ভোলাবার জন্যে নয়, খেলাবার জন্য। কবিতায় ও গানে এর স্বীকৃতি আছে।—

'গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।' (—বলাকা ২২)

দ্বৈতলীলা অনিবার্য।—

'যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা।...
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম। ...
আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল।' —(বলাকা ২৯)

গানেও এই দ্বৈতলীলার প্রকাশ আছে। প্রভু-ভৃত্য (পূজা ১১৭) গায়ক-শ্রোতা (পূজা ২৯৫), গুরু-শিষ্য (পূজা ২), প্রেমিক-প্রেমিকা (পূজা ৪৬), প্রভৃতি। দ্বৈত-সম্পর্কে ঈশ্বরের লীলাকে রবীন্দ্রসংগীতে দেখানো হয়েছে।

জীবন যেখানে নির্বাণ বা মুক্তিতে শেষ হয় না, সেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

বৈষ্ণবের মিল। অর্থাৎ অনন্ত লীলার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব। কিন্তু মানবের অধিকারের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব কবিতায় কেবল রাধাই ঈশ্বরের লীলার সাথী। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় কেবল রাধা নয়, সকল মানবই ভগবানের খেলার সাথী—সমস্ত বিশ্বই ঈশ্বরের লীলাস্থল—কেবল অপ্রাকৃত বৃন্দাবন নয়, প্রাকৃত সব কিছুই।

'আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি।
আপন-মনে আমারি পটে আঁকো মানস ছবি।
তাপস তুমি ধেয়ানে তব কী দেখ মোরে কেমনে কব,
আপন-মনে মেঘস্বপন আপনি রচ রবি।
তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী।।' (পূজা ৭১)

এমন কথা বৈষ্ণবেরাও বলতে পারেন না, অদ্বৈতবাদীরাও বলতে পারেন না। এ এক অচিন্তনীয় ভেদ ও অভেদের সম্পর্ক।

।। শক্তি-সাধনা ।।

১৮শ/১৯শ শতকের বাংলা গানে মাতৃপূজার আদর্শ প্রায় সর্বত্র।[১] রামনিধি-কালীমীর্জার টপ্পায়, দাশরথির পাঁচালীতে, কবিওয়ালার ও অন্যান্য অনেকের গানে—সর্বত্রই এই মাতৃ-আরাধনা। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কমলাকান্ত চক্রবর্তী, শিবচন্দ্র রায়, মহতাব চাঁদ, ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেনের গানে তো বটেই—বৈষ্ণবপ্রধান বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ গানেও 'কালীনাম চিন্তন' ইত্যাদি কথা পাওয়া যায়। তখনকার অধিকাংশ কবি, গায়ক ও শ্রোতার 'হৃৎকমলমঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা' (রামপ্রসাদ)। করালবদনী শ্যামার চেয়ে আরও আকাঙ্ক্ষিতা হয় স্নেহময়ী মা।

হৃৎকমলে কালশশী, আমি দেখতে বড়ো ভালবাসি।
একবার তেজে অসি ধর মা বাঁশি ভক্ত বাঞ্ছা পূরাইয়ে।
—নবাই ময়রা

রবীন্দ্রনাথ এই শাক্তশতকে এবং শাক্তসংগীত-অধ্যুষিত বাংলাদেশেই জন্মেছিলেন এবং যেখানে কানু ছাড়া, শ্যামা ছাড়া অন্যান্য গীত অত্যন্তই কম, সেখানে মানুষ হয়েছিলেন। তথাপি শক্তি-সংগীত তাঁকে প্রভাবিত করেনি। রামপ্রসাদের সুর, উমাকে কন্যা কল্পনা করে যে গান, তার মাধুর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু ঈশ্বরসাধনার মাধ্যম হিসাবে মাতৃপ্রেমের পথ তাঁর কাম্য ছিল না। ঈশ্বর তাঁর কাছে বরং পিতৃস্নেহের মাধ্যমে আপনাকে বিকশিত করেছেন। ঈশ্বরকে মাতৃসম্বোধন তাঁর গানে অল্পই আছে, (যদিও দেশকে তিনি অনেক স্বদেশ-গানে জননী ছাড়া অন্যরূপে ভাবতে পারেননি)।

(১) ঋকবেদে দেবীরূপের বর্ণনা আছে। প্রকৃতিদেবীর পূজা তন্ত্রাদির মধ্য দিয়ে বাংলার এবং ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছে। নারীরূপের আরাধনা ভারতের মাটিতে বহুকাল থেকে চলে আসছে। এমন কি নির্গুণ ব্রহ্মের কট্টর উপাসক শংকরের নামে প্রচলিত একটি স্তোত্র 'ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্ননপ্তা' প্রভৃতিতেও 'গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী'—এই মাতৃপদে শরণ-প্রার্থনা আছে।

মাতৃ-আরাধনার প্রধান মূর্তি দুইটি—একটি লক্ষ্মী, অন্যটি চণ্ডী, কালী বা দুর্গা। শেষোক্তটির মধ্যে একটা ভয়াবহতা থাকার জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ কালীপূজার ভক্ত ছিলেন না। তবে ঈশ্বরের ভয়াবহ রূপকে তিনি রুদ্র-সম্পর্কিত গানে প্রকাশ করেছেন। 'বিসর্জন' নাটকে বিশ্বজননীর কল্যাণময়ী রূপের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এই কল্যাণময়ীর-ও বা লক্ষ্মীরও কোন রূপ তাঁর গানে পাওয়া যায় না। তবে দেশাত্মবোধক গানে দেশকে মাতৃরূপে বর্ণিত করেছেন।

তবু 'পূজা' পর্যায়ের কয়েকটি গানে ঈশ্বরের মাতৃরূপ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'পূজা' পর্যায়ের গানের মধ্যে এই গানগুলিতে জননী-সম্বোধন আছে।

১. জননী, তোমার করুণ চরণখানি
২. আঁখিজল মুছাইলে, জননী
৩. তিমির-দুয়ার খোল
৪. তোমার সোনার থালায়
৫. আর কত দূরে আছে
৬. বড় আশা করে এসেছি
৭. সন্ধ্যা হল গো, ওমা
৮. আমার আঁধার ভালো

প্রায় সব গানগুলিতেই আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা দেখা যায়। প্রথম দুটি গানে করুণাময়ী জননীর বন্দনা। তৃতীয় গানটিতে রয়েছে জ্যোতির্ময়ী জননীর কাছে জীবনের হতাশার আঁধার ঘুচাবার প্রার্থনা। চতুর্থ গানটিতে আছে বেদনার্ত সন্তানের দুঃখ-সাধনার গর্ববোধ। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম গানগুলিতে রয়েছে স্নেহময়ী জননীর কোলে আশ্রয় প্রার্থনা ; ক্লান্ত পথিক জননীর স্নেহকরপরশনে চিরশান্তির প্রার্থনা জানাচ্ছেন। অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবে কবি স্নিগ্ধ হতে চাইছেন। অষ্টম গানটিতে আছে শিশুর সহজ সরল বাৎসল্যের মতো ঈশ্বর ও ভক্তের সম্পর্কের কথা। মোট কথা, যেখানেই ক্লান্তি, সেখানেই আশ্রয় প্রার্থনা। জননীর স্নেহকরস্পর্শে যত নিরাময়, পিতার স্নেহে কি তা পাওয়া যায়? তবু আশ্চর্যভাবে লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে ঈশ্বরের মাতৃরূপ ও পিতৃরূপ উভয় কল্পনাই বর্জন করেছেন। 'রাজা' নাটকে রাজা ও ঠাকুর্দার মধ্যে যে সম্পর্ক, কবি নিজেও যেন সেই বন্ধু সম্পর্ককেই বড়ো করে ধরে রাখতে চেয়েছেন।

বৈষ্ণব বা শাক্ত কোনো প্রভাবই কবিকে একান্তভাবে প্রভাবিত করেনি। তবে মুক্তির প্রশ্নে যেখানে শাক্ত ও বৈষ্ণবে প্রভেদ, সেখানে শাক্ত ও রবীন্দ্রনাথেও প্রভেদ। শক্তিসাধক মাতৃপদে আশ্রয় বা নির্বিকল্প মুক্তি চান ('আসার আশা ভবে আসা'—রামপ্রসাদ), পুনর্জন্ম চান না ('মা আমায় ঘুরাবে কত ?'— রামপ্রসাদ)। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিমুখী মুক্তি চান না। 'সন্ধ্যা হলো গো, ওমা' প্রভৃতি দু'একটি গান ছাড়া সর্বত্রই লীলার প্রয়াসী দেখা যায় কবিকে।

॥ মিস্টিসিজম ॥

আলোচনায় বহুবার রবীন্দ্রনাথকে Mystic বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে Mystic কথাটির প্রয়োগের ব্যাপারে অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি—উভয়বিধ দোষ অতিক্রম করার জন্য Mysticism -এর স্বরূপ-লক্ষণ জানা আবশ্যক ; এবং সেই লক্ষণাবলীর নিকষে বিচার করে দেখা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, বিশেষত রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে Mystic শব্দটি প্রয়োগের সীমা কোথায়।

Mysticism সম্পর্কে বিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থ[১] আলোচনা করে Mysticism -এর স্বরূপ সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ অবগত হওয়া যায়। সব লেখকের সমস্ত মানদণ্ডে একজন কবিকে বিচার করা যায় না। কারণ, বিভিন্ন লেখকের সংজ্ঞার ব্যাপ্তি বা পরিধি সমান নয়। E. Underhill তাঁর আলোচনায় ভারতীয় Mystic-দের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি। তিনি মুখ্যত Christian Mystic এবং Christian Mysticism সম্পর্কে এবং প্রসঙ্গত পারস্যের সূফীদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থে সাধনার যে ক্রম দেখানো হয়েছে তা সব Mystic-দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। Annie Besant সাধারণভাবে সকলের কথাই বলেছেন। আবার R. Otto তাঁর আলোচনায় শংকর এবং Echhart (একহার্ট)-কেই প্রধানত স্থান দিলেও মূল সূত্রের দিক থেকে তাঁর সংজ্ঞার ব্যাপ্তি অনেক বেশী। শুধু তাই নয়। তাঁর আলোচনায় The inward way (introspection) এবং The way of unity (unifying vision) —উভয়ই স্বীকৃত হয়েছে। সমস্ত লেখকদের আলোচনার সূক্ষ্মতায় প্রবেশ না করেও Mysticism-এর মূল লক্ষণগুলি আবিষ্কার করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলিই প্রধান।—

ক. চৈতন্যের প্রত্যক্ষদর্শন (বা সংযোগ), খ. ক্রিয়াত্মক পদ্ধতি, গ. জগৎ বিমুখতা ও রূপাতীতের সঙ্গে যোগসাধন।

এগুলি ছাড়াও আর কয়েকটি লক্ষণের প্রতি লেখকরা ইঙ্গিত করে থাকেন।—

ঘ. অহংবিলুপ্তি, ঙ. অনুষ্ঠানাদি বর্জন, চ. গান।

এবার এই লক্ষণগুলির মানদণ্ডে রবীন্দ্রসংগীতকে বিচার করা যেতে পারে।—

ক. চৈতন্যের প্রত্যক্ষদর্শন (বা সংযোগ)

সংজ্ঞাগুলির মধ্যে দেখা যায়, ঈশ্বরের সঙ্গে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ সংযোগই Mysticism -এর প্রাণবস্তু। সেইজন্যই Mystic-রা Scripture বা Authority-কে মানেন না। রবীন্দ্রনাথ Mysticism দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন কি না জানা যায় না। তবে পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ

(১) Annie Besant -এর 'Mysticism,' Hopkins -এর 'Mysticism : Old and New,' Evelyn Underhill-এর 'Mysticism', Rudolph Otto-র 'Mysticism : East and West', St. John of the cross- এর Dark Night of the soul ড. রমা চৌধুরীর 'বেদান্ত ও সূফীদর্শন', 'মোহাম্মদ বরফতুল্লা-র পারস্যপ্রতিভা, A.J. Arberry- র Sufism প্রভৃতি গ্রন্থে Mysticism এবং সূফীবাদ-এর সম্বন্ধে নানা দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা আছে।

সূফীবাদের ভক্ত ছিলেন— আর রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচিন্তার প্রথম পদক্ষেপ দেবেন্দ্রনাথের পদচিহ্ন ধরেই। সূফীবাদ Mysticism-এর এক শাখা। যদিও ঔপনিষদিক ঈশ্বরোপলব্ধির মধ্যেও Mysticism আছে, তবু একথা মানতেই হয় যে, ভারতীয় ধর্ম সাধনার মধ্যযুগে উপনিষদের চিন্তাধারা এই সূফীধর্মের সংস্পর্শে এক নতুন রূপ ও গতি লাভ করে। ভারতের অ-পণ্ডিত সমাজে, বৃহত্তর জন-সমাজে, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ধর্মসাধনা কবীর, নানক প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে সমন্বয়ী ধারা রেখে যায়, রবীন্দ্রনাথ তাকেই ভারতের ধর্ম বলে জেনেছেন। বাউলের ধর্মে এই সাধনার প্রভাব আছে।

ঈশ্বরকে পাওয়া যায় হৃদয়ের বোধে, হৃদয়ের যোগে। ভক্তিসাধনার এই কথাটি ভারতের ধর্মের সবচেয়ে ব্যাপ্তিশালী চিন্তা। এই হৃদয়শীল চিন্তা মধ্যযুগেই বল লাভ করে। এই প্রত্যক্ষ যোগের কথা বাউলে আছে, শ্যামাসংগীতে আছে। রবীন্দ্রনাথের গানে বারবার এই প্রত্যক্ষ যোগের কথা আছে। শ্যামাসংগীতে এর উদাহরণ পাই নিম্নোক্ত গানটিতে।—

'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন, তুই দ্যাখ আর আমি দেখি,
আর যেন কেউ নাহি দেখে।।' —কমলাকান্ত

বাউল গানে এর নিদর্শন আছে—

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।' —লালন ফকির।

বা 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।' —গগন হরকরা

'বেদান্ত ও সূফীদর্শন' 'গ্রন্থে সূফীবাদ সম্পর্কে ড. রমা চৌধুরী বলেছেন—'ধর্মের দিক হইতে সূফী মতবাদ ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ, বাধাহীন মিলন মানব জীবনের এক মাত্র কাম্য ও সার্থকতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। এ মিলন বুদ্ধিপ্রসূত নহে, সম্পূর্ণ রূপে আবেগসম্ভূত।'

রবীন্দ্রসংগীতে এর উদাহরণ আছে। St. Catharine যেমন বলেন, 'I desire not that comes from Thee, but only I desire Thee, Sweet Love! রবীন্দ্রনাথও তেমনি বলেন—

'শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।।' (পূজা ৩৭)

কিংবা 'অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে।।' (পূজা- ৫৬)

ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ, চৈতন্যের প্রত্যক্ষ সংযোগই ঈশ্বরকে সত্যরূপে অনুভব করাতে পারে ; কবি সে কথা বলেছেন,

'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহি রে।।'

গানটিতে। (পূজা ২৫৩)

খ. ক্রিয়াত্মক পদ্ধতি

Mysticsm-এর স্বরূপ-নির্দেশে Underhill যখন বলেন 'active and practical' —তখন রবীন্দ্রনাথকে হয়তো Mystic বলা যায় না। কারণ, কবি রবীন্দ্রনাথের ধারণায় প্রত্যক্ষ ক্রিয়াত্মক দিক কিছুই ছিল না। ধর্মসাধকেরা যখন সাধনায় দিনাতিপাত করেন, তখন তা যতই মরমী হোক না কেন, তার মধ্যে গুহ্যক্রিয়াদি (esoteric)কিছু থাকেই। তারই নিরবচ্ছিন্ন উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে তাঁদের সক্রিয়তা প্রকাশ পায়। সে সাধনা অভ্যাস (practice)-নির্ভরও বটে। কিন্তু 'active and practical, not passive and theoretical'—বাক্যটি সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে, active বলতে কি কেবল বাহ্য-অঙ্গের সক্রিয়তাই বোঝায়? Practical মানে কি প্রত্যক্ষ অভ্যাসমূলক ক্রিয়াকর্মাদি; অর্থাৎ সাধুর বেশভূষা নিয়ে পথে না চললে কি তাকে Mystic বলা যাবে না? আমরা তো দেখি, সূফী Mystic-রা মৌলভিদের আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করেছেন বলেই তাঁরা Mystic, Church-এর প্রতি আনুগত্যত্যাগেই তো Christian Mystic-দের উদ্ভব। শাস্ত্র প্রভৃতি বর্জন করেই তো বাউলরা Mystic হয়েছেন।

মনে হয়, এই activity-র অর্থ মানসিক সক্রিয়তা—রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচিন্তায় যার তুঙ্গপ্রকাশ। সমস্ত জীবনের চলা—এ চলা চিন্তায় কার্যে, এ চলা সত্য-শিব-সুন্দরে, এ চলা জ্ঞানে-কর্মে-প্রেমে। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সচল পান্থ। তাই রবীন্দ্রনাথের চলা activity-র চরম। Mystic-দের পথ চলার শেষ Unitive Life—যেখানে ঈশ্বর এক স্থির আসনে, প্রতিষ্ঠিত অস্তিত্বে বসে আছেন; সাধকের পথ-চলা সেখানে শেষ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পথের শেষ কোথায়?— চলমানতায়, গতিতে। 'আমি নিত্যপথের পথী, পথে চলার লহো লহো লহো নমস্কার'॥ (পূজা-৫৬৫), অথবা 'পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া' (পূজা-৫৬৪) প্রভৃতির মধ্যে যে পদচারণার কথা আছে তা অন্তহীন পদচারণা—কেবল একজন্মে নয়,—'জনম জনম এই চলেছে,—মরণ কভু তারে থামায়?' (পূজা-৩৪৬)।

তাই রবীন্দ্রনাথের পূজার গানের প্রসঙ্গে এই active and practical কথাটি প্রযোজ্য নয়, একথা ঠিক নয়। বরঞ্চ বৃহত্তর অর্থব্যাপ্তিতে প্রযোজ্য। তাই বলা যায়, Underhill যেখানে সমস্ত Christian Mystic এবং Persian Mystic-দের সাধনার মধ্যেই Mysticism-কে সীমাবদ্ধ রেখেছেন, সেখানে, মনে হয়, গীতিকার রবীন্দ্রনাথের সাধনার মধ্যে Mysticism এক বৃহত্তর সংজ্ঞা, নতুন পরিচয় খুঁজে, পেতে পারে।[১]

গ. জগৎ-বিমুখতা ও রূপাতীতের সঙ্গে যোগসাধন

Underhill বলেছেন, Mysticism-এর একটি বৈশিষ্ট্য—Transcendentalism —বিশ্বাতিক্রমণ। Mystic-রা এই পরিবর্তমান জগৎকে তুচ্ছ করে তার অন্তরালবর্তী অপরিবর্তনীয় এক (Changeless one)-এর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। বস্তুতঃ এ কথা

(১) E. Underhill পরে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' এবং কবীর-এর রচনা (রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ) পড়েছিলেন এবং প্রাচ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

সব ধরনের Mystic-দের সম্পর্কে সমান প্রযোজ্য নয়। শংকরের মতো প্রায় বারো-আনা সাধকই ইহজগৎকে অতিক্রম করে যেতে চান। তবে কেউ কেউ মনে করেন, এই রূপজগৎ একেবারেই মিথ্যা, আর কেউ কেউ মনে করেন, এই রূপজগৎ অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরেরই পরিবর্তমান রূপ। দ্বিতীয় দলের সাধকেরা রূপজগৎকে তুচ্ছ ভাবেন না—যদিও অরূপের দিকেই তাঁদের মনোনিবেশ। যদিও মোটামুটি সকলের মধ্যেই এই transcendental ভাবটি দেখা যায়, তবু, 'পাড়ার ভিতরে' যে 'আরশীনগরে' এক বিশেষ 'পড়শী' বাস করেন,—সেই আরশীনগরকে বাউলেরা তুচ্ছ করেন না। তাঁরা তাঁকে এখানেই পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করেন। এই বিশ্ববিবর্তনের ফুলের পাঁপড়ি তিনিই মেলে মেলে চলেছেন। বাউলের এই দিকটি রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করেছে—যদিও পূর্বেই 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' (ঈশ-১) শ্লোকটিই রবীন্দ্রনাথের মনের ভিত্তি গঠন করে রেখেছিল। জগৎ যদি তৎকর্তৃক আচ্ছাদিত হয়ে থাকে, তবে জগদতিরিক্ত আর কোন্ সত্তার পূজা প্রয়োজন!

'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর' (পূজা ৬৫) বা 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি' (পূজা ৬০৭) প্রভৃতি গানের মধ্য দিয়ে জগৎপ্রীতিই প্রকাশিত হয়েছে। তবে transcendentalism একেবারেই নেই তা নয়। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' (ঈশ-১) রবীন্দ্রনাথের প্রিয় এই বাক্যটির মধ্যেই তাঁর transcendentalism-এর মূল কথা জানা যায় মনে করি। রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধি তবেই সম্ভব, যদি রূপজগতের প্রতি প্রেম ব্যক্তি-স্বার্থের বা মমত্বের সংকীর্ণতার দ্বারা বিঘ্নিত না হয়।

'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি।।' (পূজা ২৪)

অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা অনির্বচনীয়তাবোধের আরোপ। জগতের রূপলীলা—সম্ভোগে একটা 'মমেতি চ ন মমেতি' ভাব। এটাই রবীন্দ্রনাথের transcendentalism. জগৎকে বাদ দিয়ে জগদীশ্বরকে চাওয়া নয়, জগৎকেই জগদীশ্বরের মহিমায় মহিমান্বিত করে তোলা। 'বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।' (পূজা ৬৫)। জগতের ক্ষুদ্রতার মলিন বেশ খুলে যায়।

Living union with this One—অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া—এটা জালালুদ্দীন রুমি-র একটি কবিতায় বড়ো সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে। অস্তিতেও যিনি, নাস্তিতেও তিনি। ফলে 'Dark night of the soul তাঁকে পীড়িত করে না।—

—"যখন তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি তখন তাঁহারই অন্ধকারায় বন্দী থাকি। যখন (তাঁহার সম্বন্ধে) জ্ঞান লাভ করি তখন তাঁহারই মোহে আচ্ছন্ন থাকি। আবার যখন জাগরণ আসে তখন তাঁহারই মুক্ত প্রান্তরে বিহার করিতে থাকি।" (পারস্য প্রতিভা-মহম্মদ বরকতুল্লা।)

রবীন্দ্রনাথের 'এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়' (পূজা-৩৭), 'আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী/তোমারে তবু চিনিব আমি' (পূজা-২৩০)—প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি ওই একাত্মবোধ থেকেই সৃষ্ট। অতএব বলা যায়—Living union with this One—এটা রবীন্দ্রসঙ্গীতে আছে।

ঘ. অহংবিলুপ্তি

Mystic-দের মধ্যে অহংবিলুপ্তির কথা প্রাধান্য পেয়েছে। এঁদের সাধনার যে কয়েকটি ক্রমিক ধাপ (stage) প্রায় সকলেই স্বীকার করে থাকেন, তার মধ্যে একটি ধাপ purgative stage—যেখানে Self-denialএর কথা আছে। এই প্রসঙ্গো খ্রিস্ট্রধর্মের মনস্তাপ বা repentance-এর কথাও বলা যায়। পার্থিবতা-বিভূষিত 'অহং' সত্যদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে সত্য-মিলনের বিঘ্ন ঘটায়। এই জীবন মানেই অহং-সর্বস্বতা। অহং ত্বং-এর বিপরীত। সুতরাং এই জীবনধারণ পাপেরই ফল। Christian-দের মধ্যে তাই এই পাপের জন্য অনুতাপ এবং শোধন বা purgation-কে খুব বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে। সূফীদের মধ্যে মনস্তাপ এত প্রবল না হলেও 'ফণা'-র সাধনার দ্বারা আত্মবিলোপ না সাধিত হলে 'বাকা'-তে পূর্ণ মিলন সম্ভব নয়—এ ধারণাও গুরুত্ব পেয়েছে। উপনিষদ বা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই পাপবোধ বড়ো কথা নয়। আনন্দবাদই বড়ো কথা। পাপের ফলেই ভবযন্ত্রণা—এর চেয়েও বড়ো কথা, আনন্দ থেকেই সকলে জাত, আনন্দে প্রতিপালিত এবং আনন্দে লয়প্রাপ্ত।[১] Self-denial বা অহংবিলুপ্তি একটা সীমিত অর্থে রবীন্দ্রসংগীতে দেখা যায়।[২]

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে' (পূজা ৪৯২) গানটির প্রসঙ্গো এই অহংবিলুপ্তির কথা মনে আসে। রবীন্দ্রনাথ অন্য একটি গানেও বলেছেন, 'আরো প্রেমে আরো প্রেমে/মোর আমি ডুবে যাক নেমে।' (পূজা ১০৯)। St. Augustine-এর উক্তিতে আছে— 'When I shall cleave to thee with all my being, then shall I in nothing have pain and labour; and life shall he a real life, being wholly full of thee.' তবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অহং-এর আত্যন্তিক বিনাশ দেখা যায় না। মানব-গর্ব তাঁর রয়েছে ; তিনি বিশ্বাস করেন, 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে।' (পূজা ২৯৪)। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন সেই অহং-এর বিনাশ ঘটাতে,—যা পার্থিব

(১) আনন্দং ব্রহ্ম। ...আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি...।

— তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩য় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ অনুবাক।

(২) Repentance-এর ভাব বা জীবনের পাপময়তার কথা কোনো কোনো গানে যে পাওয়া যায় না এমন নয়। কিন্তু সে-ভাব রবীন্দ্রসংগীতে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। 'তুমি জাগিছ কে' (পূজা ৪৬৬) গানটির মধ্যে repentance-র আভাস আছে—

'এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ, জানিছ—
প্রভু, ক্ষমা করো হে।
তব পদপ্রান্তে বসি, একান্তে দাও কাঁদিতে আমায়,
আর কোথা যাই।'

অথবা আমারেও করো মার্জনা' (গীতবিতান, পূজা ও প্রার্থনা ৪৪) গানটির

'আমি তব মলিন সন্তান—... ... ...
আপনি ডুবেছি পাপে, কাঁদিতেছি মনস্তাপে—।'

ইত্যাদি অংশে Christian-সুলভ অনুতাপ লক্ষ করা যায়।

খণ্ডতা-বিচ্ছিন্নতার অন্তরালবর্তী ঐক্যকে দর্শনে বাধা দেয়। যে অহং দ্বৈত স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি ক'রে ঈশ্বরের সঙ্গে লীলার সহায়তা করে তাকে নিয়ে কবির গর্ব, গৌরব।[১] এতাবৎ কালের Mystic-দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এইখানেই পার্থক্য।

ঙ. অনুষ্ঠানাদি বর্জন

Mysticism এক ধরনের প্রতিভা (Genius)। চেষ্টা দ্বারা Mystic হওয়া যায় না। নিয়মানুগত্য, প্রথাপালন প্রভৃতির সঙ্গে Mysticism-এর সম্পর্ক নেই। অনুষ্ঠানিকতা বর্জনের কথা ভারতীয় ভাষাসাহিত্যের গোড়া থেকেই পাওয়া যায়। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান। বৌদ্ধ-প্রভাবিত দোঁহাকোষে ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়েছে।—

'কিন্তহ দীবেঁ কিন্তহ নিবেজ্জেঁ।
কিন্তহ কিজ্জেই মন্তহ সেব্বেঁ।।
কিন্তহ তিত্থ তপোবন জাই।
মোকখ কিং লব্ভই পাণী ণ্হাই॥ ইত্যাদি।'

জালালুদ্দীন রুমীর কবিতায় আছে The mosque that is built in the hearts of the saints is the place of worship for all, for God dwells there.

নানক বলেন—জোগ ন কংথে জোগ ন ডংডে
জোগ ন ভস্ম চড়াইয়ে।—ইত্যাদি

বাউলের গানে আছে—

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে
তোমার ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মুরশিদে।—ইত্যাদি।[২] —মদন বাউল

শ্যামা-সংগীতেও আছে

কাজ কি আমার গিয়ে কাশী।
মায়ের চরণতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥ —রামপ্রসাদ সেন

একাধিক উদাহরণের উদ্দেশ্য এটাই বুঝতে চেষ্টা করা যে, যুগে যুগে মানুষ institution বা প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। মুক্ত স্বাধীন প্রাণবান ধর্মের এটাই লক্ষণ। সব দেশের ধর্মের এটাই লক্ষণ। সব দেশের ধর্মের ইতিহাসেই এই ধারা বয়ে চলেছে। R. Otto বলেছেন East is West, West is East. St. Martin বলেছেন— All mystics speak the same language and come from the same country. সবত্রই Mystic -রা সমধর্মী। পারস্যের সূফী কবি হাফেজের সমাধির পাশে বসে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ

(১) 'আমি এলেম ভাঙল তোমার ঘুম,' 'আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,' (পুজা ২৯৪), 'হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ, কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান' (গীতাঞ্জলি ১০১) —প্রভৃতি রবীন্দ্র-সাহিত্যের অতিপরিচিত পঙক্তিগুলি দ্রষ্টব্য।

(২) কবীর বলেন—মন ন রঙ্গায়ে রঙ্গায়ে যোগী কপড়া।—ইত্যাদি।

চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। —'মনে হল আমরা দুজনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভর্তি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারেনি, আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধ-প্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়, নিশ্চিত মনে হল আজ কত শত বৎসর পরে জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক।' ('পারস্যে')।

'আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি'—'শাস্ত্রচ্যুত' হাফিজকে সইতে হয়েছিল। শিরাজ-এ হাফিজের সমাধি ফলকে তা লেখা আছে।—

'মোর সমাধি-শিয়র দিয়া যেতে
আশীর্বাদ চেয়ো পান্থ তুমি ;
ধরণীর শাস্ত্রচ্যুত যারা
এ তাহাদের হবে তীর্থ ভূমি॥
(পারস্য-প্রতিভা)।

আনুষ্ঠানিক আচারগুলিই বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করে। আচারের মূল্য আছে—যতক্ষণ তা হৃদয়ে শক্তি জোগায়। কিন্তু অভ্যাসে তা যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। হৃদয়ে যদি প্রেম না থাকে, তবে অচলায়তনের কেবল ক্রিয়া-কর্ম অনুষ্ঠানে পরম গুরু ধরা দেন না। রবীন্দ্রনাথ সর্বক্ষেত্রে এই অচলায়তন ভেঙেছেন। আচারের বন্ধনে ধর্মের প্রাণ নষ্ট হয়। সহজ সুখের সুধা—সে যে অমূল্য।

'(আমার) পাত্রখানা যায় যদি যাক ভেঙে চুরে—
আছে অঞ্জলি মোর, প্রসাদ দিয়ে দাও-না পূরে॥
বাসা বাঁধার বাঁধনখানা যাক্ না টুটে,
অবাধ পথের শূন্যে আমি চলব ছুটে।
শূন্য-ভরা তোমার বাঁশির সুরে সুরে
হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও-না পূরে॥' (পূজা ৯৬)

'অকারণে অকালে' গানটিতে আছে—ঈশ্বরের আহ্বান যদি অন্তরে এসে থাকে তবে আচারের বাতি না জ্বেলে নিজের আলোতেই পথ চলা যায়।—

'.... ঘরের লোকে কেঁদে কইল, মোরে,
'আঁধারে পথ চিনবে কেমন করে?'
আমি কইনু, 'চলব আমি নিজের আলো ধরে,
হাতে আমার এই যে আছে বাতি।' (—পূজা ৩৫১)

আবার সে বাতিও যদি নিবে যায়, তখন—

'সেই নিমেষে হঠাৎ দেখি, কখন পিছু পিছু
এসেছে মোর চির পথের সাথি॥' (—পূজা ৩৫১)

আনুষ্ঠানিক পূজাবিধির আলোক ছাড়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। আনুষ্ঠানিকতার বিধিবিধান তিনি ছেড়েছিলেন বলেই তিনি ব্রাত্য, তিনি মুক্ত। এই কথাটি অতুলনীয়ভাবে

বলেছেন 'পত্রপুট'-এর ১৫ নং কবিতায়—

আমি ব্রাত্য, আমি পঙ্‌ক্তিহারা।
বিধান-বাঁধা মানুষ আমাকে মানুষ মানেনি,
তাই আমার বন্ধুহীন খেলা ছিল সকল পথের চৌমাথায়,
ওরা তার ও-পাশ দিয়ে চলে গেছে
বসনপ্রান্ত তুলে ধরে।
দলের উপেক্ষিত আমি ;
মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায়,
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।

Mysticism ও সূফীধর্মের সাধকদের সাধনায় Darkness বা হতাশারি অন্ধকার একটি দুরতিক্রমনীয় প্রতিবন্ধক। সাধনপথে বার বার মনে হয়, সব সাধনাই যেন বিফল, কোথায় ঈশ্বর ! এমন কি ঈশ্বরপুত্র যীশুকেও মৃত্যুযন্ত্রনায় বলতে হয়েছিল—E'-li, E'-li, la-ma, sa-bach-tha-ni? "হে ঈশ্বর ... কেন আমাকে ত্যাগ করলে ?" ('মানবপুত্র' রবীন্দ্রনাথ)।

(চ) গান।

Mystic-দের আরেকটি লক্ষণ— গান। গান তাদের প্রকাশের প্রধান বাহন। অনির্বচনীয় অনুভূতিকে প্রকাশের জন্য গানই শ্রেষ্ঠ বাহন। Under hil বলেন,—'Of all the arts music alone shares with great mystical literature the power of waking in us a response to the life movement of the universe : brings us-we know not how-news of its exultant passions and its incomparable peace. Beethoven heard the very voice of Reality, little of it escaped when he translated it for our ears.' সূফী, বাউল সকলেই সংগীতকেই তাঁদের প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও বলেন—

'যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর
তাদের সবার সুরে সবাই মেলে নিকট হতে দূর।' (-পূজা ১৪)

'গান' শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে এক নতুন অর্থবহ শক্তি দিয়েছেন। ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টিকে তিনি সংগীতসৃষ্টির উপমায় বেঁধেছেন।[১] আজীবন সংগীতের সাধক রবীন্দ্রনাথ সংগীতের স্বরলহরীর প্রতিটি লীলাকে অনুধাবন করেছেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, নাদ থেকে বিশ্বসৃষ্টি। ওঁকার অর্থাৎ অ-উ-ম-কা-এর বিকাশের মধ্যে সমস্ত স্বর ও ব্যঞ্জন নিহিত। প্রণব থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি। 'ওমিত্যেতদক্ষরং সর্বং।' (মাণ্ডুক্য উপনিষদ-১)। রবীন্দ্রনাথ তাই বিশ্বসৃষ্টিকে সংগীতের স্বরবিকাশের মতোই

(১) "প্রভু তোমার বীণা যেমনি বাজে আঁধার-মাঝে
অমনি ফোটে তারা।" (পূজা ৩৫)

মনে করেছেন। সংগীতকে এই মহিমায় আরোপ করা খুব কম কবির ক্ষেত্রেই দেখা গেছে।[১]

ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রধান অংশ, সুন্দরতম বিকাশ মানব। এই মানব-জীবনের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করছে। ঈশ্বর যে পরম আনন্দ, পরম প্রীতি ও সুষমা দিয়ে জগৎকে ভরে রাখছেন, সেই সুষমার সঙ্গে যখন মানবজীবনের সামঞ্জস্যের যোগ না থাকে, তখনই জীবন হয় বেসুরো। এই জীবনে সেই ঐশ্বরিক সুষমার সুরকে আবাহন করেন কবি। ঈশ্বরের কাছে তিনি সেই সুরে দীক্ষা নিতে চান। (পূজা ২)। কখনো তিনি ঈশ্বরের গানে মুগ্ধ হন, আবার কখনো সেই সুরকে নিজ কণ্ঠে ধারণ করতে চান। (পূজা ৪)। কখনো নিজেকে তাঁর সংগীত-যন্ত্র মনে করেন। (পূজা ২০৯)। 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি' (পূজা ২৬) তখনই ভুবন তার অনন্ত সৌন্দর্যের রূপে উদ্ভাসিত হয়। কবি তাই বলেন—

'গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে, ...
জীবন তোমার সুরের ধারায় পড়ুক সেথায় লুটে॥...
সুরহারা প্রাণ বিষম বাধা—সেই তা আঁধি, সেই তো ধাঁধাঁ—
গান-ভোলা তুই গান ফিরে নে, যাক সে আপদ ছুটে॥' (—পূজা ১০)

ঈশ্বর 'জগত জুড়ে উদার সুরে' যে 'আনন্দ গান' (পূজা ১৪৪) বাজিয়ে চলেছেন, 'যে ধ্রুবপদ' 'বিশ্বতানে' (পূজা ৩৩৫) বেঁধে দিয়েছেন, তাকে আপন জীবনে মেলাতে হবে।

'হৃদয়বাঁশি আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে॥
নিশীথ রাতের নিবিড় সুরে বাঁশিতে তান দাও হে পূরে,
যে তান দিয়ে অবাক কর গ্রহ-শশীরে॥' (পূজা, ২০৪)

গীতবিতানের 'পূজা' পর্যায়ের শেষ গানটিতে কবি তাই বলছেন—

'আজকে মোরে বোলো না কাজ করতে, ...
আজকে না হয় একটি বেলা ছাড়ব মাটির দেহের খেলা,
গানের দেশে যাব উড়ে সুরের দেহ ধরতে॥' (পূজা ৬১৭)

(১) জালালুদ্দীন রুমীর একটি কবিতায় আছে—

I rest a flute laid on thy lips;
A lute, I on the breast recline.
Breathe deep in me that I may sigh;
Yet strike my strings, and tears shall shine.

বাউলের গানেও আছে—

ধন্য আমি বাঁশিতে তোর আপন মুখের ফুঁক।
এক বাজনে ফুরাই যদি নাই রে কোন দুখ।—ঈশান যুগী।

এ সমস্ত গানে সংগীত-যন্ত্রকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হলেও বিশ্বের বিকাশকে সংগীতের রাগরাগিণীর বিকাশের সঙ্গে তুলনা করার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া জানা নেই। উদ্ধৃত গানগুলি রবীন্দ্রনাথের 'বাজাও আমারে বাজাও' বা 'যখন তুমি বাঁধছিলে তার' প্রভৃতির সমপর্যায়ের।

Mysticism -এর নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা বা চরিত্রলক্ষণ যদি বেঁধে দেওয়া যায় তবে রবীন্দ্রনাথকে তার মধ্যে ধরা যায় না। কাকেই বা ধরা যায় ? খ্রিস্ট্রিয় Mystic-দের সঙ্গো সূফীদের পার্থক্য আছে, সূফীদের সঙ্গো বাউলদের পার্থক্য আছে— তবু এঁরা সবাই Mystic—রবীন্দ্রনাথও তাই। সব Mystic-দের মধ্যে সাধারণ (common) লক্ষণ একটিই। তা হচ্ছে—ঈশ্বরের সঙ্গো চৈতন্যের প্রত্যক্ষ যোগ। রবীন্দ্রনাথের গানে তার অভাব নেই। এখানেই রবীন্দ্রনাথ Mystic। আবার পার্থক্য এই যে, সব Mystic-রাই সিদ্ধির প্রার্থী, রবীন্দ্রনাথ, লীলার প্রার্থী। সূফী অল্ জুনাইদ বলেন, "God should cause thee to die from thyself and to live in Him." (A. J. Arberry -র 'Sufism' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হওয়া। রুমী বলেন, 'কিত্না সুখদ হোগা বহ ক্ষণ জব হম, তু ঔর ম্যয় মহলমে একসাথ বৈঠে হোংগে।' (দ্র. 'The Mystics of Islam'-by R. A. Nicholson; অনুবাদ—নর্মদেশ্বর চতুর্বেদী)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন—

'আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে,—
দুঃখ-সুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের তীরে॥' (-পূজা ৫৯১)

॥ বাউল ॥

Mystic-দের একটি শাখা বাংলার বাউলসম্প্রদায়। এঁরা দলছুট, ব্রাত্য, বাওরা। আনুষ্ঠানিক বিধানের নিগড় ভেঙে এঁরা পথে নামেন সাঁই-এর ডাক শুনে। এ আহ্বান সোজাসুজি চৈতন্যের কাছে। কোনো মধ্যবর্তী মোল্লা-কাজী, গুরুমুরশিদ বা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এ আহ্বান না-ও পেতে পারেন। ফলে তাঁদের সঙ্গো বাউলদের বৈপরীত্য।[১]

ঔপনিষদিক মননপ্রধান ধর্ম বৌদ্ধ, সূফী, সহজিয়া প্রভৃতির সংস্পর্শে বঙ্গাদেশে এক বিশেষ রূপ গ্রহণ করে, উপনিষদের মনন-প্রাধান্য হৃদয়-প্রাধান্যে পরিণত হয়। ব্রহ্ম বাউল-সাধনায় 'মনের মানুষে' পরিণতি লাভ করে। ব্রহ্ম ও মানবের সম্পর্ক সম্বন্ধে উপনিষদে বলা হয়েছে—

যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি। (ঈশ-১৬)
যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। (কঠ-২/১/১০)
অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। (কঠ-২/১/১২)
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ। (মুণ্ডক-৩/১/৭)
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। (শ্বেতাশ্বতর ৪/১৭)

এই সম্পর্কই ভক্তিবাদের সংস্পর্শে এসে 'মনের মানুষে' পরিণতি পেয়েছে। বাউল এক অতন্দ্র সাধনায় আজীবন মগ্ন-সেটা তাঁর আত্মস্বরূপের উপলব্ধি। যে অচিন পাখি দেহ-খাঁচার ভিতরে ক্ষণে ক্ষণে আসে-যায়—তার সঙ্গো যোগ সাধনই বাউলের সাধনা। তার জন্যে সমাজবন্ধনকে তুচ্ছ করেন তিনি।

(১) তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।
তোমার ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মুরশিদে॥ —মদন

এই মনের মানুষ প্রেম-সম্পর্কে আবদ্ধ। বৈষ্ণবের সঙ্গে বাউলের যোগ আছে। হিন্দু বাউলেরা অধিকাংশই বৈষ্ণবভাবাপন্ন। উভয় সাধনাতেই প্রেম বিশিষ্ট মাধ্যম। তবে বৈষ্ণবের প্রেম বাউলের প্রেমের মতো সাধ্য ও সাধককে প্রত্যক্ষযোগে যুক্ত করে না। বৈষ্ণব দর্শকমাত্র। সে রাধা হতে পারে না। বাউল নিজেই রাধা।

এই 'মনের মানুষের' উপলব্ধির জন্য বা জীবাত্মা-পরমাত্মার যোগ-সাধনের জন্য বাউলরা অনেক গুহ্য ক্রিয়ার (Esoteric, Sexo-yogic) অনুষ্ঠানও করেন। তবে 'মনের মানুষের' সঙ্গে বাউলদের যে মরমী সম্পর্ক, সেটাই রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছে। বাউলদের গুরুবাদও রবীন্দ্রনাথ মানেননি।

'মনের মানুষ'-রূপে ঈশ্বরের যে পরিচয় তা বাউলদের কাছ থেকে গৃহীত হলেও রবীন্দ্রনাথ যে বাউলদের সঙ্গে সংযোগের পূর্বেও এই ভাবে ভাবিত ছিলেন না, এমন নয়। উপনিষদ্-পাঠ ছাড়াও নিজের পরিবারের মধ্যেই এই ভাবের উদাহরণ তিনি পেয়েছেন। 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে' গানটি কবি তাঁর পিতার ভক্ত-বন্ধু শ্রীকন্ঠ সিংহের কণ্ঠে বারবার শুনেছেন। (দ্র,'জীবনস্মৃতি')। পঁচিশ বছর বয়সে (১৮৮৬) তিনি তাঁর জীবনের স্মরণীয় গান

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে॥ ...
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর লোকলোকান্তরে যুগযুগান্তর—
তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে॥ ...' (পূজা-৪৮)

রচনা করেন। তবে এই গানটি বা প্রথম বয়সের 'অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী' (পূজা ২৪৯), 'আছ অন্তরে চিরদিন' (পূজা ৪২২), 'কার মিলন চাও' (পূজা ৪২৮) প্রভৃতি ব্রহ্মসংগীতগুলিতে এই 'অন্তর্যামী' ভাব থাকলেও সেগুলি মোটামুটি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম ও দেবেন্দ্রনাথসুলভ আকুলতার ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বাউল গান তাঁর গানে যে গতিবেগ এনে দেয় তার পরিচয় পাই এদের পরবর্তী কালের গানে। পরবর্তী কালে অর্থাৎ 'গীতাঞ্জলি'-পর্বে এই আকুলতা এক প্রত্যয়দৃঢ় প্রেমসম্পর্কেরই সূচনা করেছে। 'গীতাঞ্জলি'-পর্বের গান সুরের দিক থেকেও বাউল, ভাবের দিক থেকেও বাউল—অনেক গানই আদর্শ বাউলাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত।

বাউলের 'অচিন পাখি'-র ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে 'আমি কান পেতে রই' (পূজা ৫৪৬) গানটিতে এবং আরও অনেক গানে। 'মনের মানুষ' অর্থে আপন মনের মধ্যস্থিত মানুষ,—কিংবা মনের মতো মানুষ, যাই হোক না কেন, সে যে বাস্তব লভ্য নয়—তাই সে অধরা অচিন পাখি। রবীন্দ্রনাথ তাই 'আপন মনের গহন দ্বারে' কান পেতে থাকলেও তাকে পরিষ্কার বুঝে উঠতে পারেন না।

'কে সে মোর কেই বা জানে, কিছু তার দেখি আভা।
কিছু পাই অনুমানে, কিছু তাই বুঝি না বা।' (পুজা ৫৪৬)

Mystic-রা পরিষ্কার না বুঝলেও হতাশ হয় না। কারণ —

মাঝে মাঝে তার বারতা আমার ভাষায় পায় কি কথা রে,

ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী গানের তানে লুকিয়ে তারে॥ (পূজা ৫৪৬)

কখনো কখনো সংযোগের সূত্র হারিয়ে যায়—

'আমার মন যখন জাগলি না রে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।' (পূজা ৫৫০)

তবে রবীন্দ্রসংগীতে যোগও যেমন নিরবচ্ছিন্ন নয়, এই বিচ্ছেদও তেমনি ক্ষণিক। বিরহ ও মিলন উভয়েই প্রেমের বোধটিকে পাকা করে তোলে। তাই মনের মানুষকে কবি অনুভব করেন।

রূপজগতের সর্বত্রই এই মনের মানুষকে অনুভব করা যায়।

'কে গো অন্তরতর সে। ...
সোনালি রুপালি সবুজে সুনীলে সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে—
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে, ডুবালে সে সুধা-সরসে' (পূজা ৫২৫)
আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকলখানে। (পূজা ৫৪৯)

শেষ পর্যন্ত সেই উপনিষদের কথা—'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।' 'শ্যামলী'-র আমি' কবিতায় কবি বলছেন—

ও দিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি।'

পরিশেষে রবীন্দ্রসাহিত্যে বাউলতত্ত্ব ও 'মনের মানুষের' স্বরূপ প্রসঙ্গে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের একটি উক্তি স্মরণ করি।— '...through all his songs and poems Tagore sings of an Infinite Being, Who is seeking His self-expression through the whole creative process of Self-realisation,-and the best expression of the Divine personality is through the human personality, and throughout the life-process of man there is going on this continual process of lovemaking between the human and the Divine. This human personality and the divine personality, both of which remain combined in the nature of man, are the 'I' and the 'You', the 'Lover' and the 'Beloved' so much spoken of by the poet Tagore in his songs and poems. In singing of this 'I' and the 'You' in man, between man and the 'man of the heart,' Tagore has been the greatest of the Bauls of Bengal.' - 'Obscure Religious Cults'.

॥ মৃত্যু-অমরতা-মুক্তি ॥

দুঃখ ও মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তা এ প্রসঙ্গে এবার বিশ্লেষণ করা যাক। ভারতীয় বিশ্বাসে, ঈশ্বর যা করেন তা মঙ্গালের জন্যই করেন। রবীন্দ্রনাথও সেই বিশ্বাসেরই অনুবর্তী হয়ে বলেন—

'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গাল-আলোক
তবে তাই হোক।' (পূজা ১৯৩)

দুঃখ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের দক্ষিণ মুখের আনন্দরূপকে তিনি দেখতে চেষ্টা করেছেন। জীবনে তিনি বহুবার মৃত্যুর দেবতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন।[১] এইসব মৃত্যুর মধ্যে তিনি কেবল বিয়োগই দেখেননি। 'বলাকা'র ১৯ নং কবিতায় বলেছেন—

'এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনখানে আছে কোন মিল ;
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।'

দৌহিত্র নীতীন্দ্রের মৃত্যুর পরে পুত্র শমীন্দ্র-র কথা কবির মনে পড়ে গেল (মৃত্যু-৭ অগ্রহায়ন, ১৩১৪)। মীরা দেবীকে লিখলেন—'শমী যে রাত্রে চলে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি...যা ঘটেছে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি...।' (রবীন্দ্রজীবনী-প্রভাতকুমার-৩য় খণ্ড)।

স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, কাদম্বরী দেবী, বলেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নিকট-আত্মীয়, বন্ধুর মৃত্যু—এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারই শুধু নয়, বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে দিনে দিনে তাঁর সংযোগ ব্যাপকতর হওয়ায় যেসব সমষ্টিগত দারুণ দুঃখ-প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছে—সেইসমস্ত দুরপনেয় শোকাবহ পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারাননি। যদিও ক্লান্তি এসেছে, তবু দুঃখ বা মৃত্যুকে ভয় করেননি। মৃত্যুর সামনে নির্ভীক শান্তভাবে বলেছেন—

সমুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার॥ (আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ১৩)

এর কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল, জীবন কেবল জন্ম-মরণের দিগ্বলয়ের ঘেরেই আবদ্ধ নয়। জীবন অনন্ত। 'গীতা'-র বিখ্যাত শ্লোক 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি' (২/২২) প্রভৃতির মতো কবিও বলতে পেরেছেন—'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয় ?' (পূজা ৬০৮)। মৃত্যুকে তাই বন্দনা করতে পেরেছেন—

জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে, নমি নমি।
জয় জয় পরমা নির্‌বৃতি হে, নমি নমি॥

সব ভয় ভ্রম ভাবনার
চরমা আবৃতি হে, নমি নমি। (পূজা ৫৮৫)

(১) 'প্রতীক্ষা' (১৮২২), 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' (১৩২৯) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

জনমে জনমে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারবার আসা যাওয়া কেন? জীবনই যদি লব্ধ হল, তবে মৃত্যু কেন?

'মরণের মুখে রেখে দূরে যাও দূরে যাও চলে
আবার ব্যথার টানে নিকটে ফিরাবে বলে ॥' (পূজা ৫৮৭)

অতএব মৃত্যু কবির কাছে কোনো সমস্যাই নয়। বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে অমর প্রাণ প্রবাহিত, তারই স্পর্শলাভ জীবনে কাম্য।—

'মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।' (পূজা ৩৪৫)

সেই তো অমরতা।

অমরতার আদর্শ রবীন্দ্রসংগীতে এই নয় যে, মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবনের সমুদ্রে নিজের জীবনস্রোতকে মিলিয়ে বিলীন হয়ে যাওয়া। কবির কাছে অনন্ত জীবন অনন্ত পথ চলার জীবন। মৃত্যুর পর মৃত্যু পার হতে হতে ক্রমশ নবীন হতে হতে এগিয়ে চলা। পূর্বেই বলেছি তাঁর ঈশ্বর পান্থ। কবি তাই তাঁর পথের সাথীকে বারবার নমস্কার জানান। সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে স্রষ্টাকে পাওয়া যায় না। তাই যখন বলেন, 'হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়' (আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ১৩), তখন মনে হয়, মরত্বের বন্ধন ক্ষয়ের কথাই বলেছেন। 'মর্ত্য' অর্থে যা মরণশীল। যা স্থাণু, স্থবির,—তাই জরা, তাই মরণশীল। যা গতি, যা পথ-চলা, তাই জীবন। অনন্ত চলাই অনন্ত জীবন। এই অনন্ত চলায়—

'তুমি হবে চিরসাথি, লও লও হে ক্রোড় পাতি—
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার।' (আনুষ্ঠানিক ১৩)

এই 'পারাবারে' 'হাল-ভাঙ্গা পাল-ছেঁড়া ব্যথা' (পূজা ৬১৫) কোন্ নিরুদ্দেশে নিয়ে যাবে তার ঠিকানা না পেলেও 'হালের কাছে মাঝি আছে' (পূজা ২৪১), তিনি যে তরী পারে নিয়ে যাবেন, এ বিশ্বাস কবির কখনো ভাঙে না। তাই সাধকের নির্বিকল্প মুক্তি কবির কাম্য নয়। 'পরিশেষ'-এর 'পান্থ' কবিতায় বলা হয়েছে,—

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই, ...
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার-ভাঁটায়
নিত্যবহে নিয়ে ছায়া আলো। ...
সে তরঙ্গ-নৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সঙ্গীতে
এ বিশ্বপ্রবাহে,
সে-ছন্দে বন্ধন মোর, মুক্তি মোর তাহে।

সৃষ্টির হাত থেকে মুক্তি চাওয়া মানে স্রষ্টার হাত থেকেও মুক্তি চাওয়া। সৃষ্টিতেই স্রষ্টা—সৃষ্টিই স্রষ্টা। তাই গানে বলেছেন—

'আমায় মুক্তি যদি দাও বাঁধন খুলে
আমি তোমার বাঁধন নেব তুলে ॥' (পূজা ১৮৩)

ঈশ্বর নিজেই সৃষ্টির বাঁধনে আবদ্ধ। অতএব নিজের ব্যক্তিবোধের স্বাতন্ত্র্যের সীমা পার

হয়ে নিজেকে সৃষ্টির সঙ্গে, সমষ্টির সঙ্গে, এক করে ফেলতে পারলে সেইখানেই মুক্তি।—

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে॥ ...
আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখ-বিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে। (পূজা-৩৩৯)

এই বিশ্বের সব কিছুতেই—প্রকৃতিতেও, মানবের কর্ম-সাধনাতেও,—মুক্তি আছে। এই যে বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা, এইখানে আত্মবোধকে হোম করে আহুতি দিতে হবে। দেহ-মনের সুদূর পারে আপনাকে হারিয়ে ফেলতে হবে। অতএব,

এই কথাটা ধরে রাখিস, মুক্তি তোরে পেতেই হবে।
যে পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে॥ (পূজা ১৯০)

গানটিতে যে মুক্তির কথা বলা হয়েছে, তা বিশ্বাতিক্রমী ওপারের মুক্তি নয়। 'পারের পানে' কথাটির মধ্যে বিশ্বাতিক্রমণের আভাস আছে মনে হতে পারে। কিন্তু শেষ পঙ্ক্তিতে বলেছেন, 'জীবনকে তোর ভরে নিতে মরণ-আঘাত খেতেই হবে।' জীবনকে ভরে নেওয়া কি শূন্য নির্বাণে সম্ভব? নির্বাণ বা মুক্তি তো জীবনের অপর পারে যাওয়া, চিরদিনের তরে। বারবার 'মরণ-আঘাত' খাওয়ার অর্থ বারবার নবজীবন লাভ করা। রবীন্দ্রনাথের মুক্তি বিশ্ববৈরাগ্যে নয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধের পরিণতিও বিশ্ব বৈরাগ্যে নয়। বিশ্বানুরাগই শেষ কথা, চরম কথা। এই অনুরাগেই কবি বলতে পারেন—

'আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ,
আর, সৃষ্টির শেষ রহস্য ভালবাসার অমৃত।
... ...
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে—
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে,
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।' (-পত্রপুট, ১৫)

এই অনুরাগেই কবি বলতে পারেন—

আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে ....
নূতন প্রেমে ভালবাসি আবার ধরণীরে॥ (পূজা ৫৯১)

এই তো প্রেম, এই তো বন্ধন, এই তো মুক্তি। ফিরে ফিরে এই খেলার মধ্য দিয়ে অনন্ত পথ চলা—এই তো অমরতা।

আরশীনগরের পাখি

(১)

গানের কাছে শ্রোতার প্রত্যাশা কী? সে চায় গান শুনে তার হৃদয়ে লাগুক একটা টান, একটা অনুরণন। গানের সঙ্গে শ্রোতার সম্পর্ক একটা সংবেদনমূলক যোগসূত্রে বন্ধ। এ কারণেই গানের বিশ্বকবির গীতবিতানের দিকে তাকালে মনে হয় বিশ্বের হৃদয়ের খবর সম্পূর্ণই তাঁর জানা ছিল, এবং বিশ্বকবির হৃদয়ের আরশীতে বিশ্বের শ্রোতারা তাদের আপন হৃদয়ের অনুভবগুলিকে খুঁজে পেয়েছে।

বিশাল জগৎসংসার, বিপুল তার কলকোলাহল। তার মধ্যে মানুষ বড়ো অসহায়। জীবনযাপনের রহস্যাবর্তে ডুবতে ডুবতে সে হাত বাড়িয়ে দেয় কিছু একটা অবলম্বনের খোঁজে। হাতের কাছে যা কিছু পায় তা সবই ভঙ্গুর, পলকা। হালভাঙা পালছেঁড়া ব্যথা খোঁজে কোনো সহৃদয়ের সহানুভূতি। গীতবিতানের কলিতে কলিতে রয়েছে সেই সহৃদয়ের বরাভয়। সান্ত্বনার নীড়।

দৈনন্দিনের ওপারে যে চিরনূতনের স্বর্গোদ্যান—সেখানকার অমৃতমলয় তাকে স্নিগ্ধ করে, শান্ত করে, নিরাময় আনন্দের আশ্বাস দেয়। তাকে দেয় আধ্যাত্মিকতার অপাপস্পৃষ্ট অমৃত। গীতবিতানের গানে মানুষ খুঁজে পায় নির্মল আধ্যাত্মিকতার বাতাবরণ।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা কোনো আরোপিত ব্যাপার নয়। আজন্ম সঙ্গী। আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম, প্রভৃতি শব্দগুলি এমনিতে বড়োই নিরপরাধ, বড়োই সরল,—আমরা তাদের নানা ভাবে জটিল করে তুলি। তখনই শব্দগুলি দুষ্ট হয়ে যায়। নিজের স্বরূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা এবং অন্বেষণ—এই তো আধ্যাত্মিকতা। এই স্বরূপ সন্ধানে গেলেই ধরা পড়ে মানুষের উৎসের ঠিকানা। সেই ঠিকানার সন্ধানেই উঠে আসে বহুর সঙ্গে এক বা এক-এর সঙ্গে বহুর সম্পর্ক। এই ঐক্যের বোধেই ধৃত হয়ে আছে ধর্মের সংজ্ঞা। একে যখন আমরা কোনো নামে-রূপে বা আচারে বাঁধতে যাই, তখন সেই বন্ধনই ধর্মের মধ্যে সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা তথা বিভেদ ও অনৈক্যের আমদানি করে। যীশু খ্রীষ্ট মানুষকে ভালবাসতেন, তাই মানুষের সেবা করতেন। তিনি কোনো সম্প্রদায় গড়েননি। কিন্তু পরে তাঁর নামে গড়ে ওঠে সম্প্রদায় এবং তারই সূত্রে আসে ধর্মান্তর, অন্য ধর্মের সঙ্গে বিরোধ, দাঙ্গা প্রভৃতি। সব ধর্মগোষ্ঠীতেই এমন ঘটেছে, ঘটছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ পরিবর্তনীয় 'বাসাংসি জীর্ণানি' নয়— এ তাঁর সত্তার অচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মবোধের মধ্যে কোনো নাম-রূপ-এর বালাই ছিল না। সেই ধর্ম কোনো আচারে বন্ধ ছিল না। তাই তাঁর রচনায়, তাঁর এই গীতবিতানে

দেখছি—পূজা, প্রেম, স্বদেশ, প্রকৃতি প্রভৃতির মধ্যে রয়েছে এক ঐক্য। ব্যক্তি, সমাজ, প্রকৃতি, বিশ্ব প্রভৃতি সবকিছুকে তিনি একই সত্ত্বার ঐক্যবন্ধ রূপে দেখেছেন। ব্যক্তি থেকে বিশ্ব—সর্বত্রই একই সত্ত্বাকে তিনি দেখেছেন। আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম তো মানুষের parttime বা আংশিক ব্যাপার নয়। ধর্ম তো জীবন জুড়ে, জীবন ব্যাপ্ত করে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ জীবনপথে পদচারণা।

শৈশব থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার শুরু। পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ, উপনিষদ পাঠ বা অক্ষয়কুমার সরকার ও সারদাচরণ মিত্র সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ'-এ সংকলিত, উদ্ধৃত—বৈষ্ণব পদাবলি পাঠ—সব কিছুই তাঁর আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মবোধকে সঞ্জীবিত, উদ্দীপিত করেছে। তাই ঈশ্বরকে তিনি কখনোই দূরের মানুষ ভাবেননি। ১২ বছর বয়সে তিনি লিখতে পেরেছিলেন 'গহন কুসম কুঞ্জ-মাঝে প্রভৃতি বৈষ্ণব পদাবলি-প্রতিম গান। ওই বয়েসে রাধার প্রেম বা আকুলতা তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভবের আওতার বাইরে ছিল কিনা তা প্রশ্নাতীত নয়। সাধারণ ভাবে ভানুসিংহের গানগুলিকে পূজা পর্যায়ে ধরা যায় না। তবে সে ভাবে দেখলে বৈষ্ণব পদাবলির গানও কি পুরোপুরি পূজার-গানের মর্যাদা পেতে পারে? রবীন্দ্রনাথের 'বৈষ্ণব কবিতা' ('সোনার তরী') তো পদকর্তাদের গানগুলিকে মানব প্রেমের গানের মর্যাদাই দিয়েছে। তবু ভানুসিংহ যখন বলেন—'জয় জয় মাধব জয় জয় রাধা

চরণে প্রণমে ভানু॥' (ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী-১০)।

তখন ভক্ত গায়কের পদাবলী কীর্তনের অনুভবই কি মনে আসে না? 'বৈষ্ণব কবিতা'-য় রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরভক্তি আর মানবিক প্রেমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন–

"দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

তাই 'প্রেম'পর্যায়ের গানগুলিও মর্ত্যলোকে স্বর্গের বাণী শোনায়।

শৈশবের ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের অনুকরণে গাঁদা ফুল দিয়ে ঘর সাজিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে খেলা করতেন...'সে খেলায় অনুকরণের আর আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না।' (জীবনস্মৃতি)।

'আর আর সমস্ত অঙ্গ' বলতে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই 'দীপের আলো ধূপের ধোঁওয়া,' মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতিরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু 'গানের' অংশটি যদি ফাঁকি না হয়ে, খাঁটি হয়ে থাকে—তাও কি কম কথা? ব্রাহ্মসমাজে গান তো মন্ত্রেরই সহোদর। শুধু ব্রাহ্মসমাজ কেন ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির গোড়াতেই তো নাদ ব্রহ্মের কথা আছে, সামগানের প্রচলন হয়েছে। গান তো ঈশ্বরধারণার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে।

বলেছি, ধর্মকে সরলভাবে দেখলে সে নির্মল, উদার। তাকে নাম-রূপ-আচার দিয়ে আমরা দূষিত, সংকীর্ণ করে তুলি। ধর্ম অত্যন্ত ব্যাপকভাবে আমাদের ঘিরে আছে। আমাদের মানবিক প্রেম-গার্হস্থ্য-দাম্পত্য, সামাজিকতা, রাজনীতি, সাহিত্য, সংগীত, খেলাধুলা সবকিছুই ধর্মধৃত। তবে দেখতে হবে আমরা সব কিছু কতটা ব্যক্তিস্বার্থ সম্পর্কিত করে তুলি।

'কর্ম যখন প্রবল আকার' ধরে চারিদিক ঢেকে ফেলে, 'বাসনা যখন বিপুল ধুলায়/অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়,' 'আপনারে যবে করিয়া কৃপণ/কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন,' 'যদি পূজা করি মিছা দেবতার, শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার'—তখনই আমরা সংকীর্নতায় বন্দী। তার থেকে মুক্তির জন্যেই তো আমাদের প্রতিদিনের কর্মকে শোধন করে উদারতার দিকে নিয়ে যেতে হয়। 'দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচার ঘরে।' 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া/বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।' ব্যক্তিস্বার্থ থেকে সরে এলে বিশ্বের উদার আলো বাতাসের সঙ্গে নিজেকে মেলানো যায়। 'আজিকে এই সকাল-বেলাতে/বসে আছি আমার প্রাণের সুরটি মেলাতে...নীলিমা এই নিলীন হল আমার চেতনায়।/সোনার আভা জড়িয়ে গেল মনের কামনায়।' গীতায় কর্মকে নিঃস্বার্থ করার কথা বলেছেন কৃষ্ণ। গীতবিতানের গানেও মুক্তির সাধনার কথা আছে, আছে-'অহং' বা নিজেকে সর্বজনের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার কথা। 'সবার সাথে মিলাও আমায় ভুলাও অহংকার/খুলাও রুদ্ধ দ্বার/পূর্ণ করো প্রণতি গৌরবে।'

কেবল 'পূজার' গান নয়, তাঁর সংসারযাপন, তাঁর ব্যক্তিগত শোক-আনন্দ, তাঁর সামাজিক কর্ম, শান্তিনিকেতন, দেশপ্রেম, সাহিত্যকর্ম—সবই কি সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির দিকে, উদারতার দিকে নিয়ে যাবার কথা বলে না?

'কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন'— এ অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ 'কৃপণ' বলেছেন। 'কৃপণ' শব্দটিকে আমরা কেবল 'কঞ্জুষ' অর্থে ব্যবহার করি। সংস্কৃতে এর অর্থ-কৃপার পাত্র। গীতায় (২/৭) কার্পণ্য=দীনতা। উপনিষদে (বৃহদারণ্যক ৩/৮/১০) এর অর্থ—কৃপণঃ=কৃপার পাত্র। 'যঃ বৈ এতদ অক্ষরম্ গার্গি! অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।" অর্থাৎ অক্ষর পুরষকে না জেনে যে ইহলোক ত্যাগ করে সে কৃপার পাত্র। রবীন্দ্রনাথ 'আপনারে যবে করিয়া কৃপণ'—পঙ্‌ক্তিটিতে এই 'কৃপণ' শব্দের এই অর্থটিই গ্রহণ করেছেন। অক্ষর পুরুষ বা পূর্ণকে যে না জানে সে অপূর্ণ বা খণ্ডই থেকে যায়। সে কৃপার পাত্র। আবার 'দীন হীন মন' কথাটিতে গীতার অর্থটিও বোঝা যায়।

'ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া' বা 'শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান'—এ সব পঙ্‌ক্তির আদর্শ কি রবীন্দ্রজীবনে বা কর্মে কেবল কথার কথা? এই কর্মপথে ত্যাগ ব্রত প্রয়োজন। 'ত্যাগ ব্রতে নিক দীক্ষা।' এ কেবল 'স্বদেশ' পর্যায়ের গানেরই কথা নয়, তাঁর 'পূজার' গানেরও কথা; এবং প্রেম-প্রকৃতির গানের মধ্যেও এই ত্যাগের কথা আছে। এই জন্যেই মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁর সমস্ত সৃষ্টিই আসলে 'গীত-অঞ্জলি।' অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তার বিসজর্নের গান। আত্মোৎসর্গের গান। এ গানের অঞ্জলি কার উদ্দেশ্যে? কবির অন্তরতর অন্তরতম গহন গভীরে আসীন যে আত্মপুরুষ বা জীবনদেবতা—তাঁরই উদ্দেশ্যে। তাঁকে বাইরে দেখা গেলেও সে রূপ অন্তরবাসীরই প্রতিফলন। 'নয়ন সমুখে তুমি নাই নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'— এ কেবল প্রেমের গানই নয়। এ গান আর 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে'— উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই। কবির প্রিয়জন ব্যক্তিগত বন্ধনের, সীমানা ছাড়িয়ে গেলেও 'সুদূর নীহারিকা'...'যারা দিনরাত্রি আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'—তাদেরই মতো সত্য। তবে তার

স্থান তো বহিলোকে নয়,—'আমার নিখিল তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।... তব সুর বাজে মোর গানে।' (গানটিকে 'বিচিত্র' পর্যায়ে রাখা হলেও —এ প্রেমেরই গান— যে প্রেমের অন্তর্গত পূজা-প্রকৃতি-স্বদেশ প্রভৃতি সব পর্যায়ের গানই।) রবীন্দ্রভাবনায় এ ভাবেই প্রেম আর পূজা একাকার। ত্যাগ উভয়েরই মূল কথা।

কবির জীবনে এ অনুভব সহজাত। এবং তার বিকাশের জন্যে আলো বাতাস মাটি জল হিসেবে কবি পেয়েছেন উপনিষদ-গীতা-বাউল-সূফীসন্তদের গান। পিতৃদেব কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রহ্মবাদীই ছিলেন না — ছিলেন মরমী-সাধকও। তিনি পাঠ করেছেন উপনিষদ থেকে হাফিজ পর্যন্ত। ঈশ্বর-বিরহের সাধন বেদনায় তাঁর বুক থাকতো লাল হয়ে— যা ধরা পড়েছিল আর এক মরমী সাধকের দৃষ্টিতে— তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ।

রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানে আছে সীমার মাঝেই অসীমকে অনুভব করার সাধনা। একদা তিনি বলেওছিলেন—'..... আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।'... (জীবনস্মৃতি)। অসীমের সংস্পর্শে সীমার কৃপণতা দূর হয়। তখনই মনে হয়

'আলোয় আলোকময় করে হে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার
মিলালো মিলালো।।'

উপনিষদের ওই হিরন্ময় পাত্র-ঢাকা উজ্জ্বল সত্যের মুখ, ব্রহ্মজ্যোতির্লোক-এর কথা আছে তাঁর গানে। আবার বাউলের অধরা মনের মানুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা, আটকুঠুরি নয় দরোজার ঘরে (গীতা ৫/১৩=নবদ্বারে পুরে দেহী...) অচিন পাখির আসাযাওয়া এবং পাড়ার ভিতর আরশী নগর—সবই আছে গীতবিতানে।

আরশীনগর—কথাটির দুটো অর্থ হতে পারে—। ১) খুদা-এর আসন আরস্ > আরশীনগর, ২) আরশী = আয়না, দর্পণ— যাতে নিজেকে দেখা যায়। উপনিষদে বলা হয়েছে যদেবেহ তদমুত্র। গীতবিতানে আছে ওই আরশীনগরের কথা—'তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও।' (প্রবন্ধ শেষে 'পুনশ্চ' দেখুন)

আবার খুদার আসন আছে আপন হৃদয়ে-এই ভাবটি তো গীতবিতানের সর্বত্র ছেয়ে আছে। 'সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া...আছ হৃদয় মাঝে,' 'কার মিলন চাও বিরহী?... দেখ দেখ রে চিত্ত কমলে চরণপদ্ম রাজে— প্রভৃতি গানের কলিগুলিতে এ ভাব আছে।

কেবল 'পূজা' পর্যায়ে নয়, সব পর্যায়েই এ ভাবধারা আছে। গীতবিতানের পর্যায় বিন্যাস—প্রাথমিক ভাবে গানগুলির একটি শ্রেণী বিভাগ করলেও পাঠকের মনে রাখা উচিত—এ বিভাজনই চরম নয় বা শেষ কথা নয়। আকাশকে যে ভাগ করা হয় সে কেবল শিক্ষার্থীর জন্য। আকাশ অবিভাজ্য। গীতবিতানের গানও শেষপর্যন্ত এক অবিভাজ্য ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। মূল কথা, সীমা ও অসীমের মিলন বিরহের কথা—যা রয়েছে সমস্ত

বিশ্বভুবনে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কের কথা। এই দ্বৈতের আলাপ চলে আপন অন্তরেও। সৃষ্টি পেতে চায় স্রষ্টার নাগাল।

গীতবিতান কি তবে পরানুকরণের ফল, কেবল পরস্বাপহরণের ধন? সে কি শুধু পূর্বসূরীদের, চর্বিতচর্বণ? তা নয়। গীতবিতান ভারতীয় সংস্কৃতির, ভারতীয় ভাবনার (এবং সমগ্র বিশ্বমনীষার ভাবসাধনার) উত্তরাধিকারকে ধারণ করে নিয়েছে আপন সত্তায়। গীতা যেমন বেদ-উপনিষদের উত্তরসূরী হয়েও কালোপযোগী সংস্কার গ্রহণ করে নিয়েছে। গীতবিতানও তেমনি প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে যুগোপযোগী আধুনিক।

উপনিষদ বা গীতার ক্ষেত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেমন আপন বিবেকের নির্দেশ মেনে গ্রহন বর্জন করেছেন—রবীন্দ্রনাথও তেমনই করেছেন। গীতা প্রভৃতিতে রূপজগতের কোনো মূল্যই দেওয়া হয়নি। গীতবিতানে রূপসাগরের মধ্যেই অরূপকে অনুভব করার চেষ্টা হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ সেখানেই অনন্য।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক। তবে কালাপাহাড় নন। তাঁর আধুনিকতা ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে গঠিত। গানে বলা হয়েছে।

'পুরাতনকে বিদায় দিলে না যে
ওগো নবীন রাজা।
শুধু বাঁশি তোমার বাজালে তার পরান মাঝে
ওগো নবীন রাজা।

রবীন্দ্রনাথ ওই বাঁশিটি বাজাতে জানতেন। তাই গীতবিতানও পুরাতনকে নিয়েই চির নূতন।

আর, একথার সত্যতা প্রমাণ হয় তখনই, যখন দেখি উপনিষদ গীতাদিতে যাকে মনে হয়েছে 'প্রভুসম্মিত বাক্য' গীতবিতানের গানে তাকে দেখি 'সখাসম্মিত' বা 'কান্তা সম্মিত বাক্য' রূপে। অথবা তারও বেশি—নিজেরই ভাবনা গীতবিতানের আয়নায় প্রতিফলিত। একথা সহজ হবে ঈশ উপনিষদের 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ'-,...(১৫) এর সঙ্গো গীতবিতানের 'আর রেখো না আঁধারে' এবং গীতার 'অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে' (৩/২৭)-এর সঙ্গো 'আমার মাথা নত করে দাও' গানগুলিকে তুলনা করে দেখলে।

জেনে হোক, না-জেনে হোক, মানুষ কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতায় আশ্রিত। Not by bread alone -দেহ সর্বস্বতা তাকে তৃপ্তি দেয় না। তাই দেহাতীতের সন্ধান চাই।

'সুখ যারে কয় সকল জনে
বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে—
গভীর সুরে 'চাই নে' 'চাই নে'
বাজে অবিশ্রাম।'

তাহলে কী চাই?

'আরো চাই যে, আরো চাই গো, আরো যে চাই।
ভাণ্ডারী যে সুধা আমায় বিতরে নাই॥...

...দিনরজনীর বাঁশি পুরে যে গান বাজে অসীম সুরে
তারে আমার প্রাণের তারে বাজানো চাই।
আপন গান যে দূরে তাহার, নিয়ড়ে নাই॥'

এখানেই আছে আধ্যাত্মিকতার সংবাদ।

এ আধ্যাত্মিকতা প্রত্যেকের মধ্যেই আছে, এই 'আরো' চাওয়া-সবার মধ্যেই আছে। কয়েকটি গান বিশ্লেষণ-করে দেখা যাক।—

আমরা তারেই জানি...।' (পূজা-৮২)

ঈশ্বর সাথের সাথি, তিনি ঘর থেকে বাইরে টেনে আনেন। পৃথিবীর সব Mystic, সূফী মরমীরা এ কথা বলেন। —'যা হবার তা হবে' (পূজা-৮৩)—এই বলে মনকে শক্ত করে ভক্ত বেরিয়ে পড়ে পথে। 'ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায়, সেইতো ঘরে লবে' (পূজা-৮৩)-এ ভরসা আছে মনে। তাই ঈশ্বর সাথের সাথি। চলার পথে ক্লান্ত হয়ে পড়লে, পথ হারিয়ে বিপথে গেলে হাত বাড়িয়ে দেবেন তিনি। তিনি জীবনের সর্বক্ষণের সঙ্গী। আমরা তাকে 'ঈশ্বর' বলে ডাকি না ডাকি, কোনো কিছুর আশ্বাস, একটা ভরসাস্থল কোথাও আছে বলেই অনিশ্চয়ের পথে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

'আমরা তারেই জানি'-র অন্তরা = 'সঙ্গে তারি চরাই ধেনু, বাজাই বেণু
তারি লাগি বটের ছায়ায় আসন পাতি।'

বৈষ্ণবদের সখ্যরসের সাধনা এ ভাবেই গীতবিতানের গানে ছায়া ফেলেছে। কৃষ্ণের সঙ্গে গোচারণ, গোষ্ঠলীলার আবহটি এ গানে কেমন সুন্দর ফুটে উঠেছে। 'জীবন স্মৃতি'তে 'হ্যাদে গো নন্দরাণী' গানটির চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

'হ্যাদে গো নন্দরানী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও—
আমরা রাখালবালক গোষ্ঠে যাব,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।'

সকালের সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকরা মাঠে যাইতেছে—সেই সূর্যোদয়, সেই ফুল ফোটা, সেই মাঠে বিহার, তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না, সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে, সেইখানেই অসীমের সাজপরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায় ; সেইখানেই মাঠে-ঘাটে বনে-পর্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় তাহারা যোগ দিবে বলিয়াই তাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে...।'

বন্ধু, সখা, খেলার সাথি প্রভৃতি সম্বোধনে কৃষ্ণের বাল্যলীলার কথা স্মরণ করায়। বেণু বাজানো, ধেনু চরানো প্রভৃতি গীতবিতানের অন্যগানেও আছে। শুধু বাল্যলীলাই নয়, অর্জুনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুসম্পর্কের কথাও মনে আসে।

পূজা-৮২ সংখ্যক ওই গানটির সঞ্চারী-তে আছে—

'তারে হালের মাঝি করি,
চালাই তরী।
ঝড়ের বেলায় ঢেউএর খেলায় মাতামাতি।'

এখানে ঈশ্বর পার্থসারথির ভূমিকায় ; জীবনযুদ্ধের কুরুক্ষেত্রে। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বিপন্নতায় হালের মাঝি তিনি। 'হালের মাঝি'-র ভূমিকাটি গীতবিতানের আরো গানে আছে- যেমন-'মাঝি আমার বসো হালে'। -(পূজা-৫৬০)

'হালের কাছে মাঝি আছে'। (পূজা-২৪১)
'ওরে মাঝি, ওরে আমার'। (বিচিত্র-৭৩)
'সমুখে শান্তি পারাবার।' (আনুষ্ঠানিক সংগীত-৮৬৪)

এই শরণাগতি, প্রপন্ন প্রার্থনা, গীতবিতানে ভক্তিরসের উদাহরণ হিসেবে বহু গানকেই মধুর করে রেখেছে। আজো তা, আধুনিক জীবনেও, নিত্য প্রার্থনা।

আভোগ-এ আছে-

'সারা দিনের কাজ ফুরোলো
সন্ধ্যাকালে—
তাহারি পথ চেয়ে ঘরে জ্বালাই বাতি।'

দিন শেষে প্রিয়মিলনের প্রতীক্ষা। মানুষের অন্তরের সত্তা বড়ো নিঃসঙ্গ। সে প্রতীক্ষা করে থাকে তার সারা জীবনের 'সাথের সাথি'-র জন্যে-কর্মে মর্মে জীবনে মরণে।

সে যেমন কাছের মানুষ, তেমনি আবার দূরেরও। তার জন্যে পথ চাওয়া, তার জন্যে অভিসার, তারই কুঞ্জ-গৃহে প্রদীপ জ্বেলে প্রতীক্ষা। মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা, এই আর্তির চিত্র রয়েছে গীতবিতানের কলিতে কলিতে। শ্রোতা এখানে নিজেকে খুঁজে পায় গীতবিতানের 'আরশী'-তে।

(২)

লালন ফকিরের সবচেয়ে বিখ্যাত গানটির দুটি পংক্তি—

আমার পাড়ার ভিতর আরশী নগর
সেথা এক পড়োশী বসত করে।।...

লালনের আরশী নগরের পড়োশী, আর গগন হরকরা-র 'মনের মানুষ' ('আমি কোথায় পাব তারে) আর 'পথিক'-এর 'মনের মানুষ ('দেখছি রূপসাগরে মনের মানুষ') একই জন। এর আসল ঠিকানা কোথায়? উপনিষদ-গীতা কথিত 'ব্রহ্মজ্যোতিঃ'-র দেশে অথবা মানুষের হৃদয় কন্দরেও হতে পারে। ('ন তত্র সূর্য ভাতি' কঠ-১০১, ইত্যাদি, 'অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষঃ মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি কঠ' ২/ ১/১২, ১৫ ; 'ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো' ইত্যাদি, গীতা ১৫/৬)।

ব্যাপারটা নির্ভর করছে বোধের ওপরে। দ্বৈতবাদীরা তাঁর ঠিকানা জেনেও সেখানে পৌঁছাতে চান না, আর অদ্বৈতবাদীরা সেখানে পৌঁছে আর ফেরেন না—ন নিবর্তন্তে। গীতবিতানের গানে সেখানে পৌঁছাবার বাসনা এবং সেই আশ্চর্য পড়োশী মনের মানুষের সঙ্গে মিলনবিরহের মাথুর পদাবলির সুর শোনা যায়।

তবে তা শুনতে হলে আধ্যাত্মিকতার হাত ধরে এগোতে হবে। এবং গীতবিতানেই

পাঠক/শ্রোতা সে সুর শুনতে পাবেন।

আর একটি গান

'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না (পূজা ৫১)

'লক্ষ যোজন ফাঁক' (লালন) দূর করার জন্যেই পরস্পরের অভিসার। কার অভিসারে কে আসেন! এ গানটিতে, মনে হয়, ঈশ্বর আসছেন অভিসারে। এমন অভিসার সূফীসন্তদের গানে আছে, পদাবলীতেও আছে।

আসলে তিনি আসেন না, আসতে পারেন না, আসার প্রয়োজনও নেই। এই 'আসা' কথাটিই আপেক্ষিক। অন্যদিক থেকে দেখলে বলতে হয়—তিনি তো এসেই আছেন। তিনি সর্বত্র, omnipresent! সবই নির্ভর করছে ব্যক্তির বোধের ওপরে। আমাদের বোধটিই যদি পূর্ণতা না পায় তাহলে তিনি তো দূরেই। আমি ও তিনি—এ উভয়ের সন্নিধির জন্যে 'আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে, তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে' (পূজা-১২)। যতক্ষণ সুর মেলে না, ততক্ষণই দূরত্ব, ততক্ষণই 'অভিসার'-এর কথা আসে। যখন সুরে সুর মিলে যায় তখন 'তুমি যে এসেছ মোর ভবনে...। আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া। এলে তোমার সুর মেলিয়া। এলে আমার জীবনে।' (পূজা-৭৬)। 'তোমায় আমায় মিলন হলে সকলই যায় খুলে,/বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।' (পূজা-৬৫)।

শ্রেষ্ঠ সংগীতগুলি গড়ে উঠেছে এক জগদ্ব্যাপ্ত বিরহকে কেন্দ্র করে। না পাওয়ার বেদনা, সুদূরের জন্য চঞ্চলতা, 'যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে', (পূজা-৮৯) তাকে পাবার পিপাসা, এমনতর নানান আকুলতা নিয়ে বিরহী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। এই বিরহেই মীরাবাঈ-এর গান, এই বিরহেই সন্তসূফীদের গৃহত্যাগ, এই বিরহেই পদাবলীর গান। সুদূর কোন্ নদীর পার, গহন বন, গভীর অন্ধকার (বর্ষা ৯৫), ছায়াতরুবিহীন মরুভূমি (পূজা-৫১) পার হলে তবেই সুরে সুর মেলে। রবীন্দ্রনাথের যে সব গানে ঈশ্বরের আগমনের কথা আছে,—সে সব ক্ষেত্রে ঈশ্বরই আসছেন, অথবা বিরহী ভক্তের বিধুর আত্মস্বরূপই অভিসারে যাচ্ছে—তা বলা মুশকিল। এটা আপেক্ষিক। আসলে ঘটছে ভক্তের মনোভূমিতেই। গানের প্রবক্তা বা বাদীস্বরূপ তার মনের মধ্যেই আগন্তুকের 'চরণধ্বনি,' 'পায়ের ধ্বনি,' শুনছেন। বৈষ্ণব কবিতায় আছে 'হরি রহ মানসসুরধুনী পার।' অর্থাৎ এ সুরধুনী অন্তরগত—এর দূরত্ব ভৌগোলিক পরিমাপে বোঝা যায় না। মিলন হলে এ মানস কুঞ্জেই হয়। গীতবিতানের গানের ভিত্তিতেই বলা যায় ভক্তের অভিসার বা ভগবানের অভিসার উভয়ই ঘটছে এই মানসকুঞ্জেই। যে সব গানে ঈশ্বরের আগমন বা অভিসারের কথা আছে তাদের অভিমুখ ভক্তের হৃদয়মন্দির। সেখানেই তাঁর পদসঞ্চার— আরশীনগরে।

সেই 'হৃদিমন্দির দ্বারে
বাজে সুমঙ্গাল শঙ্খ॥
শত মঙ্গাল শিখা করে ভবন আলো,
উঠে নির্মল ফুল গন্ধ॥' (পূজা-৩০৬)

এই হৃদিমন্দিরদ্বারে পৌঁছানো দুরূহ। হিতৈষীরা বলবে—"কৈসে করবি অভিসার? মন্দির বাহির কঠিন কপাট"। "চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।" তার পরে আছে কুলমর্যাদার কপাট। এ সবই অবশ্য বাইরের বাধা। এর চেয়েও দুস্তর বাধা আপন অহং-এর বাধা। এসব বাধা পার হতে পারলে পৌঁছানো যায় সেখানে। 'যেতে যেতে একলা পথে' ও 'তিমিরময় নিবিড় নিশা'—এ গান দুটিতে-এ অভিসারে যাত্রার কথা আছে — আছে নূতন পথের বার্তাও।

পূজা-৫১ সংখ্যক 'কেন চোখের জলে' গানটির সঞ্চারী—

'আলসেতে বসেছিলেম আমি আপন ঘরের ছায়ে,
জানি নাই যে তোমায় কত ব্যথা বাজবে পায়ে পায়ে।'

এবং আভোগ-'ওই বেদনা আমার বুকে বেজেছিল গোপন দুখে—
দাগ দিয়েছে মর্মে আমার গো গভীর হৃদয়ক্ষত।'

প্রকৃতপক্ষে এই 'বেদনা আমার বুকে,' 'মর্মে আমার' শব্দগুচ্ছেই অভিসার কুঞ্জের সংকেত আছে।

গীতবিতানের অন্যান্য গানেও এই কুঞ্জের খবর পাওয়া যাবে। সেই কুঞ্জই 'আরশী নগর।' এখানেই সীমার মধ্যেই 'অসীমের সহিত মিলন সাধন।' দুই পাখি—দ্বা সুপর্ণা।

এই মিলনই St. John-বর্ণিত Divine Union। এই মিলনকুঞ্জে পৌঁছতে হলে Dark Night অতিক্রম করতে হয়। সেখানে আছে উপনিষদের পাখির গল্প। সে সব খবর গীতবিতানেই আছে। তার জন্য প্রয়োজন গীতবিতানের সনিষ্ঠ অধ্যায়ন।

গীতাপাঠের ফলশ্রুতি বা পাঠসিদ্ধির জন্য নির্দেশ দেওয়া আছে—

'গীতা সুগীতা কর্তব্যা
কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।'

(গীতা সুষ্ঠুভাবে পঠিত হওয়া উচিত—তাহলে আর অন্যান্য শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন হবে না)।

গীতবিতান—অর্থাৎ রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও বলতে পারি—একালের গীতা এই গীতবিতানের সুষ্ঠু গায়ন (ও শ্রবণ-পঠন) প্রয়োজন। কেবল গায়ক নন, শ্রোতাও তো মনে মনে গাইতে গাইতেই, গায়ককে অনুসরণ করতে করতেই গানকে অনুধাবন করেন, —তাই শ্রোতা/পাঠক সকলেই গানের কথা ও সুর উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন আশা করি। তবেই গীতবিতান একালের গীতার মর্যাদা পাবে। পাঠকও পাবেন আরশীনগরের ঠিকানা।

(৩)

'আমি যে খুঁজে বেড়াই
সে তো আমার ছিন্ন জীবনের
সবচেয়ে গোপন কথা;
ও কথা হঠাৎ আপনি ধরা পড়ে

যার আপন বেদনায়,
আমি জানি,
আমার গোপন মিল আছে তারি ভিতর ?'

'শেষ সপ্তক'-এর ৩০ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে বিশ্বকবির অসীম ছড়াটার থেকে একটি পদ ছড়িয়ে পড়েছে কোথাও। তার পর থেকে চলছে পদটির জুড়িটির সন্ধানে খুঁজে বেড়ানো— সর্বত্র, মৌমাছির মতো।

রবীন্দ্রসাহিত্যে এমন একটি ভাব প্রকাশ পেয়েছে যে মানুষ মূলত একই উৎস থেকে এসেছে। ফলে, পরস্পরের মধ্যে একটা সংযোগসম্পর্ক আছে নিশ্চয়ই. তবে মানুষ হারিয়ে ফেলেছে তার সেই গ্রন্থনসূত্রটি। আর তারই কারণে সে এক হৃদয়ভরা অনাদিকালের বিরহবেদনায় পীড়িত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাস-কথিত 'জননান্তর সৌহৃদানি'-র কথা আলোচনা করেছেন, বিদ্যাপতির 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া'-র কথাও আলোচনা করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথের গানগুলিতে তো এই বিরহবোধ সর্বত্রই ধ্বনিত হয়েছে।

এই বিরহবোধ তাঁর সাহিত্যে এমনভাবে ছেয়ে আছে যে রক্তমাংসের মানুষ-মানুষীর প্রেমবিরহের গান আর আধ্যাত্মিক বিরহের গান সমার্থক বলে মনে হয় পাঠকের কাছে।

অনেক পাঠক এই আধ্যাত্মিকতার কথা শুনলেই মনে করেন যেন পুরোনো বস্তাপচা সমালোচনার উদ্গিরণ হচ্ছে। কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা অন্যরকম। আমার মনে হয়, অস্তিত্ব থাকলে মানুষের একটা আত্মা থাকবেই ; আর আত্মা থাকলেই আধ্যাত্মিকতাও থাকবেই। আধ্যাত্মিকতা অর্থে যাঁরা সম্প্রদায়ভিত্তিক মন্দির-মসজিদ কেন্দ্রিক (institutional) পূজা-উপাসনার কথা বোঝেন, আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের দলে না ফেলেও তাঁর গানে আধ্যাত্মিকতাকে খুঁজে পাওয়া যায়। খোঁজার দরকারও হয় না, আধ্যাত্মিকতা সেখানে স্বপ্রকাশ। আর এই আধ্যাত্মিকতাকে স্বীকার না করলে আজ/আজও রবীন্দ্রসংগীত এত জনপ্রিয় কেন— তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

আমার অনেক বয়স্ক বন্ধু আছেন— যাঁরা নাস্তিক বা অজ্ঞেয়িক (agnostic), অন্তত আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বর সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনায় তাঁরা কিছুমাত্র আগ্রহী নন। তবু তাঁরা রবীন্দ্রনাথের পূজার গানে আকৃষ্ট। এর কারণ কী ? শুধু কি গানের সুরই তাঁদের আকৃষ্ট করে ? তা-ও নয়। কারণ তাঁরা কাব্য বাদ দিয়ে গান শোনেন না। আসলে ঈশ্বর-প্রেম সম্পর্কিত যে আবেগ-অনুভব গীতবিতানের পূজার গানে প্রকাশিত হয়েছে, তা যে মানুষী-প্রেমেরই রূপান্তর, রবীন্দ্রনাথ যে ঈশ্বরকে 'পিতামাতাভ্রাতা সব পরিবার'-এর মধ্যেই দেখেছেন—সেই ঈশ্বর-প্রেম বা ঈশ্বর-বিরহের বেদনা তো সবার মনেই সঞ্চারিত হয়— এই 'যারে বলে ভালোবাসা-তারে বলে পূজা'-সদৃশ ভাবনা আস্তিক-নাস্তিক সকলকেই সংক্রামিত করে। মানবজীবনকে বাদ দিয়ে মানবাত্মার অস্তিত্ব নেই। রবীন্দ্রসংগীতে সেই আধ্যাত্মিকতা যে মানবজীবনের অভ্যন্তর থেকেই বিকশিত হয়ে উঠেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের 'পূজা'-র গানে সকলেই আকৃষ্ট হন।

(৪)

পাঠকের অপ্রস্তুত চিন্তায় এই বিরহের দু প্রান্তে যে দু জনের কথা সহজেই মনে আসতে পারে তারা হল— হয় মানব-মানবী, নয় তো ঈশ্বর ও ভক্ত। সাধারণ কবিদের রচনায় যাইহোক, রবীন্দ্রনাথের রচনায় কিন্তু ঈশ্বরপ্রেম আর মানবপ্রেম— দুটি আলাদা বস্তু নয়। যদিও গীতবিতানে পূজা, প্রেম, প্রকৃতি প্রভৃতি স্বতন্ত্র পর্যায়ভুক্ত হয়েছে, পাঠকের পরিণত চিন্তায় কিন্তু এ সত্য অনাবিষ্কৃত থাকে না যে রবীন্দ্রসংগীতে 'পূজা' ও 'প্রেম'-এর গানের উদ্দিষ্ট নায়ক বা নায়িকা মানুষও হতে পারে, বিকল্পে আবার হতে পারেন ঈশ্বরও। তাই মনে হয় গীতবিতানের পূজা, প্রেম, প্রকৃতি প্রভৃতি পর্যায়-বিভাগ খুব জরুরি নয়।

এই যে দুই-এর বিরহ—এই দুই কি কুহু ও কেকা-র মতো, এপার ও ওপারের মতো স্থানগত বা কালগত দূরত্ব? রবীন্দ্রনাথ কল্পিত ওই ছড়াটির (শেষ সপ্তক-৩০) একটি পদ হারিয়ে গেছে। তারপর যে শুরু হল অন্য পদটির সন্ধান— সেই যোটক-অন্বেষণে বিরহীকে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে স্থানগত বা কালগত দূরত্বের অন্তহীনতায়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই 'হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিন রাতিয়া'— পঙক্তিটি ব্যাখ্যাকালে আরও গভীরে গিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। 'শান্তিনিকেতনে'র 'শ্রাবণসন্ধ্যা' প্রবন্ধের শেষ দিকে তিনি বলেছেন—"আজ কেবলি মনে হচ্ছে এই—যে বর্ষা, এ তো একসন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যতদূর চেয়ে দেখি, আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহ-সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার...।' এ কি কালগত দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিত মনে করাচ্ছেন কবি? "এই জীবনব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি, এবং তারই মাঝখানে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণ সুরের বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিন রাতিয়া।"

(৫)

গোবিন্দদাসের একটি পদে আছে—

সুন্দরি কৈসে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনি পার॥

এই 'মানস-সুরধুনি' শব্দটির একটি ব্যাখ্যা = মথুরার মানসগঙ্গা। আর একটি অর্থ হতে পারে— মানস = মন। হরি মনের গহন অগম পারে রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাখ্যারই পক্ষপাতী ছিলেন।

আপাত মনে হতে পারে ওই 'হরি' বোধ হয় বাইরের জগতের কেউ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো সেভাবে দেখতে চান না। তিনি যখন বলেন— "...এই বিরহ একেবারে শূন্য নয়— ...যা যখনি প্রাণকে ব্যথায় কাঁদিয়ে তুলছে তখনি সেই বিদীর্ণ ব্যথার ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আসছে।" (শ্রাবণ সন্ধ্যা) রবীন্দ্রনাথ যখন জানেন— 'বিরহ মিলনেরই অঙ্গ' তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না— যার

জন্য বিরহ তিনি অলীক শূন্য নন ; তিনি আছেন, অনুভবের অন্তরেই আছেন। এখানেই 'মানস-সুরধুনী' কথাটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি মিলে যায়। বিরহ যার, মিলনও তার।

'আমার প্রাণের মানুষ', 'আমি কান পেতে রই', 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই, 'আছ অন্তরে চিরদিন', প্রভৃতি গানে এ কথাটি আছে।

উপনিষদে 'দ্বা সুপর্ণা' শ্লোকে বর্ণিত পাখি এবং লালন ফকিরের 'অচিন পাখি' প্রভৃতির ভাবও রবীন্দ্রনাথের এসব গানে পাওয়া যায়। যেমন—

'তার আসা যাওয়ার গোপন পথে

সে আসবে যাবে আপন মতে।'

লালনের (পূজা-৫৪৮) কেমনে আসে যায়'—এর সমধর্মী।

বলেছি যে বিরহের দুপ্রান্তে দুজন ; তাতে স্থানগত ও কালগত উভয় ধরনের দূরত্বই মনে হতে পারে। আবার রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন— 'চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ আছে— তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি ; তবু সে আছে, সে আছে, বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে—" (শ্রাবণ সন্ধ্যা) তখন কোনো দূরত্ব, কোনো দ্বৈতের বোধ থাকে না।

(৬)

রবীন্দ্রকাব্যের 'দুই আমি'-র কথা আমরা জানি। একজন করে, আর একজন করায়। অহং প্রধান হয়ে কর্তাহমিতি মন্যতে। রবীন্দ্রনাথও ভেবেছিলেন— তাঁর কবিতা তিনি নিজেই লিখেছেন কিন্তু পরে বুঝেছিলেন— অন্য কেউ তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। এই অন্য কেউ বাস্তবিক 'অন্য' নয়, কবির নিজেরই অন্তরবাসী মনের মানুষ। 'আত্মপরিচয়'-এ সে কথা বলেছেন, বলেছেন তাঁর কবিতায়ও। —

"এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালো মন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবন-দেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্ব ধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি, সেইজন্য এত বড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগতকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে

তোমারেই ভালোবেসেছি ;

জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে

শুধু তুমি আমি এসেছি।
চেয়ে চারিদিক পানে—
তোমার আমার অসীম মিলন
যেন গো সকলখানে।"

এই পঙ্‌ক্তিগুলি পড়লে কি মনে হয় না যে পূজার গানের উদ্দিষ্ট কবির জীবন-বহির্ভূত কেউ নয়, তিনিই স্বয়ং ? আবার 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতাটি পড়ে কি কেউ সে সঙ্গিনীকে কবির জীবনদেবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাববেন ?

আবার দেখুন, রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়' বা ওইসব কবিতা পড়ার পরে কি 'আকাশভরা সূর্যতারা' বা 'মহাবিশ্বে মহাকাশে' প্রভৃতি গানের পর্যায়বিভাগ নিরর্থক মনে হয় না ?

'তৃণরোমাঞ্চ ধরণীর পাশে
আশ্বিনে নব-আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।' —আর
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।'

এদের মধ্যে পূজা-প্রেম—প্রকৃতিগত পার্থক্য কোথাও নেই। 'মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে' আর 'তুমি রবে নীরবে' —এদের মধ্যে পর্যায়গত পার্থক্য অনুসন্ধান নিরর্থক।

(৭)

বৈষ্ণবসাধনার রস পরিকল্পনাটি বড়ো সুন্দর এবং বাস্তবধর্মীও। মানবসম্পর্কের বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করেই বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রস বিভাজন করা হয়েছে বৈষ্ণব রসতত্ত্বে। বাস্তব সম্পর্কের ভোগী পাখিকে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের মধুর রসে মুক্তির আকাশে তোলার সাধনা আছে বৈষ্ণব ধর্মে। পরম প্রিয় কৃষ্ণ তাই জননীর সন্তান, বন্ধুর বন্ধু, প্রেমিকের প্রেমিক। বাস্তব জীবনে মানুষ যে সব আবেগকে অভিজ্ঞতায় পায়, আধ্যাত্মিক সাধনায় সে সব আবেগই রসো বৈ সঃ।

মাঝে মাঝে মনে হয় রবীন্দ্রনাথেরই দুই সত্তা তাঁর পূজার গানের সাধ্য ও সাধক। অধ্যাপক সুকুমার সেন বলেছেন কবিসত্ত্বা ও বিশ্বসত্তা ('রবীন্দ্রনাথের গান')। গীতবিতানের পূজা-র গানের 'নাথ হে প্রেমপথে' আর প্রেম পর্যায়ের '...তুমি সাধ করে নাথ ধরা দিয়ে' এবং প্রকৃতি পর্যায়ের 'আমারে যদি জাগালে' —এদের মধ্যে কোনো পর্যায়গত সীমারেখা আমার চোখে পড়ে না।

যাঁরা তাত্ত্বিক আলোচনা ভালোবাসেন, তাঁরা কবির এই দুই সত্তাকে শ্বেতাশ্বতর বা

মুণ্ডক উপনিষদের 'দ্বা সুপর্ণা...' শ্লোকটির সঙ্গে মেলাতে পারেন। অথবা মেলাতে পারেন লালন ফকিরের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়... 'বা' 'বদ হাওয়া লেগে খাঁচায় পাখি কখন উড়িয়া যায়...' এর সঙ্গে।

উপনিষদের শ্লোকটি এরকম—

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্ব জাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যশ্নন্নন্যোহভি চাকশীতি। উপনিষদের দুই পাখি একত্রে বাস করে, আলিঙ্গানাবন্ধ। তারই মধ্যে একজন কিছুটা ভোগ সম্ভোগ করে, অন্যটি কেবল উদাসীনভাবে দেখে। লালনের পাখিটি বাইরে থেকে এসে দেহখাঁচায় বাসা বাঁধে, তবে বড়োই অস্থির, একটু বদ হাওয়া লাগলেই পালিয়ে যায়। উপনিষদের দুটি পাখি— একটি যদি জীবাত্মা, অপরটি পরমাত্মা, একই দেহ-বৃক্ষেই আছে। লালনের পাখি একটি— সে পরমাত্মা।

যাই হোক, এই দুই-আমির পারস্পরিক ভেদাভেদ সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে গানে কবিতায় আলোচিত হয়েছে। 'জীবন স্মৃতি'তে আছে ('প্রকৃতির প্রতিশোধ' অধ্যায়ে)—

'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা' বাক্যাংশটি।

'সীমার মধ্যেই' কথাটি রবীন্দ্রনাথকে অন্যান্য সাধকদের থেকে পৃথক করে দিয়েছে। উপনিষদের পাখি দুটিকে সীমা ও অসীম মনে করা যায়—এরা দুজনে 'সযুজা' অর্থাৎ একসঙ্গে আলিঙ্গানে আবন্ধ। তখন ধরে নেওয়ায় অসুবিধে থাকে না যে—'অসংখ্য বন্ধন মাঝে' মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করা রবীন্দ্রনাথের কেবল সাহিত্যধর্মই নয়, জীবনধর্মও। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনার পটভূমিতে আছে অসীম সমুদ্র ও সসীম ভূমির মিলনস্থল— কারোয়ার। রবীন্দ্রনাথের দুই আমিও অসীম ও সসীমের মিলনশয্যা রচনা করেছে তাঁর গীতবিতানের গানগুলি জুড়ে। এই দুই আমির সংগতির ভারসাম্যে টান পড়লেই জেগে উঠেছে বিরহবেদনা।

'হে মোর দেবতা' গানটি রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তা ও বিশ্ব-সত্তার মিলনের (এবং উপনিষদের পাখিদেরও সহাবস্থানের) একটি সুন্দর উদাহরণ। 'কে গো অন্তরতর সে' গানটিও তাই। বিশ্বসত্তার কোনো ইন্দ্রিয় নেই। ফলে তার বিবর্তিত রূপের অর্থাৎ সৃষ্টির দৃশ্যানন্দ, শ্রুতি-আনন্দ উপভোগের জন্য তাঁকে 'এ দেহপ্রাণ'-কে অবলম্বন করতে হয়। কবি যেমন করে তাঁর কবিতা পাঠ করে আনন্দ পান, বিশ্বস্রষ্টা আদিকবিও তেমনি তাঁর সৃষ্টির আনন্দাস্বাদান পেতে চান মানবের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। লালনের পাখি বারবার পালিয়ে যায় খাঁচা ভেঙে—রবীন্দ্রনাথের গানে তেমন নয়। এক্ষেত্রে উপনিষদের পাখির মতো 'সযুজা' থেকেও স্রষ্টা ওই আনন্দাস্বাদন পান। কৃষ্ণ যেমন শ্রীরাধার 'প্রণয় মহিমা' আস্বাদন করার জন্যে চৈতন্যদেবের দেহকে আশ্রয় করেছিলেন— এও তেমনি। 'হে মোর দেবতা' গানটি অপূর্ব।—

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে প্রাণ॥...

'কে গো অন্তরতর' গানটিতে বিশ্বসত্তা কবিসত্তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ে মায়াঞ্জন লাগিয়ে

দিয়ে 'আমার চেতনা আমার বেদনা'কে রসায়িত করেছেন ও 'সোনালি রুপালি সবুজে সুনীলে' ছড়িয়ে দিয়েছেন মায়া এবং সযুজা থেকে করলেন তা উপভোগ।

'দুই আমি' বা দুই সত্তা যখন মিলনে আবন্ধ থাকে তখন যেন সীমার সঙ্গে অসীম বা ভূমা-র ঘনিষ্ঠতা। 'তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে/বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।' —এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে আরও কয়েকটি গানে। 'গায়ে আমার পুলক লাগে' এমন আর একটি গান। অসীম যখন হৃদয়ে 'রাঙা রাখি-র ডোর' বেঁধেছে, তখন 'আনন্দ আজ কিসের ছলে, কাঁদিতে চায় নয়ন জলে/বিরহ আজ মধুর হয়ে করেছে প্রাণভোর।' 'আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো' গানটিও এরূপ। চণ্ডীদাসের 'পুলকে আকুল দিক নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি' ('কাহারে কহিব'...)—ওই একই অনুভবের প্রকাশ।

'আজিকে এই সকালবেলাতে' গানটিকেও আমি এই পর্যায়েই রাখতে চাই। —'নীলিমা এই নিলীন হল আমার চেতনায়/সোনার আভা জড়িয়ে গেল মনের কামনায়।' —যদিও এখানে দুই পাখি একেবারে সযুজা হয়ে নেই—একটা আপাত দূরত্ব আছে—'লোকান্তরের ওপার হতে কে উদাসী বায়ুর স্রোতে/ভেসে বেড়ায় দিগন্তে এই মেঘের ভেলাতে।' —শেষ পঙ্‌ক্তি দুটিতে লালনের পাখির সঙ্গে কিছু মিল আছে—তথাপি কিছুটা ভাবসম্মিলনের অদ্বৈত-তা-ও রয়েছে। আর সেই সূত্রেই 'হরি রহ মানস সুরধুনী পার'—পঙ্‌ক্তিটিও মনে পড়ে। মনে হয় এই দূরত্ব কি স্থানিক না মানসিক?

দুই সত্তা যখন বিরহে থাকে? তখন দেখা দেয় মিলনের আকুলতা, এবং এই অবস্থাটাই তো বড়ো ব্যাপক। এই বিরহের বেদনাতেই তো সমস্ত বৈষ্ণবপদাবলীর অশ্রুজল। এই বিরহের বেদনাতেই তো Mystic সাধকদের সেই অবস্থা আসে, যাকে বলা হয় Dark night of the Soul। St. John প্রভৃতির কবিতায় এই Dark night-এর অসহায় বেদনার কথা এসেছে। রবীন্দ্রনাথের গানে নিঃসন্দেহে মরমী সাধনার প্রভাব আছে—প্রত্যক্ষেই হোক আর পরোক্ষেই হোক।

Mystic-দের এই 'অন্ধকার' রাত্রির কথা এঁদের কবিতায় আছে। জালালুদ্দিন রুমি-র মস্‌নবী-তে আছে। তবে রুমি একে নেতিবাচক কিছু মনে করেননি। সাধনায় আসে ক্লান্তি, আসে নৈরাশ্য। যাঁর আহ্বানে ঘর ছেড়ে আসা—তার দেখা না পেলে নৈরাশ্যের অন্ধকার তো নামবেই। তবে রুমি একে বলেছেন আল্লারই এক রূপ। বলেছেন—'তাঁকে ভুলে থাকা-র অর্থ তাঁরই আঁধার কারাকক্ষে বাস করা, তাঁর বাইরে নয়।' রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানে যদিও কখনো বলেছেন—'ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার, সম্মুখে ঘন আঁধার', মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি বা 'হালভাঙা পালছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে'—তবু অধিকাংশ বিরহের গানেই আছে মিলনের আশা। তাঁর বিশ্বাস ছিল 'এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়।' অথবা 'যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে—যে নদী মরুপথে হারালো ধারা—জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।' অথবা 'আঁধার থাকুক দিকে দিকে আকাশ অন্ধ করা, তোমার পরশ থাকুক আমার হৃদয়ভরা।' অসংখ্য পঙ্‌ক্তি তাঁর গানে এই Dark night ও তার উত্তরণের কথা শুনিয়ে গেছে।

শঙ্করাচার্যের মতো বৈদান্তিকদের প্রতি তাঁর তেমন আকুল শ্রদ্ধার কোনো খবর জানা নেই, তবে পারস্যে হাফিজের সমাধি ফলকের সামনে কবির উচ্ছ্বাসোক্তিতে তাঁর সূফি-অনুরাগ অপ্রকাশিত থাকেনি। "মনে হল আজ, কত শত বৎসর পরে, ... এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক।"

সুফিধর্মের ভাব ও বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব উভয়ই কবিকে প্রভাবিত করেছে, কমবেশি। তবে কেউ যেন মনে না করেন যে বৈষ্ণব-বাউল-সুফি প্রভৃতির আচার অনুষ্ঠানাদিও কবিকে প্রভাবিত করেছিল। আনুষ্ঠানিকতা, গুরুবাদ প্রভৃতি তাঁর গানে নেই।

দুই সত্তার বিরহে যে মিলনাকাঙ্ক্ষা, তা তাঁর গানগুলিতে পাই। আপনার মধ্যে যখন দুই সত্তার পূর্ণমিলন ঘটেনি তখন কবি বলেছেন—

'মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন পরে
প্রিয়তম হে জাগো জাগো জাগো।'

লালনের পাখিটি কখনো কখনো খাঁচা ছেড়ে চলে যায়—রবীন্দ্রনাথের দুই সত্তার বিরহে কিন্তু তেমন হতাশার ভাবটি নেই। দু-একটি গানে কিছু নৈরাশ্য থাকলেও তা সঙ্গে সঙ্গেই আশার আলোকে কেটে গেছে। যেমন 'যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিবে যায় বারে বারে/ আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে' প্রথম পঙ্‌ক্তির এ হতাশা উবে গেছে শেষ পঙ্‌ক্তির স্পর্শে—'কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া ভাঙা মন্দির দ্বারে।' যখন বলেছেন —'পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু'—সেটা তো ক্লান্তিজনিত, তবে তার জন্যে ক্ষমা চেয়েছেন। সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত আঁধারের মধ্যে উদ্দিষ্টকে বলেছেন— 'বজ্র এসো হে বক্ষ চিরে, তুমিই আমার বন্ধু।' কিংবা 'দুখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে/যেখানে ব্যথা তোমারে সেটা নিবিড় করে ধরিব হে।'

বৈষ্ণবশাস্ত্রে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা'-কে বলা হয়েছে প্রেম, আর আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা'-কে বলা হয়েছে কাম। রবীন্দ্রনাথের 'পূজা' পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের কিছু প্রভাব রয়েছে। মানবচিত্তের বৃত্তির আধারে ভক্ত ভগবানের সম্পর্ককে দাঁড় করানো হয়েছে। সেখানে পিতা-মাতা বন্ধু-প্রিয় প্রভৃতিকে ঘিরে আমাদের যে সম্পর্ক ও আবেগ—ঈশ্বরকে তারই সাহায্যে পূজা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানের 'প্রেম' পর্যায়ের গানগুলিতে যদিও মানব-মানবীর প্রেমই চিত্রিত হয়েছে তবু মনে হয় বৈষ্ণবীয় 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা'র ভাবটি এ গানগুলির অন্তরেও রয়েছে। 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি' বললে হয়তো একটু বেশিই বলা হয়ে যায়, —বলা উচিত, পাবার চেয়ে দেবার ইচ্ছাই এসব গানে প্রধান। কবি আপন সুখ কামনা না করে প্রিয়ের সুখের কথাই ভেবেছেন। 'মায়ার খেলা'র 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না', 'আমার পরাণ যাহা চায়' প্রভৃতি থেকে শুরু করে শেষজীবনের 'মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন', 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম, তব অকৃপণ করে'—এসব বহু পরিচিত গানগুলিতে দেখি কাম বা ভোগ বাসনা নেই; নিজেকে

অর্পণ করাই বড়ো কথা। প্রেমের সাধনা যে শকুন্তলা-র মতো দুঃখেরই সাধনা—একথাই প্রধান করে বলা হয়েছে এসব গানে।

(৮)

লালনের পাখি যেখানেই যাক, সে ফিরে ফিরে আসে রবীন্দ্রনাথের গানে। সে আসে ঝড়ের রাতের অভিসারে ; সুদূর নদী, গহন বনের গভীর অন্ধকার পার হয়েও তাকে আসতে হয় মর্ত্যবাসী মানুষের দ্বারে—তাকে দেয় স্বর্গের প্রেম মহিমা।

রবীন্দ্রনাথের ধারণায় বিরহ সর্বব্যাপ্ত। 'শেষ সপ্তক'-এর ওই কবিতা (৩০)টির প্রেমিকের খুঁজে বেড়ানোর অবসান হতে পারে 'এই যে কালো মাটির বাসা' গানটিতে।
—'বিরহী তোর সেইখানে যে একলা বসে থাকে—
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে নামটি তোমার ডাকে।'

পুনশ্চ

লালন ফকিরের গানটি এ রকম—
খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ক্যামনে (অথবা কখ্‌নে) আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়॥ (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

লালনের খাঁচাটি 'কাঁচা বাঁশের।'—
'কোন্‌দিন খাঁচা পড়বে খসে লালন কেঁদে কয়।'

লালনের পাখিটি অধরা। কখন আসে, কখন যায়, কী তার মতিগতি— বোঝা দুঃসাধ্য। —
'কপালের ফের, নইলে কি আর
পাখিটির এমন ব্যবহার।
খাঁচা ভেঙে পাখি আমার কোন বনে পালায়।'

উপনিষদের পাখি দুটি ভেতরেই আছে। যা আছে ভাণ্ডে, তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।

লালনের অন্য গানেও দেহস্থিত অধরার কথা বলা হয়েছে।
(ক) কথা কয় কাছে দেখা যায় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে
খুঁজলে জনম-ভোর মেলে না॥
(খ) আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার পাড়ার ভিতর আরশী নগর—
সেথা এক পড়োশী বসত করে॥
... সে আর লালন একসাথে রয়—
তবু লক্ষযোজন দূরে রে॥

উপনিষদে আছে—দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ। (মুণ্ডক, ৩/১/৭) উপনিষদ আর লোকায়ত গানের ভাব— উভয়ই আছে গীতবিতানের গানে, সহজ সহাবস্থানে।

এই পাখি ও তাদের খাঁচার কথা বা তাদের বৃক্ষনীড়ের কথা বাংলার বাউল বা অন্যান্য ভক্তি মূলক গানেও শোনা গেছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-য় উল্লেখ আছে- "ঠাকুরের ইচ্ছায় 'নরেন্দ্র তানপুরা লইয়া গাইতেছেন—

'আমার প্রাণ পিঞ্জরের পাখি গাওনা রে।
ব্রহ্মকল্পতরু পরে বসে রে পাখি,...' ইত্যাদি।"

যেমন, সীমা-অসীম, রূপ-অরূপ,— তেমনি এক শব্দ-যুগল 'ধরা-অধরা'। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানে এর ব্যবহার আছে। 'ধরা' শব্দটির একটি অর্থ-পৃথিবী। 'পৃথিবী' থেকে পৃথিবীর ভাব-পার্থিবতা। ধরা-অধরা = পার্থিব-অপার্থিব। আবার অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। —'ধরা'=হাতের মুঠোয় বা করতলগত বা কাছের জিনিস- রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ'। সে অর্থে 'অধরা'= ধরাছোওয়া বা নাগালের বাইরে, ঊর্ধ্বে। যেভাবেই দেখি উপনিষদের সুপর্ণরা এই দু'এরই প্রতীক। উভয়ে মিলে সম্পূর্ণ এক। এই 'মিলন হবে কতদিনে' (লালন)— তারই প্রতীক্ষায় সব সাধনার 'খাঁচার পাখি'-রা বসে আছেন। গীতবিতানের কবি এবং গায়ক-পাঠকেরা-ও সে আশায় দিন গুনছেন।

লালন আরশীনগরে কাকে খুঁজছেন ? মনের মানুষকে ! আপন অন্তরতর অন্তর্যামীকে— যাকে আপন অন্তরেই দেখা যায়। 'যদেবেহ তদমুত্র, যদমুত্র তদন্বিহ।' (কন্ঠ-২/১/১০)।

'আরশী' কথাটিকে দুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এক-আয়না-যার মধ্যে নিজেকে দেখা যায়। লালন-রা তো 'মনের মানুষের'ই সন্ধানী। তাঁদের সেই মনের মানুষটি তো আপন মনেরই সৃষ্টি। 'হিয়ার ভিতর হৈতে'-ই তার আবির্ভাব।

'আরশী' শব্দটির জন্ম সম্ভবত সংস্কৃত 'আদর্শ' শব্দটি থেকে। 'যঃ এব এষঃ আদর্শে পুরুষঃ... (দর্পণে প্রতিফলিত এই যে পুরুষ...। -কৌষীতকি উপনিষদ-৪০ সংখ্যক শ্লোক)। আদর্শ > আদর্শিকা > আরশি বা আরশী।

দ্বিতীয় অর্থ = 'আরস =স্বর্গ বা খোদার আসন। সে ক্ষেত্রে আরসীনগর =বিধাতার বাসস্থান। 'পাড়ার ভিতর' কথাটির মানে —দেহের 'আটকুঠুরী নয় দরোজা আঁটা—

মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা,
তার উপরে সদর কোঠা
আয়না মহল তায়।' (লালন)।

বা 'নবদ্বারে পুরে দেহী...' (গীতা-কর্মযোগ ৫/১৩)। অর্থাৎ নয় দরজা-বিশিষ্ট পুরী।

ওই 'আয়নামহল' আর 'আরশী নগর' একই স্থান। সেখানে আসলে দুই পাখি—একজন পালাচ্ছে--অধরা ; আর একজন তাকে ধরে খাঁচায় বেধে 'মনোবেড়ি' পরাতে চায়।

'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে' (গীতবিতান, নাট্যগীতি-৪৬) গানটিতে খাঁচার

পাখি আর বনের পাখি—এরা কোনোদিনই মিলিত হতে পারে না। উভয়েই আপন-আপন সংস্কার বা অভ্যাসে বাঁধা। অথচ উভয়েই উভয়কে টানে।

'এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালো বাসে, তবুও কাছে নাহি পায়!....

দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে, বুঝাতে নারে আপনায়।' 'কী ছিল বিধাতার মনে।' (প্রশ্নবোধক চিহ্ন নেই) অর্থাৎ কী জানি কী ছিল বিধাতার মনে,' বিধাতা বোধ হয় দুজনের এই 'মানসসুরধুনী'-ব্যাপ্ত বিরহের কথাটা জানাবার জন্যই দুজনকে কাছাকাছি আনলেন। —কী দেখলেন? এর অনন্তের সঙ্গে তার অনন্তের বিরহ। 'লিপিকা'-র 'মেঘদূত'। এ বিরহ মিটবার নয়। বৈষ্ণবীয় দ্বৈতবাদেই এর সমাপ্তি অথবা অনন্তেই প্রসারিত। কাছাকাছি হলেও 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়' ('সখি, কী পুছসি' ... যদুনন্দন।) রাখলে-ও এ বিরহজ্বালা জুড়োয় না।

"এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালবাসে, তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে, বুঝতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা-কাতরে কহে, 'কাছে আয়।'
বনের পাখি বলে, 'না, কবে খাঁচায় বুধি দিবে দ্বার।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়, মোর শকতি নাহি উড়িবার।"
হায়রে অভাগা কুহু ও কেকা!
প্রাণে আছে টান, বলে 'শুভযোগে কবে হব দুঁহু হায়!'
দুজনেই আপন আপন 'তিথিডোরে বাঁধা।' (প্রেম-২৫০)।

তবে এসব গানের মধ্য দিয়ে যে আকুতি প্রকাশ পেয়েছে, সেই আকুতিই পারে দুঁহুকে এক করে দিতে, —যদি কবি তাকাতে পারেন আপন অন্তরের 'সুপর্ণা-র দিকে। তার ঠিকানা আছে—'অন্তরে জাগিছ' 'আছ অন্তরে', 'আমি কানপেতে রই' প্রভৃতি গানগুলিতে, তবু বলি, একটি দুটি গান ছাড়া গীতবিতানে এ দু'এর মিলন দুর্লভ। একের 'সুরে সুরে সুর মেলাতে'ই অন্যের 'বেলা যে যায়।'

'শেষ সপ্তকে'র ওই ৩০-সংখ্যক কবিতার বিরহী নায়ক-নায়িকা কি সেই 'অসীম' ছড়াটির দুটি পথচ্যুত পদ-কে একত্র মেলাতে পেরেছিল? একজন যে খুঁজে বেড়ায়, সে তো তার ছিন্ন জীবনের গোপন কথা। সে কথা যার আপন বেদনায় হঠাৎ আপনি ধরা পড়ে—সে জন কি সুলভ? 'আপন বেদনার' সংবেদন কি সার্থকতায় পৌছেছিল? ওই কবিতাটিতেই কবি জানিয়েছেন—

'...দেখা হল।
সংসারে আনাগোনার পথের পাশে
আমার প্রতীক্ষা ছিল
শুধু ওইটুকু নিয়ে।
তারপর সে চলে গেছে।'

গীতবিতানের 'প্রেম'-এর গানেও আছে, ওই পাখি-র উদাহরণে,—এর প্রতিধ্বনি—

'...জানালে না গানের ভাষায়

এনেছিলে যে প্রত্যাশা।
শাখার আগায় বসল পাখি,
ভুলে গেল বাঁধতে বাসা।
দেখা হল, হয় নি চেনা—
প্রশ্ন ছিল, শুধালে না—
আপন মনের আকাঙ্ক্ষারে
আপনি কেন করলে হেলা।' (প্রেম-১৬৩)।

'প্রেম'-পর্যায়ের 'পাখি আমার নীড়ের পাখি' গানটিতে 'নীড়ের পাখি' আকাশের আহ্বান অনুভব করে। এখানে অহৈতুকী প্রেমের দেখা পাওয়া যায়। পাওয়ার চেয়ে দেওয়াতেই তার আনন্দ। বাইরের আকাশকোণের ভোরের আলোর কানাকানির উদ্দীপনে তার পাখায় লাগে নীল গগনের পরশ। অমনি—

'গানের ভরা উঠল ভরে, চায় দিতে তাই উজাড় করে
নীরব গানের সাগরমাঝে আপন প্রাণের সকল বাণী।'

(প্রেম পর্যায়ের 'কে উঠে ডাকি' গানটিতে (বক্ষো)-নীড়ের পাখি অনির্দেশ্য বিরহবেদনায় বিধুর হযে ওঠে। কোনো কুঞ্জভবনে কেউ কি 'জাগে একাকী?' তারই অভিসারের জন্যই কি বক্ষোনীড়ের পাখি জেগে উঠেছে?

প্রেম পর্যায়ের 'ছিন্ন শিকল পায়ে' গানটিতে আছে বন্দী পাখির মুক্তির কথা। সে যাবে নির্মল শূন্যের প্রেমে। এই নির্মলশূন্য সম্ভবত উপনিষদের দ্বিতীয় সুপর্ণ (পরমাত্মা) অথবা লালনের 'অচিন পাখি।'

নটরাজ

(ক)

'নাচত ত্রিভঙ্গা য়ে নন্দনন্দন বৃন্দাবন যমুনাতট
অমিত মনমথ মদবিমর্দন মৃদুল অভিনব জলদসুন্দর অঙ্গা ॥
তন দীপত দামিনী দূরকারী মুখ সুধাকর মনহারী
কুটিল দৃষ্ট কটাক্ষ সংযুত চপল নয়নকুরঙ্গা ॥
করত হাস বিলাস ভাবন পরস্পর মুখ অধরচুম্বন
গাঢ় পরিরম্ভনাই ছিন ছিন উঠত অদ্ভুত রঙ্গা ॥
পটতাল মঞ্জির বংশী মধুর বীণ রবাব ঢক্কা
ডমফ উড়ত উপঙ্গা ছল হরী খঞ্জরী মৃদঙ্গা ॥
তক্ তক্ তক্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দ্রিমিক দিমিকট
ছং নং নং নং নং নং নং ধ্রি ধিক ধ্রি ধি কট
ঠং নং নং নং নং নং নং তত থৈ তত থৈ
ধা ধা ধা ধু ধু ধু ধু ধুঙ্গা ॥' (স্বামী হরিদাস ॥)

স্বামী হরিদাস ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাঁর গানে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনারই প্রতিচ্ছায়া ধরা পড়ে। আর গানকে বিধাতার সাধনার মাধ্যম করে নিয়েছিলেন বলে গানও উন্নত হয়েছে আধ্যাত্মিক মহিমায়। লৌকিক বিলাস-বিনোদনের তকমা ঝেড়ে ফেলে গানও 'গানাৎ পরতরং ন হি' বাক্যের সম্মান পেয়েছে।

বৈষ্ণবদের কাছে কৃষ্ণই ব্রহ্ম, বিশ্বের স্রষ্টা, বিধাতা ; কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, কৃষ্ণই বিশ্বের 'আদাবন্তে চ মধ্যে চ।' কৃষ্ণের জীবনলীলা সংস্কৃত, হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যের কবিকুলকে অনুপ্রেরিত করেছে, ফলে আমাদের সাহিত্য হয়েছে সমৃদ্ধ। দ্বৈতবাদী দর্শন অদ্বৈতবাদের সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে আমাদের দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম, জীবনচর্চা এবং সাহিত্যকে উন্নত করেছে। কৃষ্ণই পরোক্ষে-প্রত্যক্ষে তার প্রধান নায়ক।

স্বামী হরিদাস ছিলেন নির্জন সাধক, তাঁর সঙ্গীত রচিত হয়েছে আপন প্রাণের আনন্দে। গভীর অন্তরানুভব থেকে উৎসারিত হয়ে প্রণত হয়েছে পরম পুরুষের চরণে। মানুষের সব লীলাই যেন কৃষ্ণকেন্দ্রিক। হরিদাস স্বামীর গানে তাই শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলার কথাই থাকবে—এটাই স্বাভাবিক।

সৌন্দর্যলীলা বর্ণনাই এর উদ্দেশ্য। স্বভাবতই কবি ও শ্রোতা আনন্দিত। তবে এ নৃত্য নিছক দেহভঙ্গির চলচ্চিত্রই নয়, অলৌকিক এক আনন্দমূর্তিকেই তুলে ধরা হয়েছে এ গানে।

কেউ কেউ বলেন অলংকারই কাব্যের আত্মা। অলংকারই কাব্যকে ব্রহ্মাস্বাদসচিব করে তোলে। অলংকারের সুমিত প্রয়োগই কাব্যকে রসময় করে তোলে। এ গানটির উপমা রূপক প্রভৃতি অলংকার এ নৃত্যটিকে অলৌকিক করে তুলেছে। 'অমিত মনমথ', 'দীপত দামিনী' 'মুখ সুধাকর' 'নয়ন কুরঙ্গ' প্রভৃতি প্রয়োগ এ নৃত্যটিকে উন্নত মহিমা দিয়েছে। সংগীতবাদ্যের নানা প্রকরণ, নৃত্যের বোল, এ গানটিকে জীবন্ত সৌন্দর্যে ভূষিত করেছে। অলংকারের গুণে মানবনর্তকের মধ্যে অতিমানবিক মহিমা এসেছে।

গানটি ভক্তপ্রাণের সৃষ্টি— ভক্তপ্রাণের আস্বাদনের জন্যে। রসিক ভক্তরা এ গানটির মাধ্যমে নটবর শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও লীলা-দর্শনের অলৌকিক আনন্দ পেতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ এ গানটির সুরানুবাদে 'বিপুল তরঙ্গ রে' গানটি রচনা করেছেন (১৯০৭)। মূল গানটির শুধু সুরই নয়, কাব্যাংশের নৃত্যছন্দের দোলাও গানটির ভাষাকে প্রভাবিত করেছে। 'সংসার'-পতি শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যবেগে কবির 'সংসারেও' ('নৃত্যের তালে তালে') এক অন্তহীন বিশ্বনাচের দোলা লেগেছে। শুধু বহির্জগৎই নয়-কবির অন্তর্জগতও আন্দোলিত হয়েছে এ গানে। ('নটরাজ' ঋতুরঙ্গশালা'-র ভূমিকা) [১]

"বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে।
সব গগন উদবেলিয়া মগন করি অতীত অনাগত
আলোকে উজ্জ্বল জীবনে চঞ্চল এ কী আনন্দ তরঙ্গ॥
তাই দুলিছে দিনকর চন্দ্রতারা,
চমকি কম্পিছে চেতনাধারা,
আকুল চঞ্চল নাচে সংসার কুহরে হৃদয়-বিহঙ্গ॥"

এই 'চেতনাধারা' আর 'হৃদয়বিহঙ্গের কথা' আরো বিশদ হয়েছে পরবর্তী কালের 'নটরাজঋতুরঙ্গশালা'-র ভূমিকাংশের—'অন্তরে', 'অন্তরাকাশে :-প্রভৃতি শব্দবন্ধে।

'বিপুল তরঙ্গ রে' গানটি দার্শনিকতা ও কাব্যশক্তিতে মূল গানটিকে অতিক্রম করেছে। বৈষ্ণবেরা দ্বৈতবাদী। তাঁরা অদ্বৈতবাদীদের মতো ব্রহ্মে লীন হতে চান না; কৃষ্ণ বা রাধা হতে চান না। তবে তাঁরা দূর থেকে সখা-সখীদের মতো শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শনে-শ্রবণে মগ্ন হয়ে থাকতে চান সমগ্রজীবনভর, জন্মজন্মান্তর ধরে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানের মধ্যে এই বিশ্বব্যাপ্ত লীলা দর্শনের আনন্দকে প্রকাশ করেছেন। তবে হরিদাস স্বামী কেবল মুগ্ধ দৃষ্টিতে নৃত্যরস উপভোগ করেছেন দূরে থেকে, অংশীদার

(১) '.....নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।..'

—নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা।

হয়ে নয়। রবীন্দ্রনাথ আরও একটু অন্তরঙ্গ হয়ে বলেছেন— 'কুহরে হৃদয়-বিহঙ্গ।' বিশ্বনাচের দোলা কবির অন্তরকেও দুলিয়েছে। "...অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট ছন্দে যোগ".. ('নটরাজ') দিয়েছেন কবি। 'বিপুল তরঙ্গ' গানটিতে আছে বিশ্বব্যাপ্ত কালতরঙ্গের নাচ,—আকুল চঞ্চল জগৎ সংসার, অতীত অনাগত, চেতন অচেতনের পদবিক্ষেপ,—কবির হৃদয়বিহঙ্গ তার অংশীদার।

রবীন্দ্রনাথের গানে এই নৃত্য কৃষ্ণকেন্দ্রিক নয়, নটরাজ-কেন্দ্রিক। নটরাজ বলতে আমরা প্রধানত শিবমহাদেবকেই বুঝি, তবে কৃষ্ণকেও নটরাজ বা নটবর বলা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ যাঁকেই 'নটরাজ' বলুন—আসল উদ্দিষ্ট ওই বিশ্ববিধাতা!

'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'র 'নৃত্যের তালে তালে' গানটিতে বিপুল বিশ্বের অন্তর্নিহিত ছন্দোবেগের কথা বলা হয়েছে—তবে এর পূর্ববর্তী বহু গান ও কবিতাতেও আছে বিশ্বের এই বিপুলতা, দুর্দম ছন্দের দোলা, এবং তার সঙ্গে কবির আন্তরিক সহযোগের কথাও বলা হয়েছে, যদিও 'নটরাজ' পালার নৃত্যাঙ্গিক তাতে নেই। মুক্তির কথাও সেসব গানে আছে। কয়েকটি গান-কবিতাদির কথা বলি।

'বিপুল তরঙ্গ'-এর পূর্বে, ১৮৮৪-তে রচিত 'অসীম কালসাগরে' গানটিতে এই আন্তরিক বা অন্তরলোকের কথা আছে আরো বিস্তৃত ভাবে।

"অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেছে।
অমৃতভবন কোথা আছে তাহা কে জানে॥
হেরো আপন হৃদয়মাঝে ডুবিয়ে, একি শোভা!
অমৃতময় দেবতা সতত বিরাজে
এই মন্দিরে, এই সুধানিকেতনে॥"

ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি শ্লোকে (৮/১/১-দহরবিদ্যা) বলা হয়েছে—

"অথ যদিদমস্মিন ব্রহ্মপুরে দহরংপুন্ডরীকং" ইত্যাদি। অর্থাৎ

"(দেহরূপ) ব্রহ্মপুরে এই যে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ, ইহাতে এক ক্ষুদ্র আকাশ আছে। তার মধ্যে যাহা আছে তাহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহাকেই বিশেষ রূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে।" (উপনিষদ হরফ)। কঠ উপনিষদের 'যদেবেহ তদমুত্র' শ্লোকেও এমন ভাব আছে। এ গানটিতেও সে কথা বলা হয়েছে— "হেরো আপন হৃদয় মাঝে।"

"বাজে বাজে রম্যবীণা" গানটি ১৯০৮ সালে লেখা হয়েছে-একটি শিখ ভজনের আদর্শে। শিখ ভজনটি আকারে খুবই ছোট।

বাঁদে বাঁদে রম্যবীণ বাঁদে
অমল কমল বিচ
উজল রজনী বিচ
নিশ আধিয়ারা বিচ
বীণ রণন সুনায়ে।
বাঁদে বাঁদে রম্যবীণা বাঁদে॥

রবীন্দ্রনাথ এর অনুবাদই শুধু করেন নি। এই সংগীতোৎসবটিকে কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়-সুখকর বীণাধ্বনিতেই আবদ্ধ না রেখে, পরবর্তী সংয়োজিত দুটি স্তবকে তিনি নৃত্যচ্ছন্দের দোলন ও রম্যবেশের রূপানন্দেরও সমাবেশ করে এক অলৌকিক বিশ্বচ্ছন্দের প্রেম সংগীতের পূর্ণতা দিয়েছেন।

'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে—
অমল-কমল-মাঝে, জ্যোৎস্নারজনীমাঝে
কাজলঘনমাঝে, নিশিআঁধারমাঝে
কুসুমসুরভিমাঝে বীণরণন শুনি যে—
প্রেমে প্রেমে বাজে।।

নাচে নাচে রম্যতালে নাচে—
তপনতারা নাচে, নদীসমুদ্র নাচে,
জন্মমরণ নাচে, যুগযুগান্ত নাচে
ভকতহৃদয় নাচে, বিশ্বছন্দে মাতিয়ে
প্রেমে প্রেমে নাচে।।

সাজে সাজে রম্যবেশে সাজে—
নীল অম্বর সাজে, উষা-সন্ধ্যা সাজে,
ধরণীধূলি সাজে, দীনদুঃখী সাজে।
প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্বশোভায় লুটায়ে
প্রেমে প্রেমে সাজে।।'

জগত ব্যাপী মহান স্রষ্টার আনন্দলীলার মাধুর্য আস্বাদন তাঁর এ গানটির বারবার উচ্চারিত 'প্রেমে প্রেমে'-তে ফুটে উঠেছে। একে যথার্থই ভাঙা গান বলা যায়। কারণ মূল গানকে কবি তার রূপের সীমা অতিক্রম করিয়েছেন। এবং ভেঙে আবার নতুন রূপে গড়েছেনও। গানের সীমাকে দূর দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

এর দ্বিতীয় স্তবকটিতে নৃত্যচ্ছন্দের কথা আছে, যাকে বিশ্বনৃত্যের ছন্দও বলা যায়। তপনতারা, নদীসমুদ্র, জন্মমরণ, যুগযুগান্ত, প্রভৃতিতে স্থান কাল এবং ভক্ত হৃদয়ের উল্লেখে পাত্র অর্থাৎ মানব হৃদয়ের উদ্বেলিত হবার কথাও আছে—যা পূর্বেকার 'বিপুল তরঙ্গ'-এর 'কুহরে হৃদয়বিহঙ্গ' এবং পরবর্তী কালের 'নটরাজঋতুরঙ্গশালা'র 'অন্তরে বাহিরে...বন্ধনমুক্তি' এবং 'বহিরাকাশে রূপলোক' আর 'অন্তরাকাশে রসলোক' প্রভৃতি শব্দবন্ধের সমরূপ।

এই বিরাট বিশ্বের নিত্যকালের উৎসবের কথা তাঁর তৎকালীন অন্যান্য গানেও আছে। কোথাও আছে অন্তর-বাহিরের মিলন, আছে অন্তরলোকে ঈশ্বরের আবির্ভাব, কোথাও আছে সংগীত বা নৃত্যানন্দের কথা। 'তাঁহারে আরতি করে', 'শক্তিরূপ হেরো ; 'শ্রান্ত কেন ওহে,' 'বাণী তব ধায়,' 'জগতে তুমি রাজা,' 'হে মহা প্রবল বলী,' তুমি ধন্য ধন্য,' 'অন্তরে জাগিছ' এবং আরো বহুগানে এ ধরনের উপলব্ধির কথা আছে।'

'মহাবিশ্বে মহাকাশে' (১৮৯৬) গানটিতে বহুপূর্বেই এক মহাবিস্ময়ের কথা বলা

হয়েছে। কী মহান অসীম দেশ, বিরাট কালের ভাবনা এ গানটিতে রয়েছে। এক অনন্ত দেশকালের মধ্যে ক্ষুদ্র বিস্মিত মানবের অস্তিত্বের বর্ণনার মধ্য দিয়ে দ্বৈতবাদী ভাবনার কথা বলা হয়েছে।

'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে॥
তুমি আছ বিশ্বনাথ অসীম রহস্যমাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমা নিলয়ে॥
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি, আমি চাহি তোমা পানে।
স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তি মগ্ন চরাচর
এক তুমি তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে॥

রবীন্দ্রনাথের ওই সময়কার কবিতা-গ্রন্থ 'প্রভাত সঙ্গীতে'র 'মহাস্বপ্নে' আছে বিশ্বনাথের ধ্যানের কথা।

'পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণকরি অনন্ত গগন
নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান স্বপন।
বিশাল জগৎ এই, প্রকাণ্ড স্বপন সেই,
হৃদয় সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিম্বের মতন।
উঠিতেছে চন্দ্রসূর্য, উঠিতেছে আলোক আঁধার,
উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতি পরিবার—
উঠিতেছে ছুটিতেছে রাত্রিদিন আকাশের তলে,....

'প্রভাত সঙ্গীতে'র 'সৃষ্টিস্থিতিলয়' কবিতাটির ভাবও এরূপ,

দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্য-পরি,
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান।

এই ধ্যানের কথা স্বামী বিবেকানন্দের কবিতায় ও গানেও আছে। যেমন, 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর/ভাসে ব্যোমে ছায়া মম এই বিশ্ব চরাচর। অস্ফুট মনঃ আকাশে/জগত সংসার ভাসে/উঠে ভাসে ডোবে পুনঃ/অহংস্রোতে নিরন্তর।'

উল্লিখিত কবিতা ও গানগুলিতে আশ্চর্য রকমের ভাবগত মিল। রবীন্দ্রনাথকে তখনো পরিণত প্রজ্ঞার কবি বলা যায় না। এসব ধারণা উপনিষদ-গীতা-রই/ভাবজাত। কঠ উপনিষদে আছে— 'ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকং,

নেমা বিদ্যুতো ভান্তি,-কুতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং,—
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' (১০১)

'তিনি যেখানে, সেখানে সূর্যের প্রকাশ নাই, বিদ্যুতের প্রকাশ নাই, এই অগ্নির প্রকাশ কোথায়? সেই জ্যোতির্ময়ের প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সমস্ত,

দীপ্যমান।' (ব্রহ্মমন্ত্র'-রবীন্দ্রনাথ)। বৃহদারণ্যকের ৩/৮/২০৭ শ্লোকে আছে 'এতস্য অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রসৌ বিধৃত ; ইত্যাদি। 'এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে চন্দ্র ও সূর্য বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, এই অক্ষরের প্রশাসনেই দ্যুলোক ও পৃথিবী বিধৃত হইয়া অবস্থিত আছে।' ইত্যাদি (হরফ প্রকাশনী)। অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার (উদ্বোধন কার্যালয়) বিশ্বরূপদর্শনের অধ্যায়ে (১১শ) যেমন আছে-'আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, আপনি অনন্ত শক্তিশালী ও অসংখ্যবাহু বিশিষ্ট...আপনি স্বীয় তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করিতেছেন।' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের মহাবিশ্ব ও তার স্রষ্টা-বিষয়ক ধারণা এ সবের আধারেই গঠিত। —গানগুলি পড়লেই বোঝা যায়।

'মহারাজ একী সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে
চরণতলে কোটী শশী সূর্য মরে লাজে।...'
'তাঁহারে আরতি করে চন্দ্রতপন, দেবমানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগত মন্দিরে।...'
'হে নিখিলভারধারণ বিশ্ববিধাতা হে বলদাতা
মহাকালরথসারথি।
তব নাম জপমালা গাঁথে রবিশশীতারা
অনন্ত দেশকাল জপে দিবারাতি।'
'তব নাম লয়ে চন্দ্রতারা অসীম শূন্যে ধাইছে—
রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে।
অসীম আকাশ নীল শতদল তোমার কিরণে সদা ঢল ঢল,
তোমার অমৃতসাগর-মাঝারে ভাসিছে অবিরামে।।' (কী-গাব আমি.......)।

লক্ষণীয় যে, এই বিরাট বিধাতা একদিকে যেমন 'জগতে তুমি রাজা'—অন্যদিকে তেমনি 'হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ।' উল্লিখিত গানগুলিতেও তা আছে।

বিশাল বিশ্বজগতের সঙ্গে আপনার সংযোগের কথা আছে 'সোনার তরী'র (১২৯৯) 'সমুদ্রের প্রতি' 'বসুন্ধরা', এবং অন্যান্য বহু কবিতায় ও প্রবন্ধে—

'...মনে হয় অন্তরের মাঝে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শেখে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে,
অজ্ঞাত ভুবনভ্রূণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে,
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; ......(সমুদ্রের প্রতি)।

বিরাট বিশ্বের সঙ্গে আন্তরিক এবং রক্তের সম্পর্কের কথা 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থেও আছে। 'ছিন্নপত্রাবলী'-র ৭০-সংখ্যক রচনায় জননী পৃথিবীর সঙ্গে একাত্মতার কথা, মধুর উপলব্ধির কথা, আছে।

পরবর্তী কালের 'আকাশভরা' গানটিতে এই ভাবের কথা বিস্মৃত ভাবে বলা হয়েছে।

...'অসীমকালের যে হিল্লোলে
জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে—
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান....
...... কান পেতেছি চোখ মেলেছি,
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।'

গতিশীল বিরাট বিশ্বের বিবর্তনের ছন্দেই ধীরে ধীরে জীবনের উন্মেষ ও পথচলা। এ ছন্দ রয়েছে জগতের সর্বত্র। কোথাও তা সহজেই দৃশ্যমান-যেমন

'...নদী চলার বেগে পাগলপারা
পথে পথে বাহির হয়ে আপনহারা।'

আবার কোথাও সে ছন্দ অতি-বিলম্বিত—

'আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু...।
আমার চলা যায় না বলা
আলোর পানে প্রাণের চলা
আকাশ বোঝে আনন্দ তার
বোঝে নিশার নীরব তারা।।'

এই অনিকেত আলোর আকর্ষণেই জীবন এগিয়ে চলেছে কোন্ অন্তিম ঠিকানাবিহীন সমুদ্রের মোহানায়।—

'জানি জানি কোন আদি কাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে..।'
'কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে..।
পুষ্প যেমন আলোর লাগি
না জেনে রাত কাটায় জাগি...।
ঝরনা যেমন বাহিরে যায়,
জানে না সে বাইরে চায়,
তেমনি করে ধেয়ে এলেম জীবনধারা বেয়ে...।'

কালতরঙ্গের পতনঅভ্যুদয়ের দোলায় জীবন এগিয়ে চলেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬/৪৫৬ শ্লোকে যে 'বহু স্যাম প্রজায়েয়'-এর কথা বলা হয়েছে সেই গতিধারাই জীবনকে বয়ে নিয়ে চলেছে। কবি বুঝতে পেরেছেন—এ গতির কোনো শেষ নেই। —'অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেছে।'

অথবা '...লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।
নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধু পারে
তবু তুমি সেই তো আমার তুমি...। ('সুখের মাঝে.....')

এই ধাবমানতার কথা গীতবিতানের গানে বহুস্থানেই আছে, যেমন, ১৯১১-র 'এমনি করে ঘুরিব'।...... (যে পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপনা হতে কুসুম উঠে ভরিয়া,
চন্দ্র ছুটে সূর্য ছুটে...)।

১৯১৩-র 'নিত্য তোমার যে ফুল'।.... (আকাশে ধায় রবি তারা ইন্দুতে
তোমার বাঁধনহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে...)

১৯১৭-র 'আকাশ হতে আকাশ-পথে হাজার স্রোতে
ঝরছে জগত ঝরণা ধারার মতো
আমার শরীর মনের অধীর ধারা বইছে অবিরত॥...'
এই নৃত্য-পাগল ব্যাকুলতা বিশ্বপরানে।...')।

'বলাকা'র (১৯১৫) ৩৬ সংখ্যক কবিতা—
'...মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে...আকাশের খুঁজিতে কিনারা।...
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে।'

কবির এ ধারণার মূলে কেউ কেউ Bergson -র Elan Vital-কে খোঁজেন।[১] তবে তার আগে উপনিষদ/গীতার দিকে তাকাতে পারি।

(ক) কঠ উপনিষদ ২/৩/৩-' ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

(খ) গীতা-১১/২৮...নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।

(নিত্য তোমার যে ফুল'—এর সঞ্চারী এর প্রায় অনুবাদ)।

(গ) এই গতির কথা বিখ্যাত 'চরৈবেতি' (ঐতরের ব্রাহ্মণ) মন্ত্রের মধ্যেও আছে।

(১) Bergson (1859) এর গ্রন্থ 'CreativeEvolution' এ সমস্ত গতির পেছনে Elan Vital এর কথা আছে—' The vital urge which makes us grow and transforms this wondering planet into a theatre of unending creation,' 'The animal takes its stand on the planet, man bestrides animality, and the whole humanity, in space and time, is one imense army galloping beside and before and behind each of us is an over whelming charge able to beat down every resistance and clear the most formidable obstacles, perhaps even death'. *(Story of philosophy.–Will Durant.)*

(খ)

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির ঈশ্বর পরবর্তীকালে রবীন্দ্রচেতনায় নটরাজ-রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই 'পূজার' গানের স্থানে 'প্রকৃতির' গানই হয়েছে বন্দনা-মন্ত্র। এবং নটরাজ-ভাবনার ফলে কবির সৃজনে তাঁর গানের অঙ্গে এসেছে নৃত্যের অলংকার। ঋতুচক্রের মধ্য দিয়েই আমরা এ জগৎকে চিনি। বিশ্বস্রষ্টার সন্তান হিসেবে প্রকৃতিই মানুষের প্রতিবেশী। অথবা মানুষ প্রকৃতিরই বিবর্তিত বিকাশ। তাই রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্যগুলিকে চেনা প্রয়োজন—এবং তার সঙ্গে নৃত্যনাট্য গুলিকেও। তবে তার আগে পূর্বসূত্র হিসেবে 'নটীর পূজা' নাটিকাটিকে জানা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের আপন সৃষ্টিতে নৃত্যাঙ্গিক প্রয়োগের মূল প্রেরণা— 'নটীর পূজা'-র শেষ দৃশ্যে শ্রীমতীর নৃত্য। 'পূজারিণী' (১৩০৬) কবিতাটিই 'নটীর পূজা' নামে নাট্যরূপ গ্রহণ করেছে। (১৩৩৩)। এ নাটকের মূল সুর রয়েছে নটী শ্রীমতী-র কণ্ঠের আত্মনিবেদনের গান—'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো'-র মধ্যে। উপাখ্যানে নটীর ভূমিকা এরকম—

ভিক্ষু উপালি এসেছেন ভিক্ষা নিতে ; — অন্য কারও কাছে নয় কেবল নটী শ্রীমতীরই কাছে। 'আজ তোমারই কাছে ভিক্ষা জানাতে এসেছি।' তিনি চাইছেন—'তোমার যা শ্রেষ্ঠ দান'— 'তোমার পূজার ফুল।' শ্রীমতী যেন পূজার ফুল, দেবতার আনন্দ। রাজবাড়িতে এসেও সে তাই থাকতে চায়, —সে উপদেবতার ভোগের মালা হতে চায় না। উপালি তাকে মন্ত্র দিয়েছেন—

'ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে
নমো ধর্মায় তারিণে
নমো সঙ্ঘায় মহত্তমায় নমঃ।

'ভগবান নিজে এসে দেখা দিয়েছেন শ্রীমতীকে, ওর অন্তরের মধ্যে।' 'আজ বসন্ত পূর্ণিমায় ভগবান বোধিসত্ত্বের জন্মোৎসব। অশোক বনে তাঁর আসনে পূজানিবেদনের ভার শ্রীমতীর উপর।'

কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! নটীর পূজার থালা ছিনিয়ে নিল অন্তঃপুররক্ষিণীরা। দেবদত্তের অনুগতেরা ভগবতী উৎপলপর্ণাকে মেরে ফেলল। তারপরে মহারাজের আদেশ এল—'তুমি নটী, তোমাকে অশোকবনে নাচতে যেতে হবে।'.......

শ্রীমতী নাচ শুরু করলো গানের সঙ্গে।—
'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমঃ।
তোমায় স্মরি হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে॥
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ সংগীতে বিরাজে॥'

শ্রীমতী গয়নাগুলো একে একে তালে তালে স্তূপের আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। 'ওই গেল কঙ্কন, ওই গেল কেয়ূর, ওই গেল হার। ...সমস্ত রাজবাটির অলংকার।' রাজকীয় অহংকার, উপদেবতার ভোগের মালা—সবই সে ত্যাগ করেছে। রাজমহিষী লোকেশ্বরী বুঝতে পারছেন—এ নাচ রাজনটীর নাচ নয়। 'এমনি করে আভরণ ফেলে দেওয়া, এই নাচের এই তো অঙ্গ।' শ্রীমতী নেচে চলেছে—

'আমি কানন হতে তুলি নি ফুল,
মেলে নি মোরে ফল,
কলস মম শূন্যসম
ভরিনি তীর্থ জল।
আমার তনুতনুতে বাঁধন হারা
হৃদয় ঢালে অধরা-ধারা
তোমার চরণে হোক তা সারা,
পূজার পুণ্য কাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভংগীতে আজ
সংগীতে বিরাজ॥

রাজকুমারী রত্নাবলী বলছে—'শ্রীমতী নটীর বেশ একে একে ফেলে দিলে। দেখছ তো মহারাণী, ভিতরে ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র। একেই কি পূজা বলে না?'

রক্ষিণীর অস্ত্রাঘাতে শ্রীমতী পড়ে গেল। মহারাণী লোকেশ্বরী শ্রীমতীর মাথা কোলে নিয়ে বললেন—'নটী, তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি।...'

রাজসভার নটিনীর নাচকে, 'উপদেবতার' ভোগের নাচকে, রবীন্দ্রনাথ এভাবেই 'দেহ ভঙ্গীর সংগীতে' রূপান্তরিত করেছেন। কী আশ্চর্য দূরদৃষ্টি! নৃত্যকে সভ্য বাঙালীর পূজার ও শিল্পের অবলম্বন করে তুলবেন যাঁরা—সেই উদয়শঙ্কর, গুরুসদয় দত্ত-রা পরে আসবেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই কি জানতেন, অলৌকিক বিশ্বভাবনার মহাবিশ্বের গ্রহতারকার নৃত্যছন্দকে তিনি তাঁর 'নৃত্যের তালে তালে' গানটিতে বা 'নটরাজঋতুরঙ্গশালা'-র ঋতুনাট্যের মধ্যে এবং পরবর্তী চিত্রাঙ্গদা-চণ্ডালিকা-শ্যামা'র মধ্য দিয়ে শিল্প রূপে প্রচলিত করবেন ভবিষ্যতে? প্রবাহিত করবেন জটার বাঁধনমুক্ত উন্মাদিনী পবিত্র জাহ্নবীর মুক্তধারাকে? 'চরম পূজার থালে' জীবনের অন্তিম অর্ঘ্য দিয়েছে শ্রীমতী তার ওই নৃত্যের মাধ্যমে— যে নৃত্যে দেহের আকুল ভঙ্গিই হয়ে উঠল শ্রীমতীর স্তবমন্ত্র। নৃত্যকে এত বড় মান রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে দিয়েছেন?

শ্রীমতীর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন — শ্রীমতী গৌরী দেবী।

তবে 'নটীর পূজা'র নৃত্যের ভূমিকা যতই মহৎ হোক—রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টা জীবনে সেটাই একমাত্র অনুপ্রেরক এবং উদ্দীপক নয়। নৃত্যোপকরণের চরম সমুন্নত উপযোগের জন্যে আরও কিছুদিন কবিকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, আরও মানসিক প্রস্তুতি, আরও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন ছিল।

(গ)

ঋতুনাট্য

প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রকাশিত হয় তার ঋতুবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এই ঋতুবৈচিত্র্যকে আস্বাদন, অনুভব ও পর্যবেক্ষণ করেছেন নানাভাবে। তাঁর উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটকাদিতে প্রকৃতির পটভূমিকা তো আছেই তা ছাড়াও প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র সজীব সত্তা হিসেবেও তিনি দেখেছেন। কালিদাস প্রভৃতি সব কবিরাই প্রকৃতিকে ঘটনার এবং চরিত্রের বিকাশের সহায়ক হিসেবে বর্ণনা করেছেন—তবে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রকৃতিকে নায়ক বা নায়িকা বা কুশীলব হিসেবেই দেখিয়েছেন তাঁর ঋতুনাট্যগুলিতে। বিসর্জন, রক্তকরবী, ফাল্গুনী, শারদোৎসব প্রভৃতি সব নাটকেই প্রকৃতির পটভূমিকা ঘটনা ও চরিত্র বিকাশে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু ঋতুনাট্যে শুধু সহায়ক নয়, বরঞ্চ স্বয়ংসম্পূর্ণ চরিত্র হিসেবেই উপস্থিত করা হয়েছে প্রকৃতিকে। মানব সেখানে ব্যাখ্যাতা মাত্র।

'নটরাজ'-এ কবি বলেছেন—'অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।' সুদূর আদিকাল থেকে বিশ্বপ্রকৃতির যে বিবর্তন তার সঙ্গে মানবের প্রাণকণাও বিবর্তিত হতে হতে চলে আসছে 'কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে'—(প্রকৃতি-বর্ষা-৫৪)।

"নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান।"

(প্রকৃতি-৮)

নৃত্য ও গীত প্রধানত এসব নাটকের অর্থাৎ ঋতুনাট্য গুলির, সংলাপ ; ভাবকে ব্যক্ত করার জন্যে এদের উপস্থিতি। মানব চরিত্রের মুখে যে গদ্যসংলাপ, তা শুধু ব্যাখ্যা করা বা গানগুলিকে একের সঙ্গে অন্যের সংযোগ করার জন্য। পুতুল নাচে আমরা যেমন পুতুলের নাচই প্রধান করে দেখি—সূত্রধারকে তেমন গুরুত্ব দেই না, এখানেও তেমনি প্রকৃতির উপাদানগুলিই প্রধান। এই নাটকগুলি বিভিন্ন ঋতুঅভিনন্দনরূপে প্রস্তুত ; তাই এতে বিভিন্ন ঋতুর কথাই বা তার মর্মবাণীকেই প্রকাশ করা হয়েছে। তাই এদের সাধারণ নাম ঋতুনাট্য। ঋতুই এখানে নাট্যবিষয় এবং ঋতুই এখানে নাটকের চরিত্র।

রবীন্দ্রনাথের এ ধরনের ঋতুনাট্যগুলির মধ্যে প্রথম—**'বসন্ত'**। 'বসন্ত' ১৩২৯ সালে রচিত এবং কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গীকৃত। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন—"বিশ্বভারতীর অর্থচিন্তা, উহার দৈনন্দিন তুচ্ছ কর্মের আবর্জনা তাঁহার সমস্ত অবসরকে গ্রাস করিতেছে। মুক্তি পান গানের সুর যখন অন্তরে নামে। সেই সুরগুলিকে এক করিয়া 'বসন্তোৎসব' রচিলেন। এটি ক্ষুদ্র নাটিকা—বলা যাইতে পারে, ইহাই তাঁহার ঋতুনাট্য রচনার সূচনা" (রবীন্দ্রজীবনী-৩)। কলকাতার ম্যাডান থিয়েটারে (Elite) এর অভিনয় হয় (১৩২৯)।

'বসন্ত'-র বিষয়বস্তু—

আম্রকুঞ্জ, বেণুবন, দখিণ হাওয়া প্রভৃতি চরিত্রেরা এ নাটকের নায়ক, নায়িকা, পাত্র, পাত্রী হয়ে বসন্তের নানা রূপ ও কার্যকলাপও অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করেছে। রাজা ও তাঁর বয়স্য বন্ধু কবির সঙ্গে কথোপকথনে নাটকের শুরু। রাজা ও কবি দর্শক ও ব্যাখ্যাতার ভূমিকা নিয়েছেন।

ঋতুরাজ বসন্ত সত্যই রাজা,—রাজৈশ্বর্যে পূর্ণ। পূর্ণ বলেই তিনি সহজেই রিক্ত হতে পারেন। তাই তিনি সন্ন্যাসীও বটে। কবি বুঝিয়ে বলেন— "আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে তার একপিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা ঝরা ফুল ; আবার যখন পালটে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী ; তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন পুরাতনের মধ্যে দিয়ে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।"

রাজসন্ন্যাসীরূপে বসন্ত আসেন স্বর্ণরথে। তাঁর কাছে প্রকৃতি সব দান করে, তাই ধরণী ধনী হয়ে ওঠে।

এর পরে ঋতুরাজের যাবার সময়। কবি ব্যাখ্যা করেন— 'পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা। বাঁধন পরা বাঁধন খোলা এও যেমন এক খেলা, তাও তেমনি এক খেলা।'

প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন— 'ঋতুরাজের গায়ের কাপড়খানার কথা স্মরণীয়। 'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই।' তাঁহার কাছে বিরহ মিলন খণ্ড নয়, জীবন সত্তার এপিঠওপিঠ মাত্র।' (রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ)।

'বসন্ত'-এ ২৩টি গান আছে।

'শেষ বর্ষণ'- এর উপস্থাপনা ১৩৩২ সালে। 'বর্ষাকে না জানলে শরৎ-কে চেনা যায় না।' শেষ বর্ষণ আসলে বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমন। বাদললক্ষ্মীই পরিবর্তিত হন শরৎশ্রীতে। যেমন একই ঋতুরাজ—শীতেও আছেন, বসন্তেও আছেন। 'বসন্ত' ঋতুনাট্যের সেই 'গায়ের কাপড়ের' এপিঠ-ওপিঠ।

নাটকের প্রথমে বলা হচ্ছে 'বোঝবার কঠিন চেষ্টা করবেন না মহারাজ, তাহলেই সহজে বুঝবেন। বর্ষাকে বুঝতে হলে ভিতরের দিকে তাকাতে হয়। গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিলে সহজেই বর্ষাকে অনুভব করা যায়।'

শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। তার মধ্যে বিরহের অন্ধকার। এমন সময় এল শ্রাবণের পূর্ণিমা। বসন্তের পূর্ণিমার সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। বসন্তপূর্ণিমা অপূর্ণ, কারণ তাতে চোখের জল নেই—আছে হাসি। শ্রাবণের পূর্ণিমা দুই-য়ে পূর্ণ—'হাসির কানায় কানায় ভরা নয়নের জল।' বর্ষায় মধুর এবং কঠোরের মিলন আছে। 'তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা।'

বর্ষায় আছে 'অন্যথা বৃত্তিঃ চেতঃ' অর্থাৎ আনমনা ভাব।—

'পরাণ আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।'

বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্তি দেখা যায়—'ঐ আসে ঐ অতি' গানটিতে। এর পরে শরতের আগমন। এবারে—

'মিলবে যুগল কালোয় আলোয়...।'

এরপরে শরৎশ্রী। শরৎশ্রী আসলে বাদল লক্ষ্মীর বেশান্তর।

এর পরে আসে সুন্দর। তবে সুন্দর বড়ো চঞ্চল। ক্ষণিকের অতিথি। ক্ষণিকের তরে আসে—কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যায়। এই তো সৃষ্টির লীলা।—

প্রমথ নাথ বিশী মন্তব্য করেছেন—'মানব জীবনের সত্যকে প্রকৃতিতে আরোপ করিয়া ছায়াচিত্রের মতো দেখানো হইয়াছে। প্রকৃতি অভিনয় করিয়া চলিয়াছে; মানব দর্শক সাজিয়া, বিবিক্ত হইয়া বসিয়া, নিজের স্বরূপকে সত্যতর ভাবে উপলব্ধি করিয়া লইতেছে।' (রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ)।

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা—১৩৩৩

'নটীর পূজা' অভিনয়ের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, এবং 'নটীর পূজা'র পর থেকেই নটরাজের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ বাড়ে। নটীর নৃত্যবেগ কবির মনকে এক গম্ভীর ভাবের গভীরতায় নিয়ে গেল। এর ফলে সৃষ্টি হল নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা। এ ঋতুনাট্যের মর্মকথা কী? নাট্যের ভূমিকাতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়। তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের এই মর্ম।" পূর্ববর্তী কবিতা ও গানে বরাবর লক্ষ করেছি বহির্জগৎ আর অন্তর্জগৎ এই দুই-কে নিয়েই তাঁর ধ্যানের বিশ্ব। ভাব ও রূপ—এক অপরের পরিপূরক। দুই-এ মিলে পূর্ণতা। বহির্বিশ্বে প্রতীয়মান জগৎ আর অন্তর্লোকে যার প্রতিফলন—দুই নিয়েই জগতের আস্বাদন।

রুদ্র মহাদেবের ধ্যান রবীন্দ্রনাথের নানা প্রবন্ধে ও গানে আছে। এই রুদ্রকে নটরাজ রূপে তিনি এবার দেখছেন। জন্ম-মৃত্যুর জীবনচক্রের মধ্যবর্তী, সৃষ্টি ও ধ্বংসের কেন্দ্রবর্তী এ দেবতাকে তিনি পূর্ণরূপেই দেখতে চান। এই পূর্ণ দেবতার সমগ্রকে কবি তাঁর সমগ্র ইন্দ্রিয়, দেহ, মন, আত্মা দিয়ে অনুভব করতে চান। সেই তো মুক্তি। মুক্তিতত্ত্বের জন্য তিনি 'তত্ত্বশিরোমণি'র কাছে যেতে চান না। মহাকালের বিপুল নাচে 'বাঁধন খোলার' সাধন কবি শিখতে চান। 'প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে নতুন প্রাণের যাত্রাপথে'—এই জীবনমৃত্যুচক্রের নিত্য আবর্তন পথেই তো বিশ্বলীলা। —এটাই মুক্তি। এই লীলায় যোগ দিলে তবেই মুক্তি পাওয়া যায়।

প্রকৃতিতে ঋতুর পরে ঋতু আসে। প্রত্যেকটি ঋতুই আবির্ভাব ও তিরোভাব দিয়ে ঘেরা। এই সব ঋতুর অন্তর্নিহিত যিনি মহাকাল তিনি সূত্রের মতোই ঋতুগুলোকে ধরে রেখেছেন। কেউই বিচ্ছিন্ন নয়। এই অন্তর্নিহিত মহাকালই বিচিত্রের মধ্যবর্তী একের মতোই, নানা ঋতুতে নানা রূপে আবির্ভূত হন। জন্মেও তিনি মৃত্যুতেও তিনি। এই জন্ম ও মৃত্যুকে নিয়েই যে জীবনধারা সেখানে অবগাহন করতে পারলেই মুক্তি পাওয়া যায়। 'প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে নতুন প্রাণের যাত্রাপথে'—এ পথেই কবি মুক্তির আনন্দ পেতে চাইছেন।

'নটরাজ, আমি তব
কবি শিষ্য...।

তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধন গ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি।'

কবি নটরাজের নাটের অঙ্গানে মুক্তি মন্ত্রে দীক্ষা নিতে চান।

'তোমার বিশ্বনাচের দোলায় দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়,—
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে...।' (নৃত্যের তালে তালে)

ঋতুলীলার নাচের মধ্যে কবি নটরাজের এই লীলারস উপলব্ধি করতে চান। ঋতুচক্রের মধ্যে তাঁর এক পদক্ষেপ, অন্য পদক্ষেপ মানবের অন্তর্লোকে। দুই ক্ষেত্রের দুই পদক্ষেপের সামঞ্জস্য বিধানেই মুক্তি।

'ধ্যাননিমগ্ন নীরব নগ্ন   নিশ্চল তব চিত্ত ;
নিঃস্ব গগনে বিশ্ব ভুবনে   নিঃশেষ সব বিত্ত।
রসহীন তরু নির্জীব মরু,
পবনে গর্জে রুদ্র ডমরু,
ওই চারিধার করে হাহাকার ধরা ভাণ্ডার রিক্ত।'

এই হল বৈশাখের তপস্যামগ্ন রূপ। কবি চাইছেন।

'এস এস এস হে বৈশাখ।
তাপসনিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।'

পৃথিবীর মুমূর্ষু-তাকে 'চরম সর্বনাশে' ডুবিয়ে দিয়ে এল 'সাধনধন'—বৈশাখী ঝড় রূপে।—

'জাগরে হতাশ আয় রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে।'

উমার তপস্যা ও মহেশ্বরের ধ্যানভঙ্গের চিত্র 'তপোভঙ্গ' কবিতাটির মতো এখানেও আছে। মহাদেবের ধ্যানে রয়েছে মাধুরীর স্বপ্ন—

'শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্রবসি তাই শোনে।
মধুরের ধ্যানাবেশে স্বপ্নমগ্ন আঁখি ;
হে রাখাল, রেণু যবে বাজাও একাকী।'
(গীতবিতানে সামান্য রূপান্তর আছে)।

পঞ্চশরের মতন কবি-রাখাল বেণু বাজান। আর উমার ধ্যানে মহেশ 'মাধুরীর সাধনা'-তে মগ্ন হন।

এই মাধুরীর রূপ আসে বর্ষার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। 'তপের তাপের বাঁধন কেটে আষাঢ় আসে 'রসের বর্ষণে।' উমার তপস্যার 'দুর্দিন'-এর অবসান—

'দুঃখ ঘুচিবে নিঃশেষে
মনোমাঝে যারে রুদ্ধনয়নে
পূজিলে ধ্যানের পুষ্প চয়নে
দেখা দিবে আজি বিশ্বে সে।'

আসে বর্ষা, আসে শ্রাবণ। তপস্যামগ্ন নীরব সন্ন্যাসীর

'কী গান ঘনালো মনে...
বাদল আঁধার মাতাল তোমার হিয়া
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে উঠে চমকিয়া।'

শ্রাবণ চলে যায়—কার আগমনের সংবাদে—

'শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে ;
পথে তারি সকল বারি দিলে ঢেলে।'

শ্রাবণ যায়, তবে নিঃশেষে নয়, শরতের মধ্যে রেখে যায় তার রেশ।

'শরৎ বলে গেঁথে দেব কালোয় আলো।
সাজবে বাদল আকাশমাঝে সোনার সাজে
কালিমা ওর মুছে ফেলে।'

শ্রাবণ চলে যায়। উমা-মহেশের মিলনে দেবসেনাপতি কুমার কার্তিকেয়-র আবির্ভাব। শরৎ যেন সেই কুমার। কালিদাসের 'মেঘদূতের' মতো 'কুমারসম্ভব'ও কবির রচনায় বারবার ঘুরে ফিরে আসে। এখানে শরতের রূপ যেন কুমারের মতো। 'আঁধারের সাথে আলোকের মহাসমরে' দেবসেনাপতি কার্তিকেয়'-র মতোই শরতের আবির্ভাব। পৌরাণিক উপকথা যেন শরতের আগমনে নতুনভাবে শোনা যাচ্ছে।

"শরৎ এনেছে অপরূপ রূপকথা
নিত্যকালের বালক বীরের মানসে।"

শরৎ তরুণ, সে পথিক। সে 'বাজায় ... পথ ভোলানো বাঁশি।'

"শরৎ ডাকে ঘরছাড়ানো ডাকা
কাজখোয়ানো সুরে।..."

শরৎ চলে যায়। কবি নটরাজকে আক্ষেপের সঙ্গে বলেন—

"তোমার যে আলোকে
অমৃত দিত চোখে
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি ?"

হেমন্তের প্রবেশে প্রথমেই কবি বলেছেন—

'তুমি ক্ষুধার্ত-জন-শরণ্য
অমৃত-অন্ন-ভোগ-ধন্য
করো অন্তর মম।'

বাংলায় হেমন্ত পাকাধানের ঋতু। ঘরে ফসল তোলার সময়। হেমন্ত তাই লক্ষ্মী। তবু হেমন্ত বড়ো সংক্ষিপ্ত। যদিও

"ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে
দিগঙ্গানার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।"

তবু হেমন্ত যেন আড়ালেই থেকে যায়—

"আপন দানের আড়ালেতে
রইলে কেন আসন পেতে—
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন করে রাখা?'

এরপরে আসে শীত। নটরাজের এও এক রূপান্তর। শীতের বেশ সন্ন্যাসীর বেশ। সে হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এসেছে। 'জীর্ণতার মোহবন্ধ ছিন্ন করে'

'সাজাবে কি ডালা গাঁথিবে কি মালা
মরণসত্রে'

'নির্দয় অতি করুণা তোমার
বন্ধু তুমি হে নির্মম—
যা কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ
দণ্ড তোমার দুর্দম।'

"উৎসবপতি মহানন্দ" সুন্দরতম বসন্ত এবারে আসবেন।

'ছিনু পথ চেয়ে বহু দুখ সয়ে,
আজ দেখি একী দৃশ্য,
শক্তি তোমার সুন্দর হয়ে
জিনিল কঠিন বিশ্ব।...
একী লীলা হে বসন্ত,
যা ছিল শ্রীহীন দীপ্তিবিহীন
করিলে প্রজ্বলন্ত।'

শুকনো পাতায় ছেয়ে যাওয়া কাননবীথি। এর মধ্যে বসন্তের আসন কোথায় হবে? বসন্ত এসে সব পূর্ণ করে দিক।

'সুর ভরা ওই ধরার বাঁশি লুটায় ভুঁয়ে
মর্মে তাহার তোমার হাসি দাও না ছুঁয়ে।
মাতবে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে...
হে অতিথি।'

বসন্ত আসে বনে বনে রঙ লাগিয়ে, সমীরণে ঢেউ জাগিয়ে; সমস্ত আকাশে বাতাসে আনন্দের দোল জাগিয়ে। বসন্তকে কবি বলেছেন—

'হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যানভরা ধন,
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্ত্যে মূর্তি ধর ভুবনমোহন
নব বরবেশে.....।'
'হে বসন্ত হে সুন্দর, হায় হায়, তোমার করুণা
ক্ষণকাল তরে।'—

বসন্তের এই ক্ষণস্থিতি—এর তাৎপর্য আছে। বসন্ত চির পলাতক।

'তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকাশৃঙ্খলে
শক্তি আছে কার?
ইচ্ছায় বন্ধন লও, সে বন্ধন ইন্দ্রজাল বলে
কর অলংকার।'

হোক না ক্ষণকাল। মাঝে মাঝে এই ধরা যদি ওই ক্ষণকালের জন্যেও বসন্তের স্পর্শ পায়, তবু সে ধন্য হবে।

'নন্দনে আনন্দ তুমি, এই মর্ত্যে, হে মর্ত্যের প্রিয়
নিত্য নাই হলে।
সুদূর মাধুর্যপানে তব স্পর্শ, অনির্বচনীয়,
দ্বার যদি খোলে,
ক্ষণে ক্ষণে সেথা আসি নিস্তব্ধ দাঁড়াবে বসুন্ধরা,
লাগিবে মন্দার রেণু শিরে তার ঊর্ধ্ব হতে ঝরা,
মাটির বিচ্ছেদ পাত্র স্বর্গের উচ্ছ্বাসরসে ভরা
রবে তার কোলে।'

বিদায়কালে কবি নটরাজকে বলছেন—

'জানি জানি তুমি আসিবে আবার, জানি....
বনপথে যবে যাবে সে-ক্ষণের
হয়তো বা কিছু রবে স্মরণের,
তুলি লব সেই তব চরণের দলিত কুসুম খানি।'

যাবার আগে বসন্ত পৃথিবীকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। দুলিয়ে দিয়ে যায়। 'এসেছে হাওয়া বাণীতে দোলদোলানো'। এই দোল সর্বত্রব্যাপী— প্রকৃতি ও মানুষ, বাহির ও অন্তর, সর্বত্র নটরাজের দুই পদক্ষেপের আঘাতের দোলা।—

'লাগিল দোল জলে স্থলে,
জাগিল দোল বনে,
সোহাগিনীর হৃদয়তলে
বিরহিণীর মনে।'

'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' পূর্ববর্তী দুটি ঋতুনাট্য থেকে একটু পৃথক। এতে রাজা, নাট্যাচার্য, সভাকবি, পারিষদ প্রভৃতি চরিত্র নেই। নাট্যসুলভ সংলাপ নেই। এখানে গদ্যভাষ্য নেই। আছে কেবল কবিতা ও গান। কবিতা ও গান পরস্পরের পরিপূরক। কবিতাগুলি আবৃত্তির জন্যে। কবিতাগুলি ভাবসূত্র— গানগুলি তাতে ফুল। এই মালার সূত্রেই ছয়ঋতু ও ঋতুর অন্তরালবর্তী নটরাজ— সবই একটি অখণ্ড কালচক্রের রূপ নিয়েছে। এবং অন্তিমত নটরাজের লীলাই এই ঋতুনাট্যের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কালচক্রের মধ্য দিয়েই তিনি বিবর্তিত হতে হতে চলেছেন— রূপ থেকে রূপান্তরে।

'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' রচনা একটি স্মরণীয় ঘটনা। প্রভাত কুমার (রবীন্দ্রজীবনী—৩)

বলেছেন "...কবির এক শ্রেণীর গান বিশেষভাবে নৃত্যাশ্রয়ী হয় ; আর নৃত্যও হয় সঙ্গীত-অপেক্ষী। এই দিক হইতে নটরাজ রচনা (১৩৩৩, ফাল্গুন) বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবে।'

নবীন ১৩৩৭।

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালায় যেমন নাট্যসুলভ পাত্র পাত্রী ও সংলাপ নেই নবীন-এও তাই। তবে নটরাজ-এ কবিতা ও গান, নবীন-এ গদ্যভাষা ও গান। নবীন-এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই যে এ সময় শ্রীমতী সাবিত্রী কৃষ্ণান-এর কণ্ঠে কয়েকটি দক্ষিণী গান ও ঠুংরী ভজন প্রভৃতি শুনে ও ভেঙে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি বিখ্যাত গান রচনা করেন ও সাবিত্রী দেবীকে দিয়ে গাওয়ান। (যেমন, 'বাসন্তী হে' 'কখন দিলে', 'তুমি কিছু দিয়ে যাও'।

শ্রাবণ গাথা ১৩৪১।

'শেষবর্ষণ' ও 'শ্রাবণগাথা'—আঙ্গিকের দিক দিয়ে একই রকম। উভয়ত্রই নাট্য সুলভ কুশীলবেরা (রাজা, কবি প্রভৃতি) গদ্য সংলাপে ভাষ্য বা গানগুলির বক্তব্য ব্যাখ্যা করছেন।

১৩৪১ এর বর্ষাকালে কোনো নতুন গান মনে না আসায় কবি পুরনো গানের সঙ্গে ভাষ্য ও সংলাপ যুক্ত করে 'শ্রাবণগাথা' উপস্থাপিত করেন। প্রভাত কুমারের মতে-- "গানের সম্ভোগ তাহার রসাস্বাদনে—এই তত্ত্বের সমর্থন'-ই এর নাটকীয় সংলাপের উদ্দেশ্য। যাইহোক, রসসম্ভোগ বিষয়ক কয়েকটি সংলাপ 'শ্রাবণগাথার' মূল্যবান সম্পদ। যেমন—'রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটি মাত্র ফুল এক দিকে—তাতেও ওজন থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটি তারা একদিকে—তাতেও ওজনের ভুল হয় না। বিরহের সরোবর হোক না অকূল। তারই মধ্যে একটি মাত্র মিলনের পথই যথেষ্ট।" অথবা রস "জোগান দিলেই যে রস ভোগ করা যায় তা নয়, নিজের অন্তরে রসরাজের দয়া থাকা চাই।"

(ঘ)

ঋতুনাট্যের পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তিম পর্বে যে সৃষ্টি আমাদের উপহার দিয়ে গেলেন— তা অতুলনীয়। নৃত্যমাধ্যমের সবচেয়ে সার্থক প্রয়োগ তাঁর নৃত্যনাট্যগুলিতে।

নৃত্যনাট্যের যুগ বলতে বোঝায় চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা—এ তিনটি নৃত্যনাট্য রচনার কাল—অর্থাৎ ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত সময়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে রবীন্দ্রসৃষ্টিতে নৃত্যের প্রবেশ সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা দরকার ; নৃত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গি সম্পর্কেও কিছু জানা দরকার। এবং দরকার 'নৃত্যের তালে তালে' গানটির বিশেষ পর্যালোচনা।

আধুনিক কালে, বিংশ শতকের প্রথম দিকেও, আমাদের নাগরিক সভ্যতায় নৃত্য ব্যাপারটি কেবল সমাজ বহির্ভূত বাইজিদেরই কলা ও পেশা বলে তাকে অনেকটা হেয় দৃষ্টিতে দেখা হত। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথই সেই ভগীরথ—যাঁর উদ্যোগে নৃত্য আজ

ভদ্রসমাজের সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ বলে পরিচিত এবং আমাদের ঘরে ঘরে নৃত্য আজ তার সমাদর খুঁজে পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই নৃত্যকেও দেখা গেল গানের সঙ্গে—'নটীর পূজা' নাটকে ; এবং নৃত্য যে পূজারও মাধ্যম হতে পারে সে কথা রবীন্দ্রনাথই আমাদের মনে করিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে নৃত্য ব্যাপারটি ধীরে ধীরে শান্তিকেতনের অনুষ্ঠানাদিতে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। শান্তিদেব ঘোষ জানাচ্ছেন— "১৯২৩-এ 'বসন্ত' অভিনয়ে দু'একটি নাচ ছিল। কিন্তু সে নাচ আজকালকার মতো কোনোরকম নৃত্যধারায় শেখানো নাচ নয়। শেষ গানটিতে গুরুদেব স্বয়ং গানের দলের সঙ্গে নাচে রঙ্গামঞ্চকে মাতিয়ে তুলেছিলেন।" (রবীন্দ্রসংগীত)। ১৯২৪-এ 'অরূপরতন' অভিনয় হল। "এই সময় থেকেই মেয়েদের মধ্যে সামান্য একটু নাচের চর্চা শুরু হয়েছিল কাথিয়াবাড় ও গুজরাতের লোকনৃত্যের আদলে। তার সঙ্গে ছিল একটুখানি ভাও বাৎলানোর নৃত্যপদ্ধতি।" (ওই)। একজন অধ্যাপকের স্ত্রী (Mrs. Vakil) গরবা নাচের প্রচলন এনেছিলেন। ১৯১৯-এ একজন মণিপুরী শিক্ষক কিছু নৃত্যশিক্ষা দেন। এর পরে 'শেষ বর্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। সে অনুষ্ঠানের সবগুলি গানেই নাচ যুক্ত হয়েছিল। 'নটরাজ' প্রভৃতি ঋতুনাট্যগুলিতেও গানের সঙ্গে নাচ যুক্ত হয়েছিল। অবশ্য এ সবের মধ্যে নৃত্যমাধ্যমের চরম উপযোগ দেখা যায়নি।

তবে 'নটীর পূজা'র (১৯২৬) শেষ দৃশ্যে নটীর আত্মনিবেদন দৃশ্যের ভাবাবেগের চরম প্রকাশের জন্যে নৃত্যকেই বেছে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'নটীর পূজার' কলকাতার অভিনয়ে শেষ দৃশ্যের শ্রীমতীর নৃত্য খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। এ ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ,—দুটি কারণে। প্রথমত— নাটকে প্রকাশ্যে নৃত্যপ্রদর্শনে ভদ্রবংশীয় মহিলার অংশগ্রহণ নাগরিক বাঙ্গালির রুচিতে একটা পরিবর্তন এনে দিল। ওই সময় রবীন্দ্রনাথ এবং পরে গুরুসদয় দত্ত ও উদয়শঙ্কর—এ তিন জনের উদ্যোগেই ভদ্রসমাজের মেয়েদের পায়ে নৃত্যকলা অলংকার হয়ে দেখা দিল। দ্বিতীয়, রবীন্দ্রনাথের নিজের মনেও একটা উৎসাহ দানা বেঁধে উঠল—নৃত্যমাধ্যমকে আরো নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রয়োগ করা যায় কি না। নৃত্য ভাবপ্রকাশের যখন এক মাধ্যম, যা প্রাচীন যুগে নানা মুদ্রার মাধ্যমে সঙ্গীত, নাটক, নৃত্যকলা ও ভাস্কর্যকে উন্নতির উচ্চশিখরে উন্নয়নে সহায়ক হয়েছিল, তাকে পুনরায় আপন সৃষ্টিতে প্রয়োগ করার ব্যাপারে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তাঁর সৃষ্টি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নৃত্যকলা যে উচ্চস্থান অধিকার করে আছে তা আজ কারও অজানা নয়। এরই চরম প্রকাশ ঘটেছে, চিত্রাঙ্গাদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা নৃত্যনাট্যে। নৃত্য যে এক মহান সাধনা তা শ্রীমতীর জীবনে দেখা গিয়েছিল এবং নটীর পূজার অভিনয় দর্শকের মনে সে ধারণার বিস্তারে সহায়ক হল। (নৃত্যনাট্য সম্পর্কে পরে আরো আলোচনা হবে।)

'নটরাজ ঋতুরঙ্গাশালায়' তিনি নটরাজের বন্দনা করলেন—

'নৃত্যের তালে তালে নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।'...

নৃত্যকে শ্রীমতী যেমন আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে,—রবীন্দ্রনাথ তেমনি তাকে গ্রহণ করলেন তাঁর মনের শিল্প ভাবনার রূপায়ণের মাধ্যম হিসেবে।

নটরাজের 'চরণ-পবন পরশে
সরস্বতীর মানস-সরসে
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে।'...

কবি তাঁর সারস্বত শিল্পসাধনার মাধ্যম হিসাবে তাই নটরাজের এই নৃত্যসাধনাকে গ্রহণ করলেন। তিনি নটরাজের শিষ্য—

'নটরাজ আমি তব
কবি শিষ্য, নাটের অঙ্গানে মুক্তিমন্ত্রলব।'

যে মহাকালের ছন্দকে 'নটরাজে' রূপ দেওয়া হয়েছে, তাকে পাওয়া যায় আর একটি গানে (১৩২৯)।

'দুই হাতে—

কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে,
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নূতন সংঘাতে।
বাজে ফুলে, বাজে কাঁটায়, আলোছায়ার জোয়ার-ভাঁটায়,
প্রাণের মাঝে ওই যে বাজে দুঃখে সুখে শঙ্কাতে॥
তালে তালে সাঁজ সকালে রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
সাদা-কালোর দ্বন্দ্বে যে ওই ছন্দে নানান রঙ জাগে।
এই তালে তোর গান বেঁধে নে—কান্নাহাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল শোন্ মরণ বাঁচন নাচন-সভার ডঙ্কাতে॥

(ঙ)

এবারে সেই 'নটরাজঋতুরঙ্গাশালা' এবং নটরাজ প্রসঙ্গে আর একটু বিস্তারে যাওয়া যাক। কালের অধীশ্বর নটরাজকে আমরা শিব, রুদ্র, মহাদেব প্রভৃতি নানা নামে এবং নানা রূপে জানি। সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে নটরাজের বিভিন্ন চরিত্রায়নও দেখা যায়। মোটামুটি দুভাবেই তাঁকে সাধারণত দর্শনে, সাহিত্যে ও সংগীতে রূপায়িত দেখা যায়—শিব ও রুদ্র। এঁরা কি একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ? মতভেদ আছে। কখনো একই দেবতা—শিবরূপে শান্ত এবং রুদ্ররূপে ভীষণ, এভাবে চিত্রিত হয়েছেন। আবার কখনো দুজনকে স্বতন্ত্ররূপেও দেখা যায়।

রুদ্র সকলকে 'রোদন' করান। তাঁকে প্রলয় বা ধ্বংসের বা লয়ের দেবতাও বলা হয়। কখনো ইনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারণ। ঈশান, মহাদেব, মহেশ্বর প্রমুখ রুদ্রেরই সমগোত্রীয়। তন্ত্রের মূল দেবতাও শিব।

যাই হোক, রুদ্রের ধ্বংসশক্তি নতুন সৃষ্টির স্বার্থেই। সুতরাং রুদ্রের কল্যাণকর শক্তিও এখানেই। 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন পাহি মাং নিত্যং'— এই মন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে গুরুত্ব পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ রুদ্রের বা মহাদেবের লৌকিক রূপটিতেও মুগ্ধ হয়েছেন। 'পাগল' প্রভৃতি প্রবন্ধে তা বোঝা যায়। তাঁর গানগুলিতে শিব (কল্যাণ ভাব) ও রুদ্র (বিনাশভাব)—একই মহাদেবতার দুই রূপ।

সাধারণত আমরা ঈশ্বরের এই রুদ্ররূপকে ভয় করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে, প্রবন্ধে—এই ভীষণকে বরণ করেছেন— আহ্বান করেছেন সৃষ্টির সূচক হিসেবে। 'অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।'...'আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ। মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক।।'

'পাগল' প্রবন্ধটিতে রম্যরচনার স্বাদুতায় এই রুদ্রকেই বরণ করা হয়েছে।

'পাগল শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। খেপা নিমাইকে আমরা খেপা বলিয়া ভক্তি করি ; আমাদের খেপা দেবতা মহেশ্বর। ...প্রতিভা খেপামি বই কি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলটপালট করিতেই আসে,...হঠাৎ আসিয়া যত কাজের লোকের কাজ নষ্ট করিয়া দিয়া যায়...।'

'ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময় তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমন খাপছাড়া।'...

'এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা কিছু অভাবনীয় তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ 'সেনট্রিফ্যুগল ;' তিনি কেবল নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন।'...

'হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।...পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্‌মুখ না হয়।..'

এই রুদ্রকে তিনি কখনো এড়িয়ে যাননি—

'দুঃখ দিয়ে জানাও রুদ্র,
ক্ষুদ্র আমি নই তো ক্ষুদ্র
ভয় দিয়েছ ভয় করিনে তারে।'... (গীতালি, ৮২নং)

(চ)

নটরাজের বহু পরিচিত মূর্তির সঙ্গে তাণ্ডবের যোগ আছে।-তাণ্ডবের নৃত্য মুদ্রায়ই নটরাজ পরিকল্পনা। সংগীতের 'তাল' শব্দটির সহজ প্রচলিত ব্যাখ্যায় বলা হয়—'তাণ্ডব' শব্দটির 'তা' আর 'লাস্য'-এর 'ল'-এই নিয়েই 'তাল'। অর্থাৎ নৃত্যের এ প্রকারটির মধ্যে দুটি ভাব আছে—একটি রুদ্র, অন্যটি ললিত। এখানে তাণ্ডবকে রুদ্রতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।'

তবে ভারতের প্রাচীন সংগীত-শাস্ত্রকারদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে মুনি 'তন্ডু' তান্ডবের স্রষ্টা। তৎকালীন কিংবদন্তি-অনুসারে

ভরতের এই মত। মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যের সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। শৃঙ্গার রসযুক্ত এই নৃত্য ললিত, সুকুমার বা কোমল ভাবেরই প্রকাশক ছিল। ভরত তাণ্ডবকে লাস্য-নৃত্যের দলে রেখেছেন। ভরত এ নৃত্যকে স্ত্রী-পুরুষ উভয় নর্তকেরই অনুষ্ঠেয় বলেছেন, তবে তৎকালে কেউ কেউ আবার তাণ্ডব-কে কেবল পুরুষের নৃত্য বলেই মনে করতেন।

শার্ঙ্গদেবের মতে তাণ্ডব ও লাস্য পৃথক রসের নৃত্য। তাণ্ডব উগ্র ও উদ্ধত প্রকৃতির, তাই পুরুষের অনুষ্ঠেয় আর লাস্য নারী নর্তকীর উপযোগী। মহাদেব তাণ্ডব নাচবেন, পার্বতী লাস্য নাচবেন— এমন একটা ধারণা চলিত হয়েছিল।

এমন হতেই পারে। ভরত আর শার্ঙ্গদেবের বিরাট কাল ব্যবধানে একটি নৃত্যভঙ্গিমায় এমন পরিবর্তন স্বাভাবিক। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সংগীতের আঙ্গিকে, রাগরাগিণীর গঠনে ও ভাবে-রসে, মানুষের দর্শন চিন্তায়—সর্বত্রই পরিবর্তন হয়েছে। ভরতের সময়ে এ নৃত্যে যদি পুরুষ ও নারী উভয়ের অধিকার থেকে থাকে তাহলে পুরুষের নৃত্য প্রদর্শনে পৌরুষ এবং নারীর নৃত্য প্রদর্শনে লালিত্য এসে যাওয়াই স্বাভাবিক। নামে পরিবর্তন না হলেও রূপে-ভাবে পরিবর্তন আসতেই পারে।

নৃত্যটিকে যখন মহাদেব— এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং সাধারণত মহাদেবকে ধ্বংসের দেবতা বলেই যখন গণ্য করা হয়েছে তখন তাণ্ডবে রুদ্রতা আসাই স্বাভাবিক।

তাণ্ডবে রুদ্রতা বা লালিত্য যাই থাকুক—তা সুন্দর। নব-রসের সবগুলিতেই তো সুন্দর রয়েছে। নটরাজের মূর্তি নিঃসন্দেহে সুন্দর। বিশ্বের তাবৎ গুণগ্রাহী শিল্পী পণ্ডিতদের কাছে তাই নটরাজ মূর্তি সমাদর পেয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দের 'হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি' ও 'তাথেইযা তাথৈইয়া নাচে ভোলা'— এ দুটি গানেই 'উর্ধ্ব জ্বলত জটা জাল/নাচত ব্যোমকেশ ভাল,/সপ্তভুবন ধরত তাল,/টলমল অবনী' এবং 'উগরে অনল ত্রিশূল বাজে ;/ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ,/জ্বলে শশাঙ্ক ভাল।' প্রভৃতি বাক্যবন্ধে নটরাজের রুদ্রতাই প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের প্রচলিত ধারণায়ও 'তাণ্ডব' রুদ্রের নৃত্য, সুতরাং কোমল ভাববিশিষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথের গানে ও প্রবন্ধাদিতেও এমনই বলা হয়েছে।

. 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'—শিবের এই ধ্যানও রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল। কিন্তু তা তো শিব চরিত্রের একটি দিক। অন্য দিকটিতে রয়েছে তাঁর রুদ্ররূপ। রুদ্ররূপে তিনি ভাঙনের দেবতা। বিশ্বের প্রতিটি অণুপরমাণুতে প্রতি মুহূর্তে চলছে ভাঙাগড়ার খেলা। ভাঙন না হলে কিছু গঠন হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ পুরাতনকে ভেঙে নবীনের প্রতিষ্ঠায় বারবার শিবের রুদ্ররূপ কাল বৈশাখীকে আহ্বান করেছেন। তারুণ্যের ঝড়ে স্থবিরতার খাঁচাটিকে বারবার ভাঙতে চেষ্টা করেছেন। 'তাসের দেশে' প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য অচলতার বাঁধনকে ভেঙেছেন। মানুষের অন্যায় পাপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার গানেও রবীন্দ্রনাথ রুদ্রকে স্মরণ করেছেন। 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ/হে ভৈরব শক্তি দাও'...।

নটরাজ এবং তাঁর তাণ্ডব নৃত্য সম্পর্কে দেশে বিদেশে বহু আলোচনা হয়েছে। সে সব আলোচনার শব্দসমুদ্র অনন্ত অপার। বিখ্যাত শিল্পতাত্ত্বিক ও ভারতবিদ্যাবিদ আনন্দ

কুমারস্বামীর Dance of Shiva গ্রন্থের আলোচনার কিছু সারাংশ এখানে আমার ভাষায় উপস্থিত করছি। (সংক্ষেপে)।

আকাশের সূর্য নক্ষত্রাদির নিয়মিত পরিক্রমার মধ্যে ছন্দ আছে। প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টি 'ছন্ন' (ছন্দ) ছাড়া' নয়। সৃষ্টির এই মৌলিক শক্তি থেকেই নৃত্য এসেছে। মানুষের আদিম শক্তির ছন্দোবন্ধ প্রথম প্রকাশ হয়েছে অনিয়ন্ত্রিত অঙ্গাচালনার মধ্য দিয়ে, যার নিয়ন্ত্রিত প্রকাশই নৃত্য। সেই নৃত্য ক্রমে সংস্কৃত হয়ে নানা ভাবপ্রকাশক মুদ্রায় সমৃদ্ধ হয়েছে—তারই একটি রূপ নটরাজের 'তাণ্ডব' নৃত্য। এই নটরাজ সম্ভবত প্রাক্‌আর্য পার্বত্য দেবতার বিবর্তিত রূপ। শিব, রুদ্র বা নটরাজ-যিনিই হোন, তাঁরই নৃত্যের বিভিন্ন কালের বিভিন্ন রূপের একটি আমাদের চেনা 'তাণ্ডব'। এই ভঙ্গিমা বা নটরাজের মূর্তিরও বহু প্রকারভেদ আছে। কোথাও দুই হাত, কোথাও চার হাত-বিশিষ্ট মূর্তি ; কোথাও অন্য রূপভেদও আছে। শিবের তামসিক রূপ ভৈরব বা বীরভদ্রের নৃত্যভঙ্গিমাই তাণ্ডবের পরিচিত ও প্রচলিত রূপ। এই তাণ্ডব নৃত্যরত নটরাজের মূর্তিই ইলোরা এলিফ্যান্টা, ভুবনেশ্বর এবং নামান্তরে চিদম্বরমে পাওয়া যায়। বিবিধ শৈব ও শাক্ত সাহিত্যে এই নৃত্যের কথা আছে।

ব্যাঘ্রচর্ম তাঁর বসন, সর্প তাঁর অলংকার, ডমরু তাঁর বাদ্য। চার হাতে চার প্রতীক। মাথায় তাঁর জটা—নৃত্যবেগে দোদুল্যমান, যার মধ্যে রয়েছেন গঙ্গা। শিরে চন্দ্র কলা, দুকর্ণে স্ত্রী ও পুরুষ সুলভ কর্ণাভরণ। গলায় হার, বাহুতে অঙ্গদ। আছে একটি বিস্রস্ত অঙ্গাবস্ত্র এবং উপবীত। এক দক্ষিণ হস্তে ডমরু, অন্য দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা, এক বামহস্তে অগ্নি, অন্য বাম হস্ত পদদলিত বামন-দানবের দিকে প্রসারিত। বাম পদ উত্থিত। পশ্চাতে অগ্নিবলয়।'

নটরাজের নৃত্যব্যাখ্যাকালে আনন্দ কুমারস্বামী বলেছেন তাণ্ডবে ব্যক্ত হয়েছে নটরাজের পঞ্চক্রিয়া,— সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব, অনুগ্রহ। এই পাঁচটি ক্রিয়ার পঞ্চদেবতার প্রতীক-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বর, সদাশিব। লেখক দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্য থেকে নটরাজ ও তাণ্ডবের ব্যাখ্যায় বলেছেন— ডমরু ধ্বনি থেকেই এই সংসারের এবং জীবনের উদ্ভব, বিকাশ এবং বিলয় বা মুক্তি। এক্ষেত্রে নটরাজের ভূমিকা উপনিষদের ব্রহ্মের মতোই। লেখক আরো বলেছেন Shiva is a destroyer and loves the burning ground' তিনি ধ্বংসের দেবতা এবং শ্মশানচারী। লেখক একটি বাংলা গান উদ্ধৃত করেছেন—'শ্মশান ভালো বাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি।' এ গানে দেখছি—শিব কালীর পদতলে মৃতবৎ নিষ্ক্রিয় শায়িত-কালীই ক্রিয়াশীল, বিধ্বংসী নৃত্যে কাল গ্রাস করছেন।

দর্শনে ব্রহ্ম (পুরুষ) নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি তাকে সক্রিয় করেন। বাংলার কালী-পদতল-শায়িত শিবও নিষ্ক্রিয়। তবে লৌকিক শিব একটু পাগল-পারা, পাগলাভোলা। তাঁকে নিয়ে লোক-জীবনাশ্রিত অনেক গান আছে। আবার নৃত্যরত শাস্ত্রীয় শিব/রুদ্রকে নিয়েও অনেক গান আছে। ধ্রুপদাদি শাস্ত্রীয় সংগীতে বহু স্থানে এই আদি দেবতার স্তুতিস্তব আছে। স্বামী বিবেকানন্দর 'তা থৈইয়া তা থৈইয়া নাচে' গানটিতে নটরাজ মূর্তির

অনুসরণ আছে।—

'তাথেইয়া তাথেইয়া নাচে ভোলা ব্যোম্ বব্ বাজে গাল।
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে। দুলিছে কপাল মাল॥
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে, উগরে অনল ত্রিশূল রাজে
ধক্ ধক্ ধক্ মৌলিবন্ধ, জ্বলে শশাঙ্ক-ভাল॥'

নটরাজ ধ্বংসের দেবতা। তিনি কী ধ্বংস করেন? কেবল স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, বিশ্বপ্রকৃতিই নয়, সব রকমের বন্ধনই তিনি ছেদন করেন—অহং, মায়া, অবিদ্যা। দান করেন মুক্তি-যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-'এল তোমার সাধনধন চরম সর্বনাশে।' এই সূত্রেই বাংলার কালীমূর্তির কথা, তাঁর ভয়ংকর রুদ্রতার কথাও, স্মরণে আসে। নটরাজ ও কালী যেন মিশে আছে বাংলার সাধনায়। রবীন্দ্রনাথ এই প্রকৃতিদেবীর বিধ্বংসী রূপকে বর্ণনা করেছেন 'জয় তব বিচিত্র আনন্দ' গানটির 'জয় তিমিরনিবিড় নিশীথিনী ভয়দায়িনী' অংশে। 'জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি' গানটিতে আরও বিস্তৃত বর্ণনায় এই ধ্বংসের দেবীকে পাপক্ষালন রূপেও দেখেছেন।

'জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে নমি নমি,
জয় জয় পরমা নির্‌বৃতি হে নমি নমি॥
নমি নমি তোমারে হে অকস্মাৎ,
গ্রন্থিচ্ছেদন খরসংঘাত—
লুপ্তি সুপ্তি বিস্মৃতি, নমি নমি॥
অশ্রুশ্রাবণ প্লাবন হে, নমি নমি।
পাপক্ষালন পাবন হে, নমি নমি
সব ভয় ভাবনার চরমা আবৃতি হে, নমি নমি॥'

রবীন্দ্রনাথ এমনি করেই 'মরণ-বীণার অজানা সুর' সেধে নিতে চেয়েছেন।

(পূজা-৫৮৬)

গীতা-য় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো ইত্যাদি, অর্থাৎ লোকসংহারের জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। (১১/৩২)।

'বর্ষা'র গান— 'মুধুগন্ধে ভরা।' সে গানেও আছে এই ধ্বংসের দেবীর আভাস।

—'...পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয়মদিরা
উন্মুখর তরঙ্গিনী ধায় অধীরা।'

'শ্যামকান্তিময়ী' এই 'স্বপ্নমায়া'-র বর্ণনায়ও ওই ধ্বংসের রূপই এঁকেছেন। ধ্বংসে যিনি আছেন, তিনিই আছেন মুক্তিতে, তিনিই 'মধুগন্ধে ভরা।'

নটরাজের এই রুদ্ররূপ স্বামী বিবেকানন্দের 'Kali the Mother' কবিতাটিতে কালীর মধ্যে সঞ্চারিত ও প্রবাহিত হয়েছে। তার কিছু অংশ এ রূপ-

"...Dancing mad with joy,
Come, Mother. Come!
For Terror is Thy name.
Death is in Thy breath,

And every shaking step
Destroys a world for ever.
Thou 'Time', The All-Destroyer!
Come, O Mother, come!".....

বীররসের সাধক এই ধ্বংসরূপকে আহ্বান ও বরণ করেছেন।

'Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance,
To him The Mother comes.

(কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের যথাযোগ্য অনুবাদ—
'...করালি! করাল তোর নাম,
মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে।
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ
প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।
কালি, তুই প্রলয়-রূপিনী
আয় মাগো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।)

(ছ)

উপনিষদে কোথাও কোথাও এই রুদ্রকেই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মনে করা হয়েছে।
—'একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ
য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্জনাং স্তিষ্ঠতি সঞ্চু কোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-৩/২)

(যেহেতু একমাত্র রুদ্রই বর্তমান সেই কারণে ব্রহ্মবিদগণ দ্বিতীয় আর কোনও বস্তুর অপেক্ষায় থাকেন না। যে রুদ্র নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা এই সমুদয় লোক শাসন করেন, তিনিই প্রত্যেক জীবের অন্তরে অবস্থিত। তিনি এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন এবং প্রলয়কালে উহার সংহার করেন।)

রবীন্দ্রনাথ 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'য় এবং অন্যান্য গানে এই রুদ্রকে দেখিয়েছেন। আবার তাঁকে 'বন্ধু'-ও বলেছেন। যিনি 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানং' তাঁরই আনন্দরূপ দেখতে চেয়েছেন।—

'রুদ্র, তুমি হে ভয়ের ভয়, তুমি আমার আনন্দ॥...
বজ্র এসো হে বক্ষ চিরে, তুমিই আমার বন্ধু।
মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে, তুমি আমার আনন্দ॥' (পূজা-৯০)

তাঁর কবিতায় ও গানে ইনিই মহাদেব, দেবাদিদেব, কালের অধীশ্বর। 'শান্তিনিকেতন'-এর 'ভয় ও আনন্দ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন— "উপনিষৎ একদিকে বলেছেন আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ হতেই যা-কিছু জন্মেছে। আবার আর এক দিকে বলেছেন— 'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ'। ইঁহার ভয়ে অগ্নি জ্বলছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য তাপ দিচ্ছে।"

'তাঁর আনন্দ উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ নয়, তাঁর মধ্যে একটি অমোঘ নিয়মের শাসন আছে।' এই জন্যই রুদ্র তাঁর বন্ধু, পিতা। এই রুদ্রেরই মধ্যে রয়েছে তাঁর 'দক্ষিণ মুখও'। উপনিষদের ঋষির প্রার্থনাও এরকমই ছিল-'হে রুদ্র তোমার যে মঙ্গলময় সৌম্য স্বরূপ মূর্তি, তাই আমাদের দেখাও। (যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরা অপাপকাশিনী...ইত্যাদি, শ্বেতাশ্বতর-৩/৫)। রবীন্দ্রসংগীতে এই রুদ্র ও সৌম্য শিব সহাবস্থানেই আছেন। ঈশ্বরকে আপন অনুভবে পেতে গেলে এই যুগ্মপূর্ণতারই পূজা করতে হয়।-

'এসো হে এসো আকস্মিক ঘিরিয়া ফেলো সকল দিক
মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক নিমেষে এ জীবন।
তাহার পরে প্রকাশ হোক উদার তব সহাস চোখ
তব অভয় শান্তিময় স্বরূপ পুরাতন॥
ভয়েরে মোর আঘাত করো ভীষণ, হে ভীষণ।

তাই, 'চরম কথাটা হচ্ছে শান্তং শিবমদ্বৈতম।

রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হত তাহলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না—তাহলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়। তাই তো মানুষ তাঁকে ডাকছে, রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—'রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো।' (আত্ম পরিচয়)।

'পিতা, তুমি যে আছো সে কথা এমনি আঘাতের মধ্য দিয়ে প্রচার করো। তোমার প্রেম নিষ্ঠুর—সেই নিষ্ঠুর প্রেম তোমার জাগ্রত হয়ে সব অপরাধ দমন করুক।...সমস্ত বিশ্বের পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে ঘরে ঘরে পুঞ্জীভূত—তুমি সেই পাপ মার্জনা করো ; রক্ত স্রোতের দ্বারা মার্জনা করো, অগ্নিবৃষ্টির দ্বারা মার্জনা করো"। ('পাপের মার্জনা')।

রবীন্দ্রনাথের গানে বহুবার এমন কথা উচ্চারিত হয়েছে।—

—'আঘাত সে যে পরশ তব সেই তো পুরস্কার।'
'বজ্রে তোলো আগুন করে আমার যত কালো।' (পূজা-২২৩)
'জ্বলে উঠুক সকল হুতাশ, গর্জি উঠুক সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ পূর্ণতা বিস্তারো॥'
'আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো॥' (পূজা-২২৪)
'বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে...।
যাঁহার হাতের বিজয়মালা রুদ্রদাহের বহ্নিজ্বালা

নমি নমি সে ভৈরবে।।' (পূজা-১৮৫)
'সর্বখর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ—
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহো।।
দূর করো মহারুদ্র, যাহা মুগ্ধ যাহা ক্ষুদ্র- ।।'
'জাগো হে রুদ্র, জাগো—
সুপ্তিজড়িত তিমিরজাল সহে না, সহে না গো।'
'পিনাকেতে লাগে টংকার-...
দানব দম্ভ তর্জি রুদ্র উঠিল গর্জি—।

(জ)

নটরাজের মূর্তি চিদম্বরমে আছে। আনন্দ কুমারস্বামী-কথিত 'চিদম্বরম্' (হৃদয়াকাশ)— 'The Centre of the Universe'.—উপনিষদের শ্লোকের ভাষান্তর বলেই মনে হয়। পূর্বে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য উপনিষদের (৮/১/১) 'অথ যদিদম্স্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং' ইত্যাদিতে ওই হৃদয়াকাশের কথা বলা হয়েছে।

এই নৃত্যে আছে মহাবিশ্বের ছন্দোলীলা, মায়া থেকে মুক্তি এবং হৃদয়াকাশেই আছে সমগ্র বিশ্বের প্রতিরূপ। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন— 'অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।'

দক্ষিণী সাহিত্যের উদ্ধৃতি দিয়ে আনন্দ কুমারস্বামী বলেছেন-'The Supreme Intelligence dances in the soul ...for the purpose of removing our sins.' এ উপলব্ধি রবীন্দ্রসংগীতেও আছে— চিদম্বরে মহাকালের নৃত্য—

'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।।...
...নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।'

আনন্দ কুমারস্বামী পরিশেষে বলেছেন—' This is poetry; but none the less,- science.' রবীন্দ্রনাথের 'নৃত্যের তালে তালে' গানটির মূল দর্শনেও আছে বৈজ্ঞানিক সত্য এবং কাব্যের মিলিত রূপ। নটরাজ পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে যুগ যুগ ধরে সকলেরই মুগ্ধতাকে অধিকার করে আসছে।

A Concise Encyclopaedia of Hinduism-vol-2 (Swami Harshananda)-এর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ—

'The Nataraja icon shows him... in the posture of dancing. There is a damaru (drum) in the upper right hand and fire in the left. The lower right hand is in Abhaya mudra (pose of protection)...

Siva's dance indicates a continuous process of creation, preservation and destruction...'

(ঝ)

রবীন্দ্রনাথ রুদ্রকে এড়িয়ে যাননি। তিনি যে পূর্ণ-কে চেয়েছেন-তা শিব ও রুদ্রের মিলিত রূপ। রুদ্ররূপে যিনি আঘাত করেন—শিবরূপে তিনি রক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথ জানেন-'তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইকো অবহেলা।' 'ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সেই তো ঘরে লবে।' বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার অতিব্যস্ত জীবনযাত্রায় ক্লান্ত কবির মনে শিবস্তোত্র রচনার বাসনা হয়েছিল—Hymn to Shiva, The Lord of Ascetics (যোগীশ্বর মহাদেব)। 'পূরবী' কাব্যের 'যাত্রা' বা 'তপোভঙ্গ' কবিতা দুটিতে এই শিব বা শংকরের স্তুতি আছে বটে তবে তার চরম বিকাশ ঘটেছে 'নটরাজঋতুরঙ্গশালায়'। 'পূরবী' কাব্যের 'তপোভঙ্গ'-এর 'কালের অধীশ্বর' 'নটরাজ'-এই পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছেন।

উপনিষদে (শ্বেতাশ্বতর-১/৩, ৪/১৫, ৬/২, ৬/১৬) বলা হয়েছে যে পরমেশ্বরই ত্রিকালকে নিয়মিত করেন। রবীন্দ্রনাথও 'কালের অধীশ্বর' বলতে যে নটরাজকে মনে করেছেন তিনি পরমেশ্বরই। 'ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্' রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শ্লোক।'

(ঞ)

'নৃত্যের তালে তালে,—গানটির ধুয়া বা ধ্রুব পদ
'নমো নমো নমো
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।'

'ভরুক চিত্ত মম'-বাক্যটি তিনবার উচ্চারিত হয় গানে। তার মানে নটরাজের নৃত্যছন্দ, বিশ্বজগতের সৃষ্টি ধ্বংস, ভাঙা গড়া, জীবনমৃত্যুর বিবর্তনচক্র কবির হৃদয়কেও সমৃদ্ধ করুক। 'নটরাজের তাণ্ডবে, ... যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলরস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।' ('নটরাজ'-এর ভূমিকা)। সর্বধর্ম সর্বদর্শনের সার কথা বা চরম উদ্দেশ্য যে 'মুক্তি' —এ গানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই মুক্তির সাধনাই করেছেন। এই নৃত্যই সেই মুক্তিকে আবাহন করে আনে। এই নৃত্যের ছন্দে আপন চিত্তকে মেলাতে পারলে সেই মুক্তি মেলে।

এই মুক্তিকে নিজের জীবনে মেলাবার জন্যে কবি প্রার্থনা করছেন 'ঘুচাও সকল বন্ধ হে'। বন্ধ কী? মুক্তির প্রতিবন্ধক।—যা মুক্তিকে রোধ করে।

পৃথিবীর অধ্যাত্মসাধক, দার্শনিক, জীবন পথের পথিকরা এই মুক্তিকে নানা ভাবে দেখেছেন।

মানুষ পৃথিবীতে এসে বিশ্বের আলো বাতাস জল ভূমি— ভোগের সহজলভ্য সব উপাদানগুলিকেই বগলদাবা করে নিয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে তার মধ্যে জন্মেছে এক

প্রভুত্ব বোধ। সে জেনে বসেছে বিশ্ব তারই দখলে। কিন্তু এই দখলদারির একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়াও আছে। তার অধিকৃত তাবৎ সম্পদ, যাকে একদা তার জীবনযাত্রার বাহন বলে মনে হয়েছে, তাই আবার একসময় তার পায়ের শেকল হয়ে দাঁড়ায়। এই ভোগের উপাদানই এক সময় তাকে লটবহরের মতো পেছন পানে টানে। এটাই হল বন্ধ। এটাই হল প্রতিবন্ধক। 'জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।' এর হাত থেকেই কবি চাইছেন রেহাই—'উপকরণ চাই না, চাই অমৃত।' কিসে আসে এ রেহাই বা মুক্তি। জ্ঞানের আলোয় যখন মানুষ বুঝতে পারে যে এই ভোগের সম্পদের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে যাওয়া আসলে স্বপ্নবৎ ভ্রান্তি যা ঘুমের মতো সত্যকে আড়াল করে রাখে। একেই কবি বলেছেন-'সুপ্তি।' এই সুপ্তি থেকে চিত্তকে আলোকে জাগানোই মুক্তির পথ।' 'সুপ্তি ভাঙাও চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে।' 'এ মোহ আবরণ খুলে দাও।'-অজ্ঞানের নিদ্রাই মোহ।

বৃহদারণ্যকের উপাখ্যানে আছে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির কথা। যাজ্ঞবল্ক্যর দুই পত্নী-মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী। যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে সমস্ত বিত্তসম্পত্তি পত্নীদের ভাগ করে দিতে চাইলেন। মৈত্রেয়ী বললেন—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্। বিত্ত নিয়ে কি অমৃত হতে পারব ? তুমি আমাকে অমৃতের কথা বলো।' ভোগে আনন্দও নেই, অমৃতও নেই।

গীতায়ও বলা হয়েছে,— সকলই ঈশ্বর-আচ্ছাদিত-ময়া ততম্ ইদম্ সর্বম্ জগত্ (৯/৪) 'আমার দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত'...। মানুষের কোনো অধিকার নেই। সুতরাং লোভ নিরর্থক। 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' ...(২/৪৭)। রবীন্দ্রনাথ কী বলছেন !—'ফলের তরে নয়তো খোঁজা/কে বইবে সেই বিষম বোঝা/ যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে আবার ফুল ফুটাই।।' (পূজা-১৯১)।

'নটরাজের বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে' গেলে জীবনকে নিরাসক্ত হতে হবে। 'বন্ধন', মুক্তি প্রভৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের গানগুলিতে আছে। 'ধনে জনে আছি জড়ায়ে,' 'ভুবনেশ্বর হে', এ রকম বহু গানেই তা আছে। পূজা, প্রেম, প্রকৃতি—সব পর্যায়ের গানেই এই বন্ধন ছেদনের কথা আছে। যন্ত্রবাদ্যের তারগুলির সঙ্গতিতেই সংগীতের মুক্তি। ঈশ্বরের 'সুরে সুরে সুর মেলাতে' পারলেই আসে মুক্তি।

আর একটি শব্দ মুক্তিকামী সব সাধক, দার্শনিক এবং ভক্তদের ব্যবহারে খুবই পরিচিত—'অহং'। গীতায় বলা হয়েছে-'অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।(৩/২৭)। অহংকার মুক্তিলাভের বিঘ্নস্বরূপ। অহং বোধে মানুষ নিজেকেই জগতের কর্তা মনে করে ; 'ত্যাগের সহিত ভোগ'-তার অভ্যাসে নেই। উপনিষদে ('প্রশ্ন') ঋষি পিপ্পলাদ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু গার্গ্যকে 'অহং' বিষয়ে বলেছেন—"অহংকার অভিমানাত্মক। 'আমি ধনী, আমি বিদ্বান' এই প্রকারের অনুভূতি সমূহ অহংকারের কাজ।" (প্রশ্ন ৪/৫০)। এমন অভিমানই 'ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা'-র বিপরীত এবং ফলত সকল মানুষ এবং তাবৎ বিশ্বের সঙ্গেই নিজের ব্যবধান সৃষ্টি করে। অহংকার ত্যাগের কথা 'নটরাজ'-এর 'মুক্তিতত্ত্ব' কবিতায় যেমন আছে ('আপনাকে তার হারিয়ে প্রকাশ আপনাতে যার আপনি

আছে'...'নদীর মুক্তি আত্মহারা নৃত্যধারার তালে তালে।) তেমনি আছে রবীন্দ্রনাথের নানা গানের পঙ্‌ক্তিতে পংক্তিতে। যেমন—

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥...
আমারে না যেন করি প্রচার, আমার আপন কাজে—
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।...'
...'সেই-যে আমার কাছে আমি ছিল সবার চেয়ে দামি,
তারে উজাড় করে সাজিয়ে দিলাম তোমার বরণ-ডালা॥' (পূজা-৬০)
...'ছাড়িতে পারিনি অহংকারে,...ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে হায়।
...যা আছে আমার সকলি কবে
নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে—...।' (পূজা-১১৮)
'আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে...।' (পূজা-১০৯)
'...সবার সাথে মিলাও আমায় ভুলাও অহংকার...' (পূজা-২৭২)

রবীন্দ্রনাথের গানের আলোচনায় Mysticism ও সুফীবাদের কথা বাদ দিলে চলে না। বেদান্ত-এর সঙ্গে মরমী সাধনার মিল ও যোগ আছে; তেমনই রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গেও। St. Augustine -এর উক্তিতে আছে-' When I shall cleave to Thee with all my being, then shall I in nothing have pain and labour; and life shall be a real life, being wholly full of thee;

কবীর-এর গানে আছে-'সাধো সো জন উৎরে পারা
জিন্ মনতে আপা ভারা॥...
গরব গুমান সব দূর নিবারে
করণীকা বল নহী॥'

(যে জন মন হইতে আপনাকে দূর করিয়াছে সেই উত্তীর্ণ হইয়াছে।... গর্ব অভিমান যে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে কর্মবন্ধন তার কাছে শক্তিহীন।

(-ক্ষিতিমোহন সেন-'কবীর')॥

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন-"অহংকার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়-'আমি কর্তা।' 'আমি কর্তা' 'আমি কর্তা', এই বোধ থেকেই যত দুঃখ অশান্তি"। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)।

সুতরাং বলা চাই—'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ'। (পূজা-১১১) এই নৃত্যে যোগ দিতে পারাটাই মুক্তি। অহংকার এবং বন্ধ থেকে মুক্তি। এ মুক্তি অবশ্যই নির্বাণ নয়, সংসার ত্যাগও নয়, বিশ্বের মধ্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করে দেওয়া।—

'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে।
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে॥
দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে,

গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে॥
আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে, ...
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা—
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি-আশে॥

'শান্তিনিকেতনে'র 'মুক্তি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'...জগৎ সংসারকে ত্যাগ করাই মুক্তি নয়-পাপ স্বার্থ অহংকার জড়তা মূঢ়তা ও সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে, যা দেখছি একেই সত্য করে দেখা, যার মধ্যে আছি এর মধ্যে সত্য করে থাকাটাই মুক্তি।' এই মোহ-মুক্ত সত্য দৃষ্টি হলে তবেই সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম অনুভব করা যায় সর্বত্র।

এই সত্য অনুভব করার উদাহরণ আছে এ গানটিতে

'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবন খানি
তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি॥
তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী॥
...রূপের রেখা রসের ধারায় আপন সীমা কোথায় হারায়
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি॥'

মোহ, বন্ধন, মুক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভঙ্গি তাঁর কবিতায় আছে।—

'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।....
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে,
তোমার আন্দ রবে তার মাঝখানে।...'

(নৈবেদ্য-৩০)

'সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার ভাঁটায়
.....নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো।
সে তরঙ্গানৃত্যচ্ছন্দে বিচিত্রভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে, আপন সঙ্গীতে
এ বিশ্বপ্রবাহে,
সে ছন্দে বন্ধন মোর, মুক্তি মোর তাহে।
....
হে মহাপথিক,....
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে।'

('পরিশেষ'-এর 'পান্থ')

(ট)

'চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে।'

মানবসভ্যতার আদিযুগ থেকেই গান হয়ে এসেছে মানুষের সব চেয়ে নিকট সঙ্গী। অসভ্য মানুষ জীবনজীবিকার গ্লানি থেকে ক্ষণিক মুক্তি খুঁজে পেয়েছে দিন শেষে অসংস্কৃত অনিয়মিত অঙ্গচালনায় ও কণ্ঠবাদনে। পরবর্তী সভ্য মানুষ গানকে ভোলে নি। সেও অতীন্দ্রিয় সাধনায় গানকেই করেছে সঙ্গী। ভারতীয় সংস্কৃতির আদি থেকে আজ পর্যন্ত সংগীত তার জীবনকে ছেড়ে যায়নি। মানুষ যখনি প্রাত্যহিকতার বন্ধন ছিঁড়ে মুক্তি খুঁজেছে অধ্যাত্ম ভাবনায়, তখনি সংগীত তার মাধ্যম হয়েছে। নৈরাশ্যের দর্শনের প্রবক্তা Schopenhouer শেষ পর্যন্ত শান্তি খুঁজেছিলেন বৌদ্ধধর্মে। তারপরে তিনি সংগীতের মহিমাও বুঝেছিলেন।-

'...The effect of music is more powerful and penetrating than the other arts......it affects our feelings directly..., it speaks to something subtler than the intellect.' (Story of Philosophy by Will Durant)

ঈশ্বরসন্ধান তথা মুক্তিসন্ধানের মতো অতি সূক্ষ্ম মানসিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সংগীতই শ্রেষ্ঠ বাহন বলে স্বীকৃত হয়েছে পৃথিবীর সব সাধকদের কাছে। Mysticism-বিশারদ Evelyn Underhill বলেছেন—'*Of all the arts music alone shares with great mystical* literature the power of waking in us a response to the life movement of the universe : brings us–we know not how–news of its exultant passions and its incomparable peace. (Mysticism).

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

'যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে
তারা কথার বেড়া গাঁথে কেবল দলের পরে দলে।
যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর
তাদের সবার সুরে সবাই মেলে নিকট হতে দূর।।'

এ জন্যেই মুক্তির প্রত্যাশী সব সাধকেরাই, এবং রবীন্দ্রনাথও, গানের মাধ্যমকেই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বলেছেন। নৃত্যও তো সংগীতেরই অঙ্গ। 'নৃত্যের তালে তালে' গানটিতে তাই চিত্তে 'মুক্ত সুরের ছন্দ' জাগাবার কথা বলেছেন কবি।

(ঠ)

কবি বলছেন-নটরাজের নৃত্যছন্দেই আছে মায়ার জগতের বিচিত্র তরঙ্গলীলা, আবার ওই নৃত্যে যোগ দিলেই মেলে অখন্ড রূপের নিত্য জগৎ। সমগ্র বিশ্বের ধ্বংস-সৃষ্টি, ভাঙাগড়ার কারিগর যে অণু-পরমাণু—বিশ্বতনুর গঠনের মূলে আছে সেই অণুপরমাণুর কম্পন ও সুষম বিন্যাস। বিশ্বের গ্রন্থন ও তার বন্ধচ্ছেদন এ সবই ওই নৃত্যের বেগেই সম্পন্ন হচ্ছে— পরমাণুর সংযোগ-বিশ্লেষণে। 'বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায় যুগে যুগে...', অর্থাৎ মায়ার বাঁধন ও মুক্তি সবই ঘটে চলেছে নটরাজের 'বিশ্বনাচের দোলায় দোলায় ; —অনন্তকাল ধরে। এলোমেলো অসংগঠিত ('বিদ্রোহী') পরমাণুরা সুসংবদ্ধ হয়ে রূপময়

মূর্তি ধারণ করছে। গ্রহ-নক্ষত্রের নটবালকেরা নটরাজের চরণমঞ্জীরের ছন্দে নৃত্যাবর্তিত হচ্ছে। জড়ে আসছে চৈতন্য, আসছে সুখ দুঃখের উত্থানপতন। 'নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু' পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।'

এখানেই আনন্দ কুমার-স্বামী-কথিত Poetry আর Science -এর যুগলবন্দী।

এভাবেই "কোন্ আদিকাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে ....
সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপ দরশন।
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে
কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রস বরিষণ।।" (গীতবিতান-পূজা ২৯৭)

জন্ম-জন্মান্তর ধরে-কত

"...লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘূর্ণিতালে।" (বিচিত্র—১)

নটরাজের তাণ্ডবের টানে, ডমরুধ্বনির আকর্ষণে কত জীবনমরণ পার হয়ে অনাদি কাল ধরে মানব চলেছে, চলবে অনন্তকাল পর্যন্ত, নানা বিবর্তনের পথ ধরে।

"...যাত্রা পথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারই গান গাওয়া।' (পূজা-৫৬৪)।

গতি ও স্থিতি উভয়েই নটরাজের চরণে মিলিত হয়েছে। মায়া এসে মুক্তিতে মিশেছে। সমস্ত সংসার, সমস্ত জীবন, এসে নাচের ঘূর্ণিতালে মিলেছে।

পথ চলা কি শেষ? রথচক্রের মূল কেন্দ্র কি গতিময়? অথবা স্থির? কে বলবে? এই পরমাণু-র নৃত্যছন্দেই চলমান রয়েছে বিশ্বজীবন-অনাদিকাল ধরে। চলবেও অনন্তকাল।

(ঙ)

কবির মনের মধ্যে নটরাজের বন্দনা। এই বন্দনা এবং এই প্রার্থনা যেন একটা সহায়ক অবলম্বন পেল জাভা ভ্রমণের মাধ্যমে। জাভা ভ্রমণে তিনি জাভার সংস্কৃতি—বিশেষত নৃত্যনাট্য দর্শনে শুধু মুগ্ধই হননি—নিজের সৃষ্টিতে নৃত্যকলাকে প্রয়োগের এবং সম্পূর্ণ প্রকাশমাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের প্রেরণাও পেলেন।

জাভা ছিল বৃহত্তর ভারতের অংশ। জাভার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির ছিল অটুট বন্ধন। 'মহুয়া' কাব্যের 'সাগরিকা' কবিতাটিতে এই প্রাচীন সম্পর্ককে স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ বললেন—

'মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,

আরেকবার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুকবাণ নাহি আমার হাতে ;
—এবার আমি আনি নি ডালি দখিন সমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে, আমারে তুমি চিনিতে পারো কি না।'

এই সংস্কৃতি- সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের পথে রবীন্দ্রনাথের দৌত্য কতটা সফল হয়েছিল জানি না। তবে জাভার নৃত্যকলা রবীন্দ্রনাথের হাতে এমন একটি উপহার— যা আজও অম্লান হয়ে রয়েছে তাঁর নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে।

জাভার নৃত্যকলা সম্পর্কে 'জাভা যাত্রীর পত্র'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখলেন "দেখবামাত্রই —মনে হয়— অজন্তার ছবিটি।" "এমনতরো বাহুল্য বর্জিত সুপরিচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য আমি কখনো দেখিনি। ...জাভাতে যে নাচ দেখলুম তার সৌন্দর্য যেমন, তার শালীনতাও তেমনি নিখুঁত। আমরা দেখলুম এই দুটি বালিকার তনুদেহকে সম্পূর্ণ অধিকার করে অশরীরী নাচেরই আবির্ভাব।"..."এ হচ্ছে কলা সৌন্দর্যের একটি পরিপূর্ণ সৃষ্টি...।[১]

জাভার নাচ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তার পরিচয় পাচ্ছি—"ভারতবর্ষ থেকে নটরাজ এসে একদিন এখানে মন্দিরে পূজা পেয়েছিলেন, তিনি এদের যে বর দিয়েছিলেন সে হচ্ছে তাঁর নাচটি—আর আমাদের জন্যে কি কেবল তাঁর শ্মশান ভস্মই রইল ?" (জাভাযাত্রীর পত্র)।

এই আক্ষেপ যে হতাশামাত্রই নয়—এ যে নতুন করে জেগে ওঠার প্রেরণা—তা দেখা যাবে এর পরবর্তী সৃষ্টি প্রয়াসগুলির মধ্যে।

'তাসের দেশ', 'গীতোৎসব', 'শিশুতীর্থ,' 'শাপমোচন' প্রভৃতির সোপান বেয়ে এই নৃত্যভাবনা পূর্ণ পরিণতি পেয়েছে নৃত্যনাট্যত্রয়ে। ইতিমধ্যে জাভার নৃত্যনাট্য রবীন্দ্র মননের জারক রসে রাবীন্দ্রিক নৃত্যনাট্যে পরিণত হয়েছে। জাভার নৃত্যনাট্যে গান ছিল না। কেবল ছিল যন্ত্রসংগীতের বাজনার সঙ্গে দেহভঙ্গিমার গীতচাঞ্চল্য। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে দেখা গেল কাব্য, সুর, ও নৃত্য—এ তিনের সমাবেশ—একই কাহিনী ঘিরে। একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'যেখানে অনির্বচনীয় সেখানেই গানের প্রভাব' বা 'বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে,'—অর্থাৎ সুর বাক্যকে অধিকতর সংবেদী করে তোলে। পরবর্তী কালে আমরা দেখলাম—নাট্যক্ষেত্রেও বাক্যসংলাপ যা পূর্ণতঃ প্রকাশ করতে পারে না, সুরেও যা পূর্ণ প্রকাশিত হয় না, নৃত্যমাধ্যম সেক্ষেত্রে সহায়ক হয়। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—"জীবন পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি ভাব রবীন্দ্রনাথকে প্রকাশ করিতে হইতেছিল সংগীত ছাড়া যাহা প্রকাশযোগ্য নয়। সেইজন্য

(১) অন্যত্র বলেছেন—'এ দেশে নাচের মনোহারিতা ভোগ করবার জন্যেই নাচ নয় ; নাচটা এদের ভাষা। এদের পুরনো ইতিহাস নাচের ভাষাতেই কথা কইতে থাকে।'

শেষজীবনে সংগীত তাঁহার ভাবের প্রধান বাহন। নাটকের মধ্য দিয়েও কবি ক্রমে কতকগুলি সূক্ষ্মশরীরী, ছায়ারূপী বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করিতেছিলেন। ভাব যতই সূক্ষ্ম হইতে লাগিল তাহার সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য ততই সুরের সারথ্য অধিকতর আবশ্যক হইতে লাগিল। ভাব সূক্ষ্মতর হইয়া পড়িল, সুরও যেন আর তাহাকে সম্যক প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তখন সুরের সঙ্গে নৃত্যের যোগের প্রয়োজন হইল। যে ভাবের সংজ্ঞা নাই, যে আকুলতার ভাষা নাই, ছন্দ যাহার আভাসমাত্র দিতে পারে, সুর যাহার ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছু জানে না— শিক্ষিত অঙ্গের ছন্দোময় ব্যঞ্জনা সেই অনঙ্গ আকুতিকে আভাসিত করিয়া তুলিতে প্রাণপণ করে—ইহাই নৃত্য।" (রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ)। রবীন্দ্রনাথ এ ভাবে কথা থেকে সুরে এবং সুর থেকে নৃত্যের জগতে তাঁর কাব্যবস্তুকে অর্পণ করলেন।

এর পরে নানা অনুষ্ঠানে কবি সূক্ষ্মভাব বিশিষ্ট গানগুলিকে বিশেষত তাঁর শেষজীবনের অমূল্য সম্পদ প্রকৃতির গানগুলিকে—নৃত্যের মাধ্যম যোগে উপস্থিত করতে লাগলেন। এভাবে নৃত্য তাঁর শিল্প প্রকাশের অন্যতম অপরিহার্য মাধ্যমরূপে স্থান পেল।

নৃত্যনাট্যের গানের ব্যাপারে একটা কথা ভাবা দরকার। এক একটি গানে যেমন এক একটি Lyric থাকে—যা স্বয়ংসম্পূর্ণ— এখানে তা নয়। অবশ্যই নৃত্যনাট্যের অনেক মাত্রই গান স্বতন্ত্র করে গাওয়া যায়। তবে নৃত্যনাট্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেন একটি গান, অথবা নানা গানের একটিমাত্র মালা। সুরও তেমনি—নানা রাগরাগিণী, কীর্তন, বাউল প্রভৃতি মিলে পদাবলী কীর্তনের একটি পালার মতো। এখানে সমগ্রই আসল কথা—সব খণ্ড মিলে একটি সমগ্র। তার মাধ্যমে নাট্যবস্তু প্রস্ফুটিত হয়।

নৃত্যবিষয়েও একই কথা। যদিও রবীন্দ্রনাথের কালে মণিপুরীরই প্রাধান্য ছিল, তবু কোথাও কোথাও কথক, ক্যান্ডি, কথাকলি-ও এসেছে। যেহেতু নৃত্যের কোনো নৃত্যলিপি বা চলচ্চিত্র নেই, তাই দিনে দিনে নৃত্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ হয়তো পালিত হচ্ছে না—অর্থাৎ নৃত্য পরিচালকের নৃত্য পরিকল্পনাই শেষ কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যাইহোক, সমগ্র নৃত্যনাট্যটি নৃত্যশৈলীর বিচিত্রতা সত্ত্বেও একটিমাত্র নৃত্যই মনে হয়।

নৃত্যনাট্যের অস্পষ্ট পূর্বাদর্শ হয়তো ভারতের কোনো কোনো স্থানে ছিল। তবে আধুনিক কালে এটি রবীন্দ্রনাথেরই উদ্ভাবন।

চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা—এ ত্রয়ীর পূর্বে শাপমোচনকেও (১৯৩৪) নৃত্যনাট্য বলা যেতে পারে। তবে তা পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য নয়। কারণ, শাপমোচনের গানগুলি সংলাপযোগ্য নয়, নৃত্যনাট্য উপলক্ষ্যে রচিতও নয়। পুরাতন গান থেকে পুরোপুরি বা অংশবিশেষ নেওয়া হয়েছে। যেমন 'না যেয়ো না'। গানগুলি একান্তভাবে পাত্রপাত্রীর সংলাপ হিসেবে রচিত না হওয়ায় প্রকাশিত ভাব শ্লথ হয়েছে। এমনিতেই সাংকেতিকতা প্রধান হওয়ায় শাপমোচনে নাটকীয়তার (action) মন্দা, পরন্তু গানগুলির দৈর্ঘ্য এর নাটকীয়তাকে আরও ক্ষুণ্ণ করেছে। অনেকটা যেন 'নাট্যের সূত্রে গানের মালা।' তাছাড়া ঘটনা বর্ণনার জন্য এখানে গদ্যভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সম্পূর্ণ নৃত্যগীতের ওপরে নির্ভর করা হয়নি।

শাপমোচনের কাহিনীতেও ঘনবদ্ধ action বা নাটকীয়তা নেই। রক্তমাংসের মানুষের সুখ দুঃখ এখানে নেই। আদর্শায়িত ভাবপ্রধান প্রেম-বিরহ-ভাবনার Lyric এর নাট্যগুণকে বিঘ্নিত করেছে। একে নৃত্যনাট্য না বলে বলা হয়েছে নৃত্যাভিনয়।

ইতিপূর্বে নৃত্যযুক্ত যেসব অনুষ্ঠান হয়েছে তার মধ্যে কোনো কাহিনী থাকত না। এক একটি গানের ভাবকে অবলম্বন করে এক একটি খণ্ড খণ্ড নৃত্যরূপ দেওয়া হত। 'শিশুতীর্থে' আগাগোড়া একটি গল্পসূত্র, ক্ষীণ হলেও, ছিল। 'শাপমোচনে' সেই সূত্রটি আরও একটু অনুভবযোগ্য হল। গান এসেছে এই দুটি কাহিনীর টানে। ফলে কম হলেও, নাট্যগুণ আছে। শাপমোচনের যুগেই নাচের মধ্যে কাহিনী বা নাট্যবিষয়ের আগমন।

একটি বৌদ্ধ আখ্যানের আভাস থেকে শাপমোচনের কাহিনী পরিকল্পিত। 'রাজা' নাটকের কাহিনীও ওই সূত্র থেকে গৃহীত। শাপমোচনের কাহিনীঃ—

গন্ধর্ব সৌরসেন সুরসভার গীতনায়ক। একদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সূর্য প্রদক্ষিণে। তার বিরহভাবনার অন্যমনস্কতায় সৌরসেনের তাল গেল কেটে, উর্বশীর নাচে পড়ল বাধা। স্খলিতচ্ছন্দ সুরসভার অভিশাপে গন্ধর্বের দেহশ্রী হল বিকৃত। অরুণেশ্বর নামে তার জন্ম হল মর্ত্যে। মধুশ্রী বিচ্ছেদাশংকায় কাতর হয়ে প্রার্থনা করল—'আমাদের গতি হোক একই লোকে।' ইন্দ্র বললেন—'তথাস্তু, যাও মর্ত্যে, সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে। সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন অপরাধের ক্ষয়।

কমলিকা নামে মধুশ্রীর জন্ম হল মর্ত্যলোকে। তারপর কমলিকার সঙ্গে অরুণেশ্বরের বিবাহ হল ; রাজবধূ এল পতিগৃহে। কিন্তু ঘরে জ্বলে না আলো। অন্ধকারেই প্রতিরাত্রে স্বামীর ঘরে বধূ সমাগম। সে দেখতে চায় স্বামীকে। রাজা বলে 'এখনো সময় হয়নি'। শেষে একদিন বলে 'কাল চৈত্রসংক্রান্তি। নাগকেশরের বনে নিভৃতে সখাদের সঙ্গে আমার নৃত্যের দিন। প্রাসাদ শিখর থেকে দেখো চেয়ে।' মহিষী বললে—'চিনব কী করে।' রাজা বললে 'যেমন খুশি কল্পনা করে নিও।'

পরদিন মহিষী বল্লে—'দেখলেম নাচ।..কেবল একজন কুশ্রী কেন রসভঙ্গ করলে?' রাজা বললে—'মর্তের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে—তখনি তো সুন্দরের আবির্ভাব। সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করেনি?' মহিষী বললে, 'আজ সূর্যোদয় মুহূর্তে তোমার প্রকাশ হোক আমার দিনের মধ্যে।' জ্বলে উঠল আলো। টলে উঠল যুগলের সংসার। 'কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা?'—বলতে বলতে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। তারপর দীর্ঘ বিরহের শেষে একদিন সে বলে ওঠে— 'যাব আজ, আর ভয় করিনে আমার দৃষ্টিকে।' তারপর উভয়ের শাপমোচন হল। বিরহ যন্ত্রণায় উভয়ের ছন্দঃপাতনের অপরাধ ক্ষয় হয়ে গেল। নটরাজের তালের সঙ্গে আপন তালের অসঙ্গতিজনিত অভিশাপ থেকে উভয়ে মুক্ত হল। রানী বলে উঠল, 'প্রভু আমার প্রিয় আমার, একী সুন্দর রূপ তোমার।'

প্রেমে রূপজ মোহ এবং তার থেকে মুক্তি—এটাই শাপমোচনের উপজীব্য মনে হয়। পরবর্তী 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যেও কিছু পরিমাণে সে কথা বলা হয়েছে।

(ঢ)

চিত্রাঙ্গদা—১৯৩৬

চিত্রাঙ্গাদা থেকেই পূর্ণাঙ্গা নৃত্যনাট্য আরম্ভ। চিত্রাঙ্গাদায়-ও অবশ্য দু'এক স্থানে আবৃত্তি আছে। তবে তা নাটকের সংলাপ হিসেবেই রয়েছে—পাত্র পাত্রীর দ্বারাই তা অভিনীত হয়। জাভা-র নৃত্যনাট্যে ছিল কেবল নৃত্য ও যন্ত্রসংগীত। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি নৃত্য, গীত ও কাব্য দ্বারা উপস্থাপিত নাট্য ঘটনা। কাব্য অর্থাৎ গানের ভাষাতেই নাট্যঘটনা বর্ণিত। সুরে ও নৃত্যে হয় এর প্রকাশ। গীতিনাট্যে গানে সংলাপ বলা হয়, নৃত্যনাট্যে নৃত্য ও গান মিলিতভাবে সংলাপ বলে। ফলে সূক্ষ্মতর ভাবগুলির প্রকাশ এখানে সম্ভব হয়। কেবল কাব্য ও সুর যা দিতে পারে না, এখানে নৃত্য সহযোগে তা সুলভ ও সুগম হয়।

চিত্রাঙ্গাদায় যেমন চারতুক বিশিষ্ট সম্পূর্ণ গান আছে ('শুনি ক্ষণে ক্ষণে', 'কেটেছে একেলা' প্রভৃতি) তেমনি কথ্য ভঙ্গিতে (dialogue) টুকরো টুকরো গানও আছে। যেমন—

অর্জুন। জনপদবাসী শোনো শোনো
রক্ষক তোমাদের নাই কোনো?
গ্রামবাসী। তীর্থে গেছেন কোথা তিনি...ইত্যাদি।

'চিত্রাঙ্গাদা নৃতনাট্যে'র কাহিনী।

রবীন্দ্রনাথ ১২৯৯ (১৮৯২) সালে লেখেন 'চিত্রাঙ্গাদা' নাটক—মহাভারতের অর্জুন -চিত্রাঙ্গাদার উপাখ্যান অবলম্বন করে। 'স্নেহে সে নারী বীর্যে সে পুরুষ'—এমন এক নারীচরিত্রের আদর্শ তিনি চিত্রাঙ্গাদায় দেখিয়েছেন। এর পরে ১৯৩৬-এ 'চিত্রাঙ্গাদা নৃত্যনাট্য' রচনা করেন। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গাদা নৃত্যনাট্যে' যে তত্ত্বটি প্রকাশিত হয়েছে তা কবির ভাষায়

"প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়।"

"মণিপুর রাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তা সত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গাদার জন্ম হল তখন রাজা তাঁকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি।"

"অর্জুন দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করে ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। তখন এই নাটকের আরম্ভ।"

প্রথম দৃশ্যে চিত্রাঙ্গাদার শিকার আয়োজন। বনপথে অর্জুন নিদ্রিত। শিকারের বাধা মনে করে চিত্রাঙ্গাদার সখী তাঁকে তাড়না করলে—বালকবেশী চিত্রাঙ্গাদাদের দেখে অর্জুন সকৌতুক অবস্থায় প্রস্থান করলেন। অর্জুনকে চিনতে পেরে এবং তার প্রতি অর্জুনের অবজ্ঞায় অপমানিত হল চিত্রাঙ্গাদা। সব কাজ তার কাছে মিছে হল,' জীবনে হল বিতৃষ্ণা, আপনার পরে ধিক্কার।' তবে অর্জুনকে দেখে সে মুগ্ধ। "ছিল মন তোমারি

প্রতীক্ষা করি, যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি"...।

চিত্রাঙ্গদার স্নানে আগমন। জলের ঢেউ যেন তার মর্মতলের ঢেউ-এরই প্রতীক। সখীরা তাঁকে নূতন আভরণে সাজিয়ে দেয়। ধ্যানী অর্জুনকে চিত্রাঙ্গদা তাঁর হৃদয় মন প্রাণ নিবেদন করে। কিন্তু ব্রহ্মচারী ব্রতধারী অর্জুন তাকে প্রত্যাখ্যান করে।

অর্জুনের প্রত্যাখ্যানে সে বুঝতে পারে যে আসলে সে নারী। তার বৈশাখের প্রখর রৌদ্রের অন্তরালে 'কখন বাদল আনে আষাঢ়ের পালা।' সে বলে 'হায়, হায়, নারীরে করেছি ব্যর্থ দীর্ঘকাল জীবনে আমার। ধিক ধনুঃশর, ধিক বাহুবল। মুহূর্তের অশ্রুবন্যাবেগে ভাসায়ে দিল সে মোর পৌরুষসাধনা।'

এর পরে মদনের শরণাপন্ন হয় চিত্রাঙ্গদা।—

মদন তাকে বর দিলেন—"দিবে মন মোহি

নারী বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরে

পাবে অচিরে,

বন্দী করিবে ভুজপাশে বিদ্রূপ হাসে।"

নূতন রূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা আপনার রূপে আপনি বিহ্বল।...

"ক্ষণিক যৌবন বন্যা

রক্তস্রোতে তরঙ্গিয়া

উন্মাদ করেছে মোরে।"

চিত্রাঙ্গদার নূতন কান্তিতে মুগ্ধ হয়ে অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে আহ্বান জানাল—

"এসো এসো যে হও সে হও।"

দুজনের মিলন হল—"কোন্ দেবতা সে কী পরিহাসে ভাসালো মায়ার ভেলায়" কিছুদিন পরে রূপজ মোহের স্বপ্নাবেশে অর্জুনের ক্লান্তি আসে। এময় সময় দস্যু আক্রান্ত গ্রামবাসীর কাছে এক বীরাঙ্গনার নাম শুনে অর্জুন তার সম্পর্কে আগ্রহী হল। অর্জুন বীর্যবতী চিত্রাঙ্গদার চিন্তায় মগ্ন। চিত্রাঙ্গদাকে বলে—

"চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী কেমন না জানি!

চিত্রাঙ্গদা তাকে বোঝায়—"ছি ছি, কুৎসিত কুরূপ সে।

হেন বঙ্কিম ভুরুযুগ নাহি তার

নাহি নিষ্ঠুর সুন্দর রঙ্গ।

নাহি নীরব ভঙ্গীর সঙ্গীতলীলা ইঙ্গিত ছন্দ মধুর।"

কিন্তু নারীর ললিত লোভন লীলায় অর্জুন এখন ক্লান্ত। সে চায় বীর্যবতী চিত্রাঙ্গদাকে—'উদ্যত বজ্রের রুদ্ররসে' যে সুন্দর। চিত্রাঙ্গদা তখন মদনকে তাঁর বর অর্থাৎ তার রূপলাবণ্য ফিরিয়ে দেয়। সে অর্জুনের সঙ্গে মিলিত হয় তাঁর নিজস্ব রূপে—তার সত্য রূপে। সে বলে—

"আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্র-নন্দিনী
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী,
পূজা করি মোরে রাখিবে উর্ধ্বে সে নহি নহি,

হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি,
যদি পার্শ্বে রাখো মোরে সম্পদে বিপদে
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে—
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।...”

চণ্ডালিকা—১৯৩৮

১৩৪০ বা ১৯৩৩-এ রচিত হয় ‘তাসের দেশ’ ও ‘চণ্ডালিকা’ নাটিকা। ‘চণ্ডালিকা’র ভূমিকায় কবি জানিয়েছেন—“রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত নেপালী বৌদ্ধ-সাহিত্যে শার্দূল কর্ণাবদানের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাই থেকে এই নাটিকার গল্পটি গৃহীত হয়েছে।” ‘চণ্ডালিকা’ নাটিকাটি পরে ১৯৩৮-এ নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হয়। নাটিকার প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে—গল্পের ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। প্রভু বুদ্ধ তখন অনাথ পিণ্ডদের উদ্যানে প্রবাস যাপন করছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ একদিন তৃষ্ণার্ত হয়ে এক চণ্ডাল কন্যার কাছে জল যাচঞা করলেন। চণ্ডাল কন্যা, প্রকৃতি তাঁকে জল দিল। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতি তাঁকে পাবার জন্যে তার মা-র সাহায্য চাইল। তার মা জাদু জানত। সে একটি বেদী-প্রস্তুত করে আগুন জ্বেলে ১০৮টি অর্কফুল মন্ত্র পড়ে আহুতি দিল। মন্ত্রের শক্তির জোরে আনন্দ দুর্বল হয়ে পড়লেন এবং তার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। প্রকৃতি যখন তাঁর জন্যে শয্যা প্রস্তুত করতে লাগল তখন আনন্দ পরিতপ্ত হয়ে পরিত্রাণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তিতে সব জানতে পেরে মন্ত্রবলে আনন্দকে মুক্ত করলেন। এই আখ্যান থেকেই চণ্ডালিকা নাটিকা এবং পরে চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য রচিত হয়। মূল কাহিনীর সঙ্গে বেশ পার্থক্য আছে, সে কথা চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের কাহিনী প্রসঙ্গে জানা যাবে।

মানুষে মানুষে জাতিগত ভেদ ভারতের সুপ্রাচীন সমস্যা। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেশে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব এক মহান ঐতিহাসিক ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধির যুগেও এ ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, প্রবল ভাবেই আছে। এ কারণে উদার সমদর্শী বুদ্ধদেবের ধর্ম রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। ওই কাহিনীটিকে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে অনেক পরিবর্তন করে চণ্ডালিকা নাটিকা ও নৃত্যনাট্য রচিত হয়।

১৯৩২-এ রচিত ‘জলপাত্র’ (পরিশেষ) কবিতাটিতে চণ্ডালিকা-র কাহিনীর আভাস, আছে।

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের কাহিনী ঃ—

প্রকৃতি চণ্ডালকন্যা। সে অস্পৃশ্য। ফুলওয়ালা, চুড়িওয়ালা প্রভৃতি সকলেই তার স্পর্শ এড়িয়ে চলে। দেবতার ওপরে তার অভিমান।

একদিন বুদ্ধশিষ্য আনন্দ তৃষ্ণার্ত হয়ে তার কাছে এসে জল প্রার্থনা করে। প্রকৃতি তাকে বলে— ‘ক্ষমা করো প্রভু ক্ষমা করো মোরে

'আমি চণ্ডালের কন্যা
তোমারে দেব জল
হেন পুণ্যের আমি নহি অধিকারী।'
আনন্দ বলে—'যে মানব আমি, সেই মানব তুমি কন্যা,
সেই বারি তীর্থবারি যাহা তৃপ্ত করে, তৃষিতেরে।'

আনন্দ প্রকৃতির হাতের জল গ্রহণ করেছে—এ ঘটনা প্রকৃতির সমস্ত জীবনকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে গেল।

"কী আনন্দ কী আনন্দ কী পরম মুক্তি!
একটি গণ্ডূষ জল—
আমার জন্মজন্মান্তরের কালি ধুয়ে দিল গো
শুধু একটি গণ্ডূষ জল।"

আবেগ উচ্ছ্বাসিত প্রকৃতির মন তাঁর মুক্তিদাতা আনন্দের স্বপ্নে বিভোর।

'আমার কাজ ভোলা মন আছে দূরে, কোন্
করে স্বপনের সাধনা।
... যদি সে আসে, তার চরণ ছায়ে,
বেদনা আমার দিব বিছায়ে,
জানাব তাহারে অশ্রুসিক্ত
রিক্ত জীবনের কামনা।'

পিপাসিত আনন্দের সেই 'জল দাও' প্রকৃতির মনের মধ্যে বেজে চলেছে। প্রকৃতি বলে—'এ নতুন জন্ম নতুন জন্ম আমার।' মানুষের তৃষ্ণা মেটানোর সম্মান পেয়ে সে পেয়েছে তার নব জন্ম।

কিন্তু কী করে আনন্দকে পাওয়া যাবে; শেষ পর্যন্ত মা তাঁর মন্ত্রশক্তি প্রযোগ করে আনন্দকে আনতে রাজি হয়। মা তাঁর শিষ্যদলকে নিয়ে মন্ত্র প্রয়োগ করে, মায়া নৃত্য শুরু করে।—

মন্ত্রশক্তির সঙ্গে আনন্দের সংগ্রাম মায়াদর্পণে দেখতে পায় প্রকৃতি। সে দুর্বল হয়ে পড়ে সাময়িক। কিন্তু আবার সে মাকে উৎসাহ দেয়। শেষ পর্যন্ত নাগপাশমন্ত্র প্রয়োগে আনন্দ সম্পূর্ণ ম্লান ক্লান্ত হয়ে প্রকৃতির কাছে চলে আসে।

প্রকৃতি আনন্দের এই আত্মপরাভবকে সহ্য করতে পারে না। তার জন্য সে অনুতপ্ত হয়। আনন্দকে সে বলে—

"এসেছ উদ্ধারিতে আমায়।
দিলে তার এত মূল্য।
নিলে তার এত দুঃখ।
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো—
মাটিতে টেনেছি তোমারে,
এনেছি নীচে,

ধূলি হতে তুলি নাও আমায়
তব পুণ্যলোকে।”

আনন্দ বলে— “কল্যাণ হোক তব কল্যাণী।”

চিত্রাঙ্গাদা ও প্রকৃতি—উভয়েই অলোকিক উপায় অবলম্বন করে তাদের প্রিয়কে পেয়েছে। কিন্তু এটা প্রেমের মোহগত দিক। চিত্রাঙ্গাদা ও প্রকৃতি উভয়েই তার জন্য অনুতপ্ত। অর্জুনও চিত্রাঙ্গাদার মোহ পাশে বন্ধ না থেকে তাঁর বীর কর্মে ফিরে গেল ; আনন্দও ফিরে গেলেন তাঁর সাধনার জগতে। ছলনার কাছে বীরের পরাভব দেখে চিত্রাঙ্গাদা অনুতপ্ত হয়ে বলেছে—

“শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিও না মিথ্যার পায়ে—
যাও যাও ফিরে যাও।”

আর অলৌকিক উপায়ে আনন্দকে পরাভূত করে তাঁর খণ্ডিত রূপ দেখে প্রকৃতিও অনুতপ্ত। সেও বলেছে—‘ক্ষমা করো, ক্ষমা করো।’

চণ্ডালিকায় রবীন্দ্র প্রতিভার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন তার গীতভাষা। এ ভাষা প্রথাগত পদ্যভাষা নয়—আবার ব্রহ্মসংগীতের ভাঙা গানের গদ্য ভাষাও নয়। চরিত্রোচিত গদ্যভাষার সংলাপকে তিনি সুরবন্ধ করেছেন। তিনি একবার রাণী মহলানবীশকে লিখেছিলেন—‘কখনো কখনো গদ্য রচনায় সুর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ,’—সেই ইচ্ছাই কিছুটা শাপমোচনে (‘অসুন্দরের পরম বেদনায়’) এবং পুরোপুরি চণ্ডালিকায় পূর্ণ হল। চণ্ডালিকা নাটিকা ছিল গদ্যে লেখা। প্রায় সেই ভাষাকেই নৃত্যনাট্যে তিনি সুরবন্ধ করলেন।—

চণ্ডালিকা নাটিকার গদ্য—

মা। কিসের ডাক।
প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে—
‘জল দাও’।
মা। পোড়া কপাল। তোকে বলেছে ‘জল দাও’।
কে শুনি। তোর আপন জাতের কেউ।

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের গদ্য—মা। কিসের ডাক তোর কিসের ডাক।...

প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে—
‘জল দাও’, ‘জল দাও।’
মা। পোড়া কপাল আমার। কে বলেছে
তোকে ‘জল দাও।’ সে কি তোর আপন
জাতের কেউ। ইত্যাদি।

দুটি ক্ষেত্রের তুলনায় দেখা যাচ্ছে নৃত্যনাট্যে গদ্য ভাষা আর গানের ভাষা মিলে যাচ্ছে। এই গদ্যভাষায় সুরপ্রয়োগে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় আছে। ‘ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,’ ‘চান করাতেছিলেম,’ ‘কখন ছাগল তুই চরাবি’— এ সব ভাষাকে তিনি

কাব্য জগতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন চণ্ডালিকায়, যেমন প্রকৃতি উন্নীত হয়েছে মানব মহিমায়।

নৃত্যনাট্যের গান সম্পর্কে সাধারণভাবে যা বলা হয়—চণ্ডালিকার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা বলা যায় যে চণ্ডালিকায় নানা রাগ নানা সুর থাকা সত্ত্বেও সব মিলে পদাবলিকীর্তনের মতো একটি একক গানের সমগ্রতাই এর আসল কথা। 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা'য় আবৃত্তি একেবারেই বর্জিত হয়েছে। চণ্ডালিকায় দু—একটি মন্ত্রোচ্চারণ আছে।

শ্যামা—১৯৩৯

Asiatic Society-কর্তৃক প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal গ্রন্থের 'মহাবস্তুবদান'-এর অন্তর্গত 'শ্যামা জাতক' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ, 'পরিশোধ' নামক কবিতাটি লেখেন ('কথা', ১৩০৬-এর ২৩শে আশ্বিন)। ১৯৩৬ বা ১৩৪৩-এ এই 'পরিশোধ' কবিতার রূপান্তর 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্য কলকাতার আশুতোষ কলেজ হলে অভিনীত হয়। পরে 'পরিশোধ' রূপান্তরিত হয় 'শ্যামা নৃত্যনাট্যে।' 'শ্যামা' অনেকবার অভিনয়কালে কিছু কিছু অদল বদল হয়। দ্বিতীয়বার অভিনয়কালে উত্তীয়-র উপাখ্যান যোগ করা হয়।

মূল কাহিনীতে শ্যামা অগ্রগণিকা এবং বজ্রসেন অশ্ববণিক আর উত্তীয়-র উপাখ্যান নেপথ্যের কাহিনী। ঘটনার বিশ্লেষণে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ 'পরিশোধ'-কবিতায় ও-নৃত্যনাট্যে এবং 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে এ কাহিনীর বহু রূপান্তর ও পরিবর্তন করেছেন। 'শ্যামা'-র যে রূপ বর্তমানে আমরা দেখি—মূল কাহিনীতে তার রূপ অত্যন্ত স্থূল ও অমার্জিত। রবীন্দ্রনাথ নাটকে নাট্যগুণ সৃষ্টি করেছেন, চরিত্রে tragedy-র উপযোগী গুণ আরোপ করেছেন এবং ঘটনায় বৈচিত্র্য এনেছেন।

'শাপমোচন, 'চিত্রাঙ্গদা ও 'চণ্ডালিকা'— মিলনান্ত serious নাটক। কমলিকা ও চিত্রাঙ্গদা শেষ পর্যন্ত তাদের দয়িতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রকৃতিও আনন্দকে পেয়েছে এবং ত্যাগের মধ্য দিয়ে আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু 'শ্যামা, বিশুদ্ধ tragedy নাটক। এ নাটকের নায়ক সবচেয়ে নির্দোষ আদর্শবান চরিত্র, কেবল নিয়তির কারণেই তাকে যাবজ্জীবন দুঃখভোগ করতে হয়েছে। এই নৃত্যনাট্যটি গ্রিক tragedy -র আদলে প্রস্তুত।

'শ্যামা জাতকে'র মূল কাহিনী।—

বজ্রসেন তক্ষশিলার এক বণিকপুত্র। সে অশ্বব্যবসায়ী। একদা ব্যবসাসূত্রে সদলে বারাণসী যাবার পথে দস্যুর আক্রমণে হৃতসর্বস্ব হয়ে সে কোনো ভাবে বারাণসী পৌঁছে এক পরিত্যক্ত কুটিরে আশ্রয় নেয়। রাজপ্রহরীরা তাকে চোর সন্দেহে বন্দী করে এবং রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।

প্রহরীরা যখন তাকে গণিকা পল্লীর মধ্য দিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়—তখন অগ্রগণিকা শ্যামা তাকে দেখতে পায়। বজ্রসেন রূপবান, তাকে দেখে শ্যামা প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে।

ওই গণিকাপল্লীতেই উত্তীয় নামে এক বণিকপুত্র শ্যামার প্রেমার্থী। শ্যামা বজ্রসেনকে

পাবার জন্যে অতি ব্যাকুল। তার জন্যে মুক্তিমূল্য হিসেবে প্রচুর ধনরত্ন এবং পরিবর্তে হিসেবে ওই উত্তীয়কে সমর্পণ করে প্রহরীদের হাত থেকে বজ্রসেনকে মুক্ত করে। প্রহরীরা উত্তীয়কে বন্দী করে হত্যা করে।

বজ্রসেন মুক্তি পায়। শ্যামা ও বজ্রসেন কিছুকাল বিলাসলীলায় জীবন কাটায়। ক্রমে বজ্রসেন উত্তীয়-হত্যার ঘটনা জানতে পারে এবং তারপরেই তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়—শ্যামা হয়তো উত্তীয়ের মতো তাকেও একদিন হত্যা করতে পারে। তাই সে একদিন জল-ক্রীড়া-কালে শ্যামাকে অধিক পরিমাণে মদ্যপান করিয়ে জলের মধ্যে তার কণ্ঠ রোধ করে ডুবিয়ে রাখে এবং মৃত মনে করে দ্রুত পালিয়ে যায় তক্ষশিলায়।

মৃতকল্প শ্যামা অবশ্য রক্ষীদের শুশ্রূষায় বেঁচে ওঠে। তবে তার মনে এক শঙ্কার উদয় হয়—উত্তীয় হত্যার দায়ে তার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। তাই সে এক ছলনার আশ্রয় নেয়। যেন সে উত্তীয়ের শোকে কাতর। সে বিধবার বেশে উত্তীয়েরই পরিবারে আশ্রয় নেয়।

কিন্তু মনের গভীরে তার বজ্রসেনের প্রতি ভালবাসা। কালক্রমে সে একদা তক্ষশিলার এক বণিকদলের কাছে বজ্রসেনের সন্ধান পায় এবং তাকে এক বার্তাও পাঠায়। বজ্রসেন সে বার্তা পেয়ে মনে করে—বুঝি বা শ্যামা তাকে এখনো হত্যার চেষ্টা করছে। তাই সে আরও দূরদেশে পালিয়ে যায়।

এখানেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

শ্যামা নৃত্যনাট্যের কাহিনী—

বজ্রসেন এক সুপুরুষ সৎ রত্নব্যবসায়ী। বহু দেশ ভ্রমণ করে সুবর্ণদ্বীপ থেকে সে এক ইন্দ্রমণির হার সংগ্রহ করেছে—যা সে কোথাও বিক্রি করবে না, যা সে এমন একজনকে দেবে—যাকে বিনামূল্যেই দেওয়া যায়। তারই সন্ধানে সে দেশদেশান্তরে চলেছে।

এদিকে 'চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে ; চোর চাই, যে করেই হোক, হোক না সে যে কোনো লোক।' কোটাল চোর সন্দেহে নির্দোষ বিদেশী বজ্রসেনকে বন্দী করে নিয়ে যায়।

শ্যামা পুরসুন্দরী রাজনটী। সে কিন্তু এখনো তার প্রেমপাত্রকে পায় নি-যার হাতে সে নিজেকে সঁপে দিতে পারে। সে তারই অপেক্ষায় আছে।

বালক কিশোর উত্তীয় শ্যামার প্রেমে মত্ত অধীর। সে তার কামগন্ধহীন কৈশোরের প্রেম দিয়ে মায়াবনবিহারিণী হরিণী শ্যামাকে বাঁধন-বিহীন বাঁধনে অর্থাৎ নিঃস্বার্থ প্রেমে বাঁধতে চায়। তার জন্যে সে তার সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে।

কোটাল যখন বজ্রসেনকে বন্দী করে নিয়ে যায়—শ্যামা তাকে দেখতে পায়। দেবকান্তি পুরুষ, মহেন্দ্র-নিন্দিত-কান্তি, বজ্রসেনকে দেখে সে মুগ্ধ হয়। বজ্রসেনের মধ্যে সে তার সেই মনের মানুষকে খুঁজে পেল—যার হাতে সে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে। এ হেন সুন্দরের বন্ধনকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারল না। সে নগরকোটালকে

ডেকে বজ্রসেনকে ছেড়ে দেবার অনুরোধ জানাল।

শ্যামা যখন বলে,— আছে কি বীর কোনো যে এই অন্যায়ভাবে বন্দী ব্রজসেনকে বাঁচাতে পারে? তখন উত্তীয় বলে—প্রেমের চরম মূল্য দিয়েও সে বজ্রসেনকে বাঁচাতে পারে। "ন্যায় অন্যায় জানিনে। শুধু তোমারে জানি।" শ্যামা তার হাতে রাজ-অঙ্গুরী দিয়ে তাকে শেষ সম্মান জানিয়ে বিদায় দিল। উত্তীয় চলে গেল। সখীরা বলল—'তব মরণের ডোরে বাঁধিলে বাঁধিলে ওরে/অসীম পাপে অনন্ত শাপে/তোমার চরম অর্ঘ্য/কিনিল সখীর লাগি। নারকী প্রেমের স্বর্গ।' গ্রিক নাটকের chorus -এর মতো সখীদের উক্তি যেন এখান থেকেই tragedy-র সুর এনে দিল নাটকে।

উত্তীয় রাজ-অঙ্গুরী দেখিয়ে নিজেকেই অপরাধী ঘোষণা করে বজ্রসেনকে মুক্ত করে নিজের প্রাণ দিল। শ্যামা নিজের অপরাধ বুঝতে পেরে মশানে ছুটে এল নিজের জীবন দিয়ে উত্তীয়কে বাঁচাতে। কিন্তু পারলো না।

শ্যামার বুকের ভেতরে অপরাধবোধ। 'বাজে গুরু গুরু শঙ্কার ডঙ্কা।' সব শঙ্কা মনের মধ্যে চেপে রেখে সে বজ্রসেনের সঙ্গো মিলিত হয়ে প্রেমের জোয়ারে জীবন ভাসিয়ে দিল। কিন্তু tragedy-র নিয়তি বাতাসে সর্বনাশের বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে অজানা অকূলে ভেসে চলেছে দুজনে।

"রঙিন মেঘের তলে
গোপন অশ্রুজলে
বিধাতার দারুণ বিদ্রূপ বজ্রে
সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি হা হা।"

বজ্রসেনের মনে কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—শ্যামা কী মূল্যে তাকে মুক্ত করল। শ্যামা প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু বজ্রসেনের নিরন্তর জিজ্ঞাসার উত্তরে সে উত্তীয়ের আত্মাহুতির প্রসঙ্গা বিবৃত করে। বজ্রসেন আদর্শবান। সে শ্যামার পাপ-মূল্যে কেনা ধিক্কৃত এ জীবনের জন্য শ্যামাকে কলঙ্কিনী বলে তিরস্কার করে এবং আঘাত করে চলে যায়।

এরপর বজ্রসেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। দুই চক্ষুতে তার দাহ। তাকে দেখে পল্লীরমণীদের মনে দুঃখ লাগে। বজ্রসেনের মনে অনুতাপ—যে তার জন্যে এত পাপ স্বীকার করল—আদর্শবাদী বজ্রসেন সেই শ্যামাকেই ত্যাগ করল, যাকে সে ভালবাসল, তাকেই আবার আঘাত করল। তাই সে শ্যামার বিরহে উদ্ভ্রান্ত হয়ে তাকে খুঁজতে লাগল।

সহসা একদিন সে শ্যামাকে দেখতে পায়। শ্যামাও ফিরে আসতে চায়। কিন্তু বজ্রসেন তাকে গ্রহণ করতে পারে না। ভালো আর মন্দ—সবকিছুকে এক সঙ্গো বজ্রসেন মেনে নিতে পারল না। সে নীতি-আদর্শ আর প্রেমের মধ্যে দ্বন্দ্বকে মেটাতে পারল না। সে শ্যামাকে ফিরিয়ে দিল। শ্যামা তাকে শেষ প্রণাম জানিয়ে চলে গেল।

কিন্তু বজ্রসেন? তার সুখ কোথায়? নীতি-আদর্শে, না প্রেমে? তার জীবনের tragedy এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ বড়ো করে দেখিয়েছেন। উত্তীয় তো প্রেমে সর্বস্বত্যাগ

করে সুখী হয়েছে। শ্যামা দুঃখী হয়ে, জীবনমঞ্চ থেকে সরে গেল। সে জানত, সে অপরাধী, তার অপরাধের শাস্তি বিধাতার হাতে হবে। আর 'যে অভাগিনী পাপের ভারে, চরণে তব বিনতা'—তারও তো সান্ত্বনা থাকে। প্রেমের জন্যে সে যা করেছে—সে পাপ বিধাতা ক্ষমা করবেন। কিন্তু বজ্রসেনের tragedy তো সব সান্ত্বনার অতীত। বিধাতা যাকে ক্ষমা করতে পারেন বজ্রসেন তাকে ক্ষমা করতে পারল না। তার এই ক্ষমাহীনতা ? সে তো ক্ষমার অযোগ্য।

"ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা
পাপীজন শরণ প্রভু।"

এ নৃত্যনাট্যের গান সম্পর্কেও এ কথা বলা যায় যে সব গানগুলিই, বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, একটি সমগ্র গীতপ্রবাহ সৃষ্টি করেছে। এখানেও পদাবলী কীর্তনের আদর্শ অনুসৃত হয়েছে।

নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'ঃ—

শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'-কে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। গীতবিতানের 'গ্রন্থপরিচয়' অনুযায়ী "পাণ্ডুলিপি দেখিয়া মনে করিবার কারণ আছে যে রচনা একরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত সাক্ষ্যে এরূপ জানা যায় যে ১৩৪৪ অগ্রহায়ণে এই নৃত্যনাট্যের কল্পনা ও রচনা শুরু হয়।...শান্তিনিকেতন আশ্রমে ইহার অংশবিশেষ অভিনীত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্যের অভিনয় কখনোই হয় নাই।" ...'মায়ার খেলা' "গীতিনাট্যের সহিত বর্তমান নৃত্যনাট্যের তুলনা করিলে রবীন্দ্রনাথের কবি ও শিল্পী মানসের বিস্ময়কর পরিণতির কিছু আভাস পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। হয়তো ইহাও বুঝা যাইবে কেন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলানোর জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্যে। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন।'...'যে ছিল আমার স্বপন চারিণী'—এই গানটি 'আমি কারেও বুঝিনে, শুধু বুঝেছি তোমারে' গানের রূপান্তর ; নূতন সৃষ্টিই বলা চলে। ইহাতে 'পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলানোর জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য' এ উক্তির অর্থ বুঝা যায়।"

একথা কিছু পরিমাণে সত্য হলেও নৃত্যনাট্যে যে ঘটনার ঘনবন্ধ ক্রিয়াশীলতা বা নাটকীয়তা থাকা স্বাভাবিক—তা 'মায়ার খেলা নৃত্যনাট্যে' নেই। 'জীবনস্মৃতি'তে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য সম্পর্কে যে বলা হয়েছে—'ঘটনা স্রোতের উপর তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ'—সে ক্ষেত্রে নৃত্যনাট্যরূপে হৃদয়াবেগ সামান্য কমলেও, নৃত্যনাট্য-সুলভ প্রয়োজনীয় ঘটনাস্রোত আসেনি। 'রূপ' এসেছে কিন্তু নাট্যগুণের কিছু বৃদ্ধি হয়নি। তাই 'যে ছিল আমার স্বপনচারিনী' গান হিসাবে আদৃত হলেও 'মায়ার খেলা' নৃত্যনাট্য শৈলজারঞ্জনের প্রচেষ্টায় 'সুরঙ্গামা', 'গীতবিতান' ও 'রবিরঞ্জনী'র উদ্যোগে

৩/৪ বার উপস্থাপনা সত্ত্বেও নাট্যগুণের অভাবেই দর্শকচিত্তে প্রভাব ফেলতে পারেনি। এবং আজ পর্যন্ত অন্যান্য নৃত্যনাট্য বহুবার মঞ্চস্থ হলেও 'নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা' মঞ্চস্থ হয় না।

(ণ)

এর পরে রবীন্দ্রসৃষ্টিতে নৃত্যপ্রয়োগের আর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। নটরাজ কি তবে রবীন্দ্রনাথকে ত্যাগ করলেন? না, প্রকাশে যাঁর ছন্দ, ধ্যানে তাঁর ছন্দাতীত স্তব্ধতা; রবীন্দ্রনাথ আপন জীবনে সেই গভীর স্তব্ধতার সাধনায় বসলেন। 'শেষ সপ্তকে'র সাত সংখ্যক কবিতায় কবি বলছেন—

"...মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছৃত হয়ে উঠছে সৃষ্টি
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।
প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য,
তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচল আনন্দে।
হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ওই সন্ন্যাসের দীক্ষা।..."

যজ্ঞে দিয়েছ ভার

(ক)

গীতায় বলা হয়েছে সৃষ্টিকর্তা দেবতা সৃষ্টি করলেন এবং তার সঙ্গে মানুষও সৃষ্টি করলেন। আর এ দু'এর মধ্যে সংযোগের পথও করে দিলেন—যজ্ঞ। বলা হল যজ্ঞ (যজ্ঞধূম) থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে খাদ্য এবং খাদ্য থেকে দেহ-এর উৎপত্তি ও পুষ্টি। যজ্ঞ হল স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে সংযোগসূত্র।

> 'এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে সংবর্ধনা কর এবং দেবতাগণও তোমাদিগকে বৃষ্ট্যাদি দ্বারা শস্যাদি উৎপাদন পূর্বক অনুগৃহীত করুন। এই রূপে পরস্পরের ভাবনা দ্বারা তোমরা পরম মঙ্গল লাভ করিবে।'
>
> -গীতা ৩/১১ (উদ্বোধন)।

সুতরাং যজ্ঞ হচ্ছে দেব ও মানবের যোগসূত্র। ঈশ্বরের বিশ্বপরিচালনে, সুতরাং, যজ্ঞের ভূমিকা নগণ্য নয়। জগতের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে, জীবের সুখসমৃদ্ধির জন্যে, এ যজ্ঞের প্রয়োজন। যজ্ঞ বহুবিধ, অগ্নিহোত্র, জ্ঞানযজ্ঞ, অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি। যজ্ঞ সম্পর্কে বিবরণ যজুর্বেদ, গীতা-র 'কর্মযোগ', ছান্দোগ্য-মুন্ডকাদি উপনিষদ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে আছে। বলা হয়েছে জীবের সুখসমৃদ্ধির জন্য যজ্ঞের প্রয়োজন। এই পার্থিব দিকটি ছাড়াও যজ্ঞের অন্যতর ভূমিকা আছে। যজ্ঞ যদি ঈশ্বরাভিমুখী বা 'বহুজন হিতায় বহুজনসুখায়' হয় তবে তা যজমান ও পুরোহিতকে অপার্থিবে উন্নীত করে। তবে অবশ্যই সে যজ্ঞে অকপট নিঃস্বার্থ সত্যনিষ্ঠা থাকা দরকার। মুনি বাজশ্রবসের যজ্ঞে কপটতা ছিল। তাই তাঁর পুত্র নচিকেতাকে যমালয়ে গিয়ে পিতার জন্যে যমরাজ-এর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয়। (কঠ উপনিষদ)।

'জীবনের কর্মমাত্রই যজ্ঞ। যজ্ঞের মূল অর্থ ত্যাগ ; ত্যাগের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারই ভোগ কর্তব্য। ইহাই হবিঃশেষ ভোজন, অতএব অমৃতভোজন।' (পুরুষ যজ্ঞ, যজ্ঞকথা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)।

ঈশ উপনিষদের প্রথম শ্লোকেই একথা জানানো হয়েছে—'মা গৃধঃ।' লোভ নয়—ত্যাগ। 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।' এই শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সমগ্র সাহিত্যে এর প্রভাব আছে।

কিন্তু পুরাকাল থেকেই যাজক-পুরোহিতের স্বার্থবুদ্ধির কারণে যজ্ঞ ব্যাপারটি যজমানকে শোষন করার উপায় হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে দেশে নাস্তিক বার্হস্পত্য ভাবনা এবং জৈন-বৌদ্ধ-আদি ধর্মের উদ্ভব হয়েছে।

গীতা-উপনিষদে যজ্ঞকে প্রধানত দুভাগে দেখানো হয়েছে,— জ্ঞান ও কর্মের মধ্য দিয়ে। পার্থিব জগতের সৃজনে যেমন, পরিচালনেও তেমনি যজ্ঞকে অপরিহার্য মনে করা হয়েছে।

(খ)

'যজ্ঞ' ব্যাপারটি বৈদিক সভ্যতার দান। যজুর্বেদ নানা প্রকার যজ্ঞ কর্মাদির বিধান ও প্রার্থনাদিতে ভরা। সব কর্মকেই সত্য-অভিমুখী করার কথা বলা হয়েছে। শারীরিক, মানসিক, ব্যক্তিক ও সামুদায়িক উন্নতির জন্যই যজ্ঞ করা হয়ে থাকে।

যজুর্বেদ-এ বিভিন্ন যজ্ঞের কথা আছে। যজুর্বেদ-এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> 'মানুষ প্রথমে জ্ঞানবিচার করে, তারপর সেই বিচারকে কার্যে পরিণত করে। সেই কার্য বা কর্মের সোপান আরোহণের দিকে যজুর্বেদ মানুষকে প্রেরিত করে। কর্ম করার নির্দেশ বা প্রক্রিয়া—'দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে।' (হে সকলের স্রষ্টা দেব, তুমি সকলকে শ্রেষ্ঠ কর্মে প্রেরিত করো।) —'চারোঁ বেদ' ডা. উমেশ পুরী।

তবে যজ্ঞ ব্যাপারটা প্রায়ই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি (এবং অন্যের ক্ষতিসাধনের) কাজে ব্যবহৃত হত। যেমন, ভাগবতে আছে—দেবরাজ ইন্দ্র একবার আপন অহংকারের মত্ততায় গুরু বৃহস্পতিকে অসম্মান করে বসলেন। বৃহস্পতি দেবকুলের প্রতি অপ্রসন্ন হলেন। সেই সুযোগে অসুরেরা দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গ অধিকার করে বসল। তখন ব্রহ্মার পরামর্শে, ত্বষ্টাঋষির দৈত্য-কন্যা-গর্ভ-জাত পুত্র বিশ্বরূপকে দেবতারা স্বর্গের পুরোহিত পদে বরণ করল। এই বিশ্বরূপ যদিও দেব-দৈত্য-জাত সংকর, তবু সে দেবতাদের সঙ্গেই যোগ দেওয়ায় দেবতারা ক্রমশ আপন শক্তি পুনরুদ্ধার করল। তবে প্রত্যক্ষত দেবতাদের সহায়তা করলেও গোপনে গোপনে যজ্ঞাদির ফলভাগ অসুরদেরও দিচ্ছিল সে। ফলে অসুররাও বলবান হচ্ছিল। দেবরাজের কানে এখবর পৌঁছালে দেবরাজ ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বরূপকে বধ করেন।

বিশ্বরূপের বাবা ঋষি ত্বষ্টা আদিত্য চুপ করে থাকবেন কেন? তিনি ইন্দ্রকে মারবার জন্যে যজ্ঞ শুরু করলেন। এবং পেয়েও গেলেন বৃত্রাসুরের মতো বলবান পুত্র।

এরপরে দধীচির অস্থি থেকে নির্মিত বজ্রে ইন্দ্র নিধন করলেন বৃত্রাসুরকে এবং এই ব্রহ্মহত্যার পাপমোচন করার জন্যে ইন্দ্রের আবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হল।

চক্রবর্তী সম্রাট হবার জন্যে দুষ্যন্তপুত্র ভরত গঙ্গাসাগর থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত ৫৫ বার এবং প্রয়াগ থেকে যমুনোত্রী পর্যন্ত ৭৮ বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। উপরন্তু মনোমত এক পুত্রলাভার্থে মরুৎ সোম নামক এক যজ্ঞও করেন। ('সুখসাগর' ২০ অধ্যায়, নবম স্কন্ধ।)

এ সব যজ্ঞ যথার্থ ধর্মসাধনে অপ্রয়োজনীয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-"জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।' 'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥' (গীতা/জ্ঞানযোগ-৪/৩৩)।

যজ্ঞকে এমন সংকীর্ণার্থে ব্যবহারের ফল সম্পর্কে একটি কৌতুককর উদাহরণ আছে ছান্দোগ্য উপনিষদের দ্বাদশখণ্ডে।

অধ্যাত্ম ভাবনা বর্জিত, অর্থলিপ্সু, যজ্ঞার্থী ব্রাহ্মণদের দৃষ্টান্তে কুকুরদেরও সামগানের আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। —একটি সাদা কুকুরকে অন্যান্য কুকুরেরা বলল-'আমরা যাহাতে খাদ্য পাই সেইজন্য সাম গান কর ; আমরা ক্ষুধার্ত।' পরদিন সাদা কুকুরটি এবং অন্যান্য কুকুরেরা পরস্পর-সংলগ্ন উদ্‌গাতাদের অনুকরণে, এক কুকুর অন্য কুকুরের লাঙুলে মুখ দিয়ে গাইতে শুরু করল ওম্ অদাম (ভোজন করি) ; ওম্ পিবাম (পান করি) ; ওম্ দেবঃ বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা অন্নম্ ইহ আহরৎ (দেব বরুণ প্রজাপতি সবিতা, এখানে অন্ন আহরণ করুন)। অন্নপতে অন্নম ইহ আহর, ওম্ ইতি (হে অন্নপতি সূর্য, এই স্থানে অন্ন আহরণ করুন, আহরণ করুন)। (ছান্দোগ্য-১/১২/৫।)

'এই কৌতুক নকশায় সারিবন্ধভাবে যে পুরোহিত সকল যজ্ঞের সময় শুধু দান দক্ষিণার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সামগান করে তাদের বিদ্রূপ করা হয়েছে।' (দর্শনদিগ্‌দর্শন-রাহুল সাংকৃত্যায়ন।)

যজ্ঞের অপব্যবহার হলেও এর উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না। সমস্ত প্রার্থনা, ইহ ও পর-উভয় লোকের জন্যই, যজ্ঞার্থীকে প্রস্তুত করত। যজ্ঞকে মাধ্যম করে মানুষ ইহজগতেও পরলোকের অমর মহিমালাভ করত।

(গ)

যজুর্বেদ-এর একটি প্রার্থনা উল্লেখ করি। —যজু-২২/৩৩-এর 'আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং স্বাহা' শ্লোকে বলা হয়েছে—'আয়ু বৃদ্ধি হোক, প্রাণ বৃদ্ধি হোক, অপান, ধ্যান, উদাম, সমান, বায়ু পুষ্ট হোক। চক্ষু শ্রবন্-বাক্ মনঃ আত্মা, আত্মজ্যোতি, স্বর্গপ্রাপ্তি, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি এ সবের জন্যেও আহুতি দেবার কথা আছে। সব যজ্ঞই এ ধরনের পবিত্র প্রার্থনায় পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় প্রার্থনা—

পিতা নোহসি পিতা নো বোধি
নমস্তেহস্তু মা মা হিংসীঃ।
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব
যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব॥
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

যজুর্বেদের (শুক্ল) এ পঙ্‌ক্তিগুলি রবীন্দ্রনাথের গানে আছে
'তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা বলে যেন জানি,
তোমায় নত হয়ে যেন মানি, তুমি কোরো না কোরো না রোষ।
হে পিতা, হে দেব, দূর করে দাও যত পাপ যত দোষ—

যাহা ভালো তাই দাও আমাদের যাহাতে তোমার তোষ।
তোমা হতে সব সুখ হে পিতা তোমা হতে সব ভালো
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা, তোমাতেই সব ভালো—
তুমিই ভালো হে, তুমিই ভালো, সকল-ভালোর সার
তোমারে নমস্কার হে পিতা, তোমারে নমস্কার।' (পূজা-৩৯২)

(ঘ)

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্য সর্বদাই শ্রেষ্ঠ কর্মের অভিমুখী ছিল—প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে।

যজ্ঞের ভার বিধাতা প্রদত্ত—রবীন্দ্রনাথ সে ভার বহনের যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা-সাধনা করেছেন, গীতবিতানের গানগুলিতে তার পরিচয় আছে। প্রথম গানটিতে ঈশ্বরের দেওয়া 'সুরের গন্ধ ঢালা' মালা তিনি পেয়েছেন,—তার সঙ্গে পেয়েছেন সারা জীবন গানের ডালা বহনের দায়িত্বও। সে দায়িত্ব অর্থাৎ গান গাওয়া কি সহজ? গুণীর কণ্ঠের গানকে আয়ত্ত করার প্রয়াস আছে পূজা-৪ সংখ্যক গানে-

'মনে করি অমনি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।' (পূজা-৪)

'সুরের গুরু'র কাছে সুর ভিক্ষা আছে পূজা-২ সংখ্যক গানে। সুরের ঝরনাধারার ধারে বাসা বাঁধতে চাইছেন কবি—পূজা-৩ সংখ্যক গানে।

রত্নাকর>বাল্মীকিকে একদা গান বাঁধবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বাল্মীকি বুঝেছিলেন, ঈশ্বরের যজ্ঞে বাঁশি বাজানো সহজ কাজ নয়।

...অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।" —('ভাষা ও ছন্দ')

আমাদের গীতবিতানের কবিকেও সুরের সাধনায় দিনরাত মগ্ন থাকতে হয়েছে। সুরকে আহরণ করতে হয়েছে মন্দাকিনীর ধারা উষার শুকতারা, কনকচাঁপার কাছ থেকে। সইতে হয়েছে সাধকের কৃচ্ছ্রসাধনার বেদনা। বাল্মীকিরই মতো।

—'শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে
অশান্তি যে আঘাত করে তাইতো বীণা বাজে।' (পূজা-১)

এ বিশ্বের তাবৎ বেসুরকে সুরে ভরিয়ে তুলতে হবে।

'তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।' (পূজা-২)

বিপুল বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয় এক বিরাট যজ্ঞ-স্বরূপ এবং এ যজ্ঞকে রবীন্দ্রনাথ আনন্দযজ্ঞ বলেছেন। নিজেকে এই যজ্ঞকাণ্ডে অংশীদার মনে করেছেন। এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে তাঁর গানেও।—

'আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান।' তাঁর প্রার্থনা 'দিয়ো তোমার জগৎ সভায় এইটুকু মোর স্থান॥'

"...নিশায় নীরব দেবালয়ে তোমার আরাধন
তখন মোরে আদেশ কোরো গাইতে হে রাজন।" (পূজা ২৩)

'পূজা' পর্যায়ের ১ থেকে ৩২ সংখ্যক গানে ঈশ্বরের সঙ্গো কবির গানের সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বর কবিকে যেন তার প্রতিনিধি নিয়ুক্ত করেছেন, সমস্ত জগতের সমস্ত বেসুর-বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্যে। বিশ্বস্রষ্টা নিজে আসেন যুগে যুগে ধর্মের গ্লানি দূর করতে, অধর্মের অভ্যুত্থান রোধ করতে ; দুষ্কৃতীর বিনাশ ও সাধুজনের পরিত্রাণের জন্য— তার সঙ্গো সঙ্গো কবিকেও আসতে হয়। এ কল্যাণ কর্মকে তো যজ্ঞ বলতেই হয়। জগদ্ব্যাপী পৌষফাগুনের দুঃখ-সুখের পালায় চিরজীবন কবিকে গানের ডালা বইতে হবে। ঈশ্বরের প্রতিনিধি শুধু নয়, তিনি তাঁর শিষ্য। ঈশ্বরের কাছে তাঁর সুরের ভিক্ষা ও দীক্ষা। সেই অমলিন সুর যা অমলিন প্রকৃতিতেই রয়েছে, সহজরূপে। আর সেই সুরের ধারায় জগতের মালিন্য দূর করার ভার নিয়েছেন কবি।—যেখানে—

'...কোলাহলের বেগে ঘূর্ণি ওঠে জেগে,
নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানে পরীক্ষা।' (পূজা-২)

ঈশ্বরের সুরে সুরে সুর মেলাতে চেয়েছেন, নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছেন পূজা-১২ ও ১০৯ সংখ্যাক গানে—

'আমার বেলা যে যায় সাঁঝবেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।'
'...আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে।'

আপন সত্তা, অহং, আত্মবোধ ত্যাগ করে বিশ্বের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিতে চাইছেন।—

"বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি আশে।।' (পূজা-৩৩৯)

গানের সুরেই কবির মুক্তি। এই মুক্তি বিশ্বের বাইরে নয়—'সর্ব জনের মনের মাঝে।' 'দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা' এ যজ্ঞের মন্ত্র। এ যজ্ঞ কর্ম বিধাতার আনন্দের উৎসার, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। কবিও সেই যজ্ঞে নিজেকে যুক্ত করেছেন।—

'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ,—
ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন॥...
...তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি,
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্নাহাসি।' (পূজা-৩১৭)

(৬)

আমাদের স্বার্থাভিমুখী যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি একসময় আরম্ভ হয়, আবার একসময় তার আগুন যায় নিভে। বিশ্বধাতার যজ্ঞশালার অগ্নিশিখা তো কখনো নেভে না। সে যজ্ঞে

জীবনাহুতিরও বিরাম নেই। তাই প্রশ্ন আসে Progress? না Perfection? প্রগতি অথবা পূর্ণতা? কোথায় চলেছে প্রবহমান বিশ্ব? রবীন্দ্রসাহিত্যে বারবার পূর্ণতার কথা এসেছে, আবার এসেছে প্রগতির কথাও।—

'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মূহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই পবিত্র সদাই।' (বলাকা-৮)

'পূর্ণ' শব্দটির সম্পর্কে আমাদের যা ধারণা, ভারতীয় চিন্তায় তা অন্যরূপ। সেখানে পূর্ণ থেকে কিছু বিয়োগ হয় না, হলেও পূর্ণ পূর্ণই থাকে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।। (বৃহদারণ্যক—৩৩১)। 'বলাকা'-র এ পংক্তিটি রবীন্দ্রনাথের এ উক্তিটি ভারতীয় চিন্তারই অনুসৃতি। চলমানতা বা প্রগতি সেখানে থামে না। থামলেই বিপর্যয়।

'হে বিরাট নদী।...
...যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তি ভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পূজ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;.... (বলাকা-৮)

মহাকালের রথের চাকা থামে না।

'...চারদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনে রাত্রে।
অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ,—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙন-গড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা।...'(শেষ সপ্তক ৪)

কিন্তু আমরা কি ক্লান্ত? ক্লান্তির কথা এলেই তো পূর্ণতায় বিরামের কথা আসে মনে। হিন্দু দর্শনে কল্প থেকে কল্পান্তরে যাওয়া আছে, কিন্তু তা অবিরাম। —চরৈবেতি।

'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?
...ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে। —(পূজা, ৬০৬)

এই অন্তহীন বিশ্বযজ্ঞের বাঁশি বাজাবার ভার পড়েছিল যাঁর ওপরে তিনি তো ক্লান্ত হননি। তাঁর 'কান্নাহাসির' গানগুলির মধ্যেই প্রগতি আর পূর্ণতার কথাও গাঁথা আছে। আমাদের সাধারণ জীবনে—

'অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়।।'

কিন্তু বিশ্বধাতার মহাবিশ্বে

'...রয়েছে কত শশীভানু
হারায় না কভু অণুপরমাণু... ॥' (পূজা-৫৯৫)

রবীন্দ্রনাথ সে মন্ত্রে দীক্ষিত,—আমাদের সে মন্ত্র শুনিয়েছেন তাঁর গীতবিতানের ছত্রে ছত্রে।—

'...সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে
তবে নাহি ক্ষয়, সবই জেগে রয়
তব মহা মহিমায়।... (পূজা-৫৯৫)

(চ)

গীতবিতানের 'ভূমিকা'তেই রয়েছে 'প্রকাশপিয়াসী ধরিত্রী'-র কথা। তমসা থেকে জ্যোতিতে 'অবাক আলোর লিপি'-র আবির্ভাব। এ আবির্ভাব সম্পূর্ণই দ্বন্দ্বচালিত। 'অন্ধকারের উৎস হতে'ই সে আলোর উৎসার। গীতবিতানের প্রথম গানটিতেই (পূজা-১), প্রথম শব্দটিতেই রয়েছে এ দ্বন্দ্বের কথা। —এই 'কান্না-হাসির' দোলের কথা। অন্য গানে আছে 'নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু। 'সাদা কালোর দ্বন্দ্বে' অন্তরতল মন্থন করা যে অমৃত— সেই তো জীবনধারাকে 'চরৈবেতি'-র মন্ত্রে চালিয়ে নিয়ে যায়। এখানেই আমরা পেয়ে যেতে পারি প্রগতি ও পূর্ণতার সঙ্গতি।

আমাদের কাছে মৃত্যু অর্থ শেষ, সবকিছু থেমে যাওয়া। আসলে মৃত্যুই জগৎপ্রবাহ, মৃত্যুই সংস্কৃতি। 'শেষ সপ্তকের' ৪৯ সংখ্যক কবিতায় মৃত্যু বলছে—

...'আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণ ক্ষেত্রে।'
'...আমি সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে এসেছি
অন্তহীন নবনব অনাগতে।'

গীতবিতানের গানে আছে—

...'মরণ বলে আমি তোমার
জীবনতরী বাই।' (পূজা-৫৯৩)
...'মৃত্যু আপনপাত্রে ভরি
বইছে যেই প্রাণ—
সেই তো তোমার প্রাণ।' (পূজা-৩৫৪)

জীবনযজ্ঞের অগ্নিদাহে ক্লান্তি আসে। মনে হয় কালের রথযাত্রার চাকা কি কখনো থামবে না?

"পথের শেষ কোথায় কী আছে শেষে?
এত কামনা, এত সাধনা, কোথায় মেশে?"

এ কি গন্তব্যহীন অনিকেত অন্ধকারে দিশাহারা হওয়া?

"...ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার, সম্মুখে ঘন আঁধার,
পার আছে গো ? পার আছে ? পার আছে কোন্ দেশে ?
কী আছে শেষে ?'... 'হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে।।"

এ গানে কবি সত্যই অপূরণীয় নৈরাশ্যে আক্রান্ত। 'হাল ভাঙা পাল ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে।' এই অনন্ত সংশয়, হতাশা সত্ত্বেও কবি কিন্তু একটি দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।—

'...আজ ভাবি মনে মনে
মরীচিকা অন্বেষণে (হায়) বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই—
মনে ভয় লাগে সেই...।' (সঞ্চারী)

এই তৃষ্ণাই প্রগতির পথে চালিত করে। এই তৃষ্ণাই 'চরৈবেতি' মন্ত্রের উদ্দীপক। সমগ্র সভ্যতা, সমগ্র জীবন—এই তৃষ্ণার তাড়সেই এগিয়ে চলেছে। তৃষ্ণাই যতদিন আমাদের চালক—ততদিন তৃপ্তি নেই, ততদিনই নিরুদ্দেশের নিরাশ্বাস। ততদিনই মনে ভয় লাগে হালভাঙা পালছেঁড়া ব্যথা বুঝি কেবল অনিকেত নৈরাশ্যেই নিয়ে যাবে।

তৃষ্ণা কি কেবলই নেতিবাচক ? নিরুদ্দেশের ইঙ্গিত ?

('পথের শেষ কোথায়' গানটির গীতবিতানস্থ যতিবিন্যাস ও স্বরবিতান অনুযায়ী গায়ন-নির্দেশে পুনরাবৃত্তি গত কিছু অর্থবিভ্রম আছে।)

রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই বলেছেন 'নিরুদ্দেশের পথিক', যিনি নিরন্তর এইভাবে সুদূরের পিয়াসী করে তুলেছেন মানুষকে। তৃষ্ণাকে নেতিবাচক ভাবলেই চিরতরে থেমে যাওয়া। একে মুক্তির প্রেরণাও তো ভাবা যেতে পারে। 'আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলি হয়েছে বোঝা।' কিন্তু—

'তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার
করিয়া দিয়েছ সোজা।' (পূজা ১০০)

এভাবে দেখলে তৃষ্ণা নেতিবাচক নয়। তখন পথ চলতে আনন্দ। 'পথে চলা সেইতো তোমায় পাওয়া।' (পূজা ৫৬৪) এই নিরন্তর পথচলার পথিক হতে পারলে যাত্রাকে আর 'মরীচিকা-অন্বেষণ' মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাই পেরেছিলেন বলেই বলতে পেরেছিলেন—

'...হে মহা পথিক,
অবারিত তব দশদিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইক চরম পরিণাম ;
তীর্থতব পদে পদে ;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে।'.....

(পরিশেষ-পান্থ)

এখানেই রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার মর্মগত ক্লান্তিকে উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন।

অবিরাম সংসৃতিতে কল্পান্তরের 'ক্ষণিক' বিরাম আছে বটে তবে তা ওই 'পুরানো

আবাস ছেড়ে' নতুন ঘরে যাওয়া (বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়...)। 'পূজা' পর্যায়ের শেষ গানটি —

'আজকে মোরে বোলো না কাজ করতে' — গানটিতে কবি বলেছেন-

'যাব আমি দেখাশোনার নেপথ্যে আজ সরতে
ক্ষণিক মরণ মরতে।'

এ মরণ নেতিবাচক বিয়োগান্ত কিছু নয়। কারণ তার পরেই তিনি বলেছেন—

'অচিন কূলে পাড়ি দেবো, আলোক লোকে জন্ম নেবো।
মরণরসে অলখঝোরায় প্রাণের কলস ভরতে।।'

'আলোকলোকে জন্ম নেবো'— 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' নয় কি? 'মরণ রসে' প্রাণের কলস ভরা— এও তো 'মৃত্যোর্মামৃতম্ গময়' এরই ভাষান্তর। আর 'মরণরস' কথাটি কী অপূর্ব! এর মধ্যে মৃত্যু কোথায়? 'প্রেম' পর্যায়ের ১৮০ সংখ্যাক গানে—'মরণ-রস'-এর সংজ্ঞা আছে—

'সব শূন্যকে সে অট্টহেসে দেয় যে রঙিন করে।।'

'পথের শেষ কোথায়' গানটির এই হতাশা অন্য গানে দেখা যায় না। সর্বত্রই যেহেতু দ্বন্দ্ব আছে সেহেতু দুর্দৈবও আছে। ভেতরকার 'চরৈবেতি'। দুর্দমনীয় চলা—সব দুর্দৈবকে পার হয়। কালের যাত্রার ধ্বনি এই দ্বন্দ্বেরই রথনির্ঘোষ। অন্ধকার ভবিষ্যত অনিশ্চিত, অপরিচিত, অচেনা—কিন্তু তা অনিকেত নয়। 'অচেনাকেই চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে' (পূজা ৫৯০)। সুতরাং Dark night of the Soul ভারতীয় চিন্তায় এবং রবীন্দ্রসৃষ্টিতে নেতিবাচক নয়।

'রথে চড়ে চলেছে কাল ;
পদাতিক পথিক চলতে চলতে
পাত্র তুলে ধরে,
পায় কিছু পানীয় ;—
পান সারা হলে
পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে ;
চাকার তলায়
ভাঙা পাত্র ধুলায় যায় গুঁড়িয়ে।' (শেষ সপ্তক-৪৩)

কাল ও দেশ অনাদি অনন্ত। তারই একটি সীমাঘেরের মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই রবীন্দ্রনাথের নানান ভাবনা, নানান অভিজ্ঞতা। কত দুঃখ-আঘাত, কত আনন্দসংবাদ নিয়েই নানা রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। তবু এক জীবনে কি কালকে ধরা যায়? অনাদি-অনন্ত দেশ কাল তো সাদি-সান্ত দেশকালের খণ্ডগুলির সমষ্টি। তাই কালের ডাকে সাড়া দিতেই হয়।

"উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ওই-যে তিনি, ওই-যে বাহির পথে।।" (পূজা-১৮৩)

এ তো নির্দিষ্ট তিথি-বাঁধা সীমাবন্ধ কালের রথোৎসব নয়। যা চলিষ্ণু, যা গতিশীল,

তাই জগৎ, তাই জগন্নাথ। এ রথযাত্রা চলছে আবহমান কাল ধরে। এই তো মহাকালের যাত্রা। এর সঙ্গে আমরা সবাই জড়িত।

'আয়রে সবে টানতে হবে রশি
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি।
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাঁই করে তুই নেরে কোনো মতে॥ (পূজা-১৮৩)

এরই রথচক্রের ধ্বনিকেই আমরা কখনো কখনো 'হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা' বলে মনে করেছি। কিন্তু এ রথযাত্রায় তো যোগ না দিয়ে উপায় নেই। কালের আহ্বান কে উপেক্ষা করতে পারে?—

..."ওই যে চাকা ঘুরছে ঝন্‌ঝনি
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি?
রক্তে তোমার দুলছে না কি প্রাণ!
গাইছে না মন মরণজয়ী গান?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মতো?
ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে?"

তৃষ্ণা বা মরীচিকা-অন্বেষণ—এ গানটিতে এসে অন্যরূপ নিয়েছে। 'আকাঙ্ক্ষা' 'বন্যাবেগের মতো' ছুটে চলেছে 'বিপুল ভবিষ্যতে'-র দিকে। এই ভবিষ্য Progress এবং Perfection -কে মিলিয়ে দিয়েছে সমার্থকতায়।

যে 'পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে'—
তাকেই আবার ফিরে পাই।—
"..... পিছনে পিছনে
নতুন পাত্র নিয়ে যে আসে ছুটে,
পায় নতুন রস,
একই তার নাম
কিন্তু সে বুঝি আর-একজন।"
—(শেষ সপ্তক-৪৩)

'চণ্ডালিকা' নাটকে 'পথের শেষ কোথায়' গানটির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে 'প্রকৃতি'র অনুতাপ। তারই সীমাহীন তৃষ্ণার ('বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই') পরিণামে 'আনন্দ'-এর আদর্শচ্যুতি। ক্লান্ত, ম্লান, ম্রিয়মান 'সুদূর স্বর্গের আলো' 'আনন্দ'-এর অবমানিত আবির্ভাবে ('আত্মপরাজয়ের কী প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে এল আমার দ্বারে। মাথা হেঁট করে এলো।) অনুতপ্ত 'প্রকৃতি'। মহামানবদের ইতিহাসে দেখি মানুষের অনন্যচিত্ত প্রার্থনার পরিণামে দেবতা আসেন তাঁর স্বর্গ থেকে নিম্নভূমে নেমে, নিজহস্তে বহন করে আনেন উপহার— ('যোগক্ষেম বহাম্যহম্')। 'আনন্দে'র ক্লান্তি বা 'হাল ভাঙা পাল ছেঁড়া' নৈরাশ্য এখানেই পায় সার্থকতা।

সমসাময়িক (১৯৩৩) আরো দুটি নাটকের গান বিশ্লেষণ করে দেখছি—'নিরুদ্দেশের'

যাত্রা কোনো 'তিমির গুহাতলে' লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। 'তাসের দেশ'-এর 'হেরো সাগর ওঠে তরঙ্গিয়া' গানটির সঞ্চারী ('যাচ্ছি অজানায়') সার্থক হয় আভোগের শেষে—'ভিখারি মন ফিরবে যখন ফিরবে রাজার মতো।।'

'বাঁশরী' নাটকের সোমশংকরের গানে (ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা) এই নিরুদ্দেশ যাত্রা মহিমান্বিত হয়েছে। হতাশার Dark night চেয়েছে 'পথের আলো'। তাই ওই 'নিরুদ্দেশের পথিকে'র আহ্বানেই চলেছে সোমশংকর।

হতাশার ভাবটি তখনই আসে যখন আমরা পার্থিব স্বার্থবোধের তাড়নায় ফিরি। নিরুদ্দেশের পথিক আমাদের স্বার্থবোধেই আঘাত করেন। ('ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া...')।

ব্যক্তি জীবনেও, কবি তখন অঙ্কনশিল্পে নবোৎসাহে এগিয়ে চলেছেন।—'বিচিত্রিতা'র (১৯৩৩)—'আশীর্বাদ' কবিতায় নন্দলাল বসুর উদ্দেশে বলছেন—

'তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নববালক জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।

(ছ)

বিধাতার যজ্ঞশালায় বাঁশি বাজাবার ভার নিয়েছেন কবি—

'তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি—
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি। (পূজা-৩১৭)

এ যজ্ঞশালার অগ্নির কোনো সমাপন নেই। সাধারণ যজ্ঞ পার্থিব প্রাপ্তির জন্যে দেবতাদের কাছে মানুষের প্রার্থনা মাত্র। বিশ্বধাতার যজ্ঞ তো সৃজন ও সৃষ্টিধারার পরিচালন—সে তো চলবে অনন্তকাল ধরে। এ যে স্রষ্টার আনন্দ। সেই আনন্দে নিজেকে যুক্ত করেছেন কবি। তাঁর গানে ও অন্যান্য রচনায় এই আনন্দকেই তিনি প্রধান করে দেখিয়েছেন। উপনিষদে আনন্দের যে ব্যাপকতা রবীন্দ্রনাথ তাকেই গ্রহণ করেছেন। সে আনন্দ কেবল সুখ বিলাস বা আরাম শয্যায় কাল কাটানো নয়। সে আনন্দ সুখ ও দুঃখ উভয়কে নিয়েই। ঢেউ এর ওঠা ও পড়া, ভাঙ্গা ও গড়া—এ আনন্দের অঙ্গা। কবি জানতেন—

"প্রভু সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে মমত্ব নাই তবু,
ভাঙায় গড়ায় সমান তোমার লীলা।"
(বীথিকা-নমস্কার)

গানে বলেছেন—

'...আরামে যার আঘাত ঢাকা, কলঙ্ক যার সুগন্ধ। নয়ন মেলে দেখল না সে রুদ্রমুখের আনন্দ'। (পূজা-৫৯২)

অন্য গানে আছে—এই 'ভাঙায় গড়ায়...লীলা'-র কথা। সে আনন্দে কবি যোগ দিতে চান—

'পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে
এই খসে যাবার, ভেসে যাবার, ভাঙবারই আনন্দে রে।।

পাতিয়া কান শুনিস না যে দিকে দিকে গগন মাঝে
মরণবীণায় কী সুর বাজে তপন-তারা-চন্দ্রে রে-
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে জ্বলবারই আনন্দে রে॥....
.... ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার, মরবারই আনন্দে রে।।' (পূজা-৩১৫)

এই যজ্ঞশিখার রুদ্রলীলায়, মহাকালের নৃত্যছন্দের বিপুল তরঙ্গো কবি যোগ দিয়েছেন। কালের তরী কোনো তীরে বাঁধা থাকতে পারে না। কবি তাই যোগ দিয়েছেন বাঁধন ছেঁড়ার সাধনে। কালের তরণী সব তরঙ্গা পার হতে হতে চলবে, সব অন্ধকারের বাধা পার হয়ে—আলোর দিকে।

..."কাল সমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবস রাত্রি।..."(পূজা-১৮৫)

মহাকালের এই আনন্দযজ্ঞে যোগ দেবার কথা নিয়েই এই গীতবিতান।

(জ)

প্রজাপতি ব্রহ্মা বলেছিলেন-'আমি তোমাদের যজ্ঞ দিলাম। এর সাহায্যে তোমরা সুখী হবে। এ যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট প্রদানে কামধেনুতুল্য হবে। (অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্ত্বিষ্টকামধুক্। (গীতা ৩/১০)। স্বর্গের সঙ্গো তোমাদের যোগ থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ স্বর্গ চাইতেন না এমন নয়। তবে তাঁর স্বর্গ ব্রহ্মা-কথিত স্বর্গলোক নয়। তিনি পৃথিবীকেই অমরাবতী করতে চেয়েছিলেন। 'মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্য-সীমা/তখন দিবে না দেখা দেবতার আমর মহিমা?' (বলাকা-৩৭)। এখানে মর্ত্যসীমা অর্থে পার্থিবতা বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি এ পৃথিবীতেই স্বর্গালোকের চেয়ে বড়ো কিছু পেয়েছিলেন। তাই স্বর্গসভার মহাঙ্গানের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন।—

..."আমার লাগল না মন লাগল না,
তাই কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চলে...।
শ্যামল মাটির ধরাতলে॥
হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন।
বনের পথে আঁধার আলোয় আলিঙ্গান—
আমার লাগল রে মন লাগল রে,
তাই এইখানেতেই দিন কাটে এই খেলার ছলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে॥ 'বিচিত্র-৭৭'

মর্ত্যসীমার প্রাচীর চূর্ণ করে পৃথিবীকেই তিনি স্বর্গের অমর মহিমায় অলংকৃত করতে চাইলেন। 'এই-যে কালো মাটির বাসা'—তারই মধ্যে স্বর্গের 'আনন্দলোক'কে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর স্বর্গের কোনো ভৌগোলিক সীমা নেই। মহাকাল ও মহাবিশ্বের সঙ্গো তাঁর যোগ। তিনি ব্রহ্মার যজ্ঞকে 'আনন্দরূপমমৃতম্'-এর আনন্দযজ্ঞে পরিণত করেছেন। সংগীত তার ওঁ।

(ঝ)

কোনো স্থলে কুণ্ড নির্মাণ করে আগুন জ্বেলে তাতে ঘৃত সমিধ বেলপাতা প্রভৃতি আহুতি দেওয়া এবং পুরোহিতের উদাত্ত সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ—এটাই যজ্ঞ সম্পর্কে সাধারণের ধারণা। কিন্তু গীতায় যজ্ঞের সংজ্ঞা অনেক উদার। 'জ্ঞানযোগ'-এ (৪র্থ অধ্যায়) এসব উপকরণাদিকে সংকেত বা প্রতীকরূপে ধরা হয়েছে। যেমন, আগুন অর্থে আত্মসংযম-যোগ-অগ্নিকে এবং আহুতি বলতে ইন্দ্রিয়-কর্মানি' 'প্রাণকর্মানি' ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন। গীতার চিন্তার অভিমুখ সর্বদাই স্বার্থ থেকে পরার্থে প্রস্থানের দিকে। স্বর্গ, দেবতা প্রভৃতি বলতে অপার্থিবতাকেই বোঝানো হয়েছে। জীবনের সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিকেই সেভাবে পরিচালিত করার কথা বলা হয়েছে গীতা-উপনিষদাদিতে। এভাবে দেখলে বলা যায় যে গীতবিতানের 'আনুষ্ঠানিক' পর্যায়ের সব গানগুলিই পার্থিবে অবস্থিত হয়েও উদার অপার্থিবতার দিকে আমাদের পথ দেখায়। ব্যক্তি-আয়োজিত সব অনুষ্ঠানই ব্যক্তিকেন্দ্রিক না হয়ে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' হয়ে উঠেছে এ গানগুলিতে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বা অন্যত্র সব অনুষ্ঠানই স্বার্থসীমার বন্ধন থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। বেদ উপনিষদের যুগ থেকেই সব অনুষ্ঠানের সঙ্গো মন্ত্রাদিকে সুরে গাওয়া হত। এ সব মন্ত্রে উদারতার কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ সব অনুষ্ঠানেই গানের প্রয়োগ করেছেন ওই সব বৈদিক মন্ত্রের আসল আদর্শকে মনে রেখে। অনুষ্ঠানগুলিকে কেবল শ্রুতি-দৃষ্টি-নন্দন নয়, কল্যাণপ্রদ করার দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। তাঁর দৃষ্টিতে সুন্দর কখনো শিব-বিহীন নয়।

'আনুষ্ঠানিক' পর্যায়ের একটা বড়ো অংশই রচিত হয়েছে 'বিবাহ'কে কেন্দ্র করে।

'বিবাহ' দুটি নরনারীকে এক সংসারবন্ধনে বাঁধে। কিন্তু ভারতীয় ভাবনায় বিবাহ ব্যাপারটি কেবল বর ও বধূকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বার্থজড়িত একটি রুদ্ধদ্বার পরিবারে আবদ্ধ করে না। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ ভাবনার সঙ্গো এর যোগ।

...."তব মঙ্গাল, তব মহত্ত্ব, তোমারি মাধুরী, তোমারি সত্য
দোঁহার চিত্তে রহুক নিত্য নব নব রূপে দিবস রাত।।" (আনুষ্ঠানিক-১)
'তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে বিশ্বের মাঝে বিস্তারি।।' (আনুষ্ঠানিক-৮)

বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও কবির ভাবনায় বিশ্বভাবনা মিশেছে। বৃক্ষ মানুষের নিকটতম প্রতিবেশী। তাকে সেভাবেই আবাহন করা হয়েছে।

"...আয় আমাদের অঙ্গানে অতিথি বালক তরুদল—
মানবের স্নেহসঙ্গা নে, চল্ আমাদের ঘরে চল্।।"...(আনুষ্ঠানিক-১১)

মানবসমাজকে বৃক্ষ যেন সব দিক দিয়ে রক্ষা করে—

'...উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা,
সন্ধ্যায় আনো বিরাম গভীর ভাষা,
রচি দাও রাতে সুপ্ত গীতের বাসা হে উদার প্রাণ।।' (আনুষ্ঠানিক-১২)

গৃহপ্রবেশের গানেও আছে উদার সুর যা মানুষকে সংকীর্ণ স্বার্থপূর্ণ গৃহবদ্ধতা থেকে মুক্তি দেয়—

"এসো হে গৃহদেবতা,
এ ভবন পুণ্য প্রভাবে করো পবিত্র ॥
...সবে করো প্রেমদান পূরিয়া প্রাণ—
ভুলায়ে রাখো, সখা, আত্মাভিমান।
সব বৈর হবে দূর
তোমারে বরণ করি জীবনমিত্র ॥

হলকর্ষণে মাটির বন্দনা করা হয়েছে,—সেখানে মাটিকেই বলা হয়েছে মাতৃস্বরূপা।

'ফিরে চল মাটির টানে
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।।
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে,... ॥
...দিক হতে ওই দিগন্তরে কোল রয়েছে পাতা
জন্মমরণ তারি হাতের অলখ সুতোয় গাঁথা।।'... (আনুষ্ঠানিক-১৫)

ঋক্‌বেদের এক সূক্তে এক মৃতজনের উদ্দেশে বলা হয়েছে-হে মৃত, এই জননীস্বরপা বিস্তীর্ণা পৃথ্বীর কাছে যাও।' (৯১০/১৮/১০-১১)।

ফসল কাটা অর্থ শস্যক্ষেত্রকে শোষণ করা নয়। ফসল হল মাঠের দান, স্নেহের দান। 'মাঠ আমাদের মিতা', 'ভালবাসার মাটি' প্রভৃতি বাক্যাংশে (আনুষ্ঠানিক-১৬) সে কথা প্রকাশিত হয়েছে। 'রক্তকরবী' নাটকের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'-গানটিতে যেখানে কবির প্রকৃতিপ্রেম ব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতি ও শস্যক্ষেত্রের প্রতি প্রীতি আমাদের হারিয়ে গেছে। এসব গান সেই ভালবাসার উজ্জীবন ঘটাতে পারে না কি ?

'শাপমোচনে'র অরুণেশ্বর-কমলিকার মিলনের গানটি কি শুধুই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ? 'তোমার আনন্দ ওই এলো" (আনুষ্ঠানিক-২১) গানটিতে দেখছি—

"বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার খোলো গো।"

'আনুষ্ঠানিক সংগীত' (গীতবিতান তৃতীয় খণ্ড)-এর ৮ সংখ্যক গানে আছে-

'সুখ তোমারে নিত্য রহুক দিতে
নিখিল জনের আনন্দ বাড়ায়ে।'

এ গানে ব্যক্তির প্রেমকে বলা হয়েছে 'অনন্তেরই পরশরস।' 'আনুষ্ঠানিক সংগীত'-১১-এ ('সুমঙ্গালী বধূ') শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা-উপলক্ষ্যে মহর্ষি কণ্বের শুভাশীর্বাদের উপদেশ মনে পড়ে, অথবা মনে পড়ে মৈত্রেয়ীর বিখ্যাত উক্তি—

'যন্নু মে ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ
কথং তেনামৃতা স্যামিতি !...যেনাহং নামৃতা
স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং ?'... (বৃহদারণ্যক-১১২)
যেন উপকরণের গর্ব আত্মারে না করে খর্ব।
মন যেন জানে উপহাস করে কাল ধনমানে—
তব চক্ষে যেন ধূলির সে ফাঁকি
নিত্যেরে না দেয় ঢাকি..।' (আনুষ্ঠানিক সংগীত-১১)

'সমাবর্তন'-এ পাশ. করা ছাত্রদের উপাধি দেওয়া হয়। শিক্ষার্জন কেবল আপনার স্বার্থে অর্থোপার্জনের জন্যেই নয়, স্নাতকদের সম্বোধন করা হয়েছে 'জনকল্যাণধ্যানী' বলে। তাদের সামনে রাখা হয়েছে 'বহুজনহিতায়' 'মুক্তবন্ধ সমাজ' গঠনের আহ্বান।

বিদ্যা কেবল পুথি পাঠ নয়, জ্ঞানবৃদ্ধের অধ্যাপনাই নয়। শিক্ষা একটি তপস্যা। বিশ্ববিদ্যাপ্রাঙ্গণকে কবি বলেছেন 'তীর্থ'। স্নাতক-উপাধি লাভ বিদ্যালাভের সমাপ্তি নয়—সাধনার যাত্রা পথের শুরু। বিদ্যার সঙ্গো কর্ম ও জ্ঞানকে মেলানো হয়েছে 'বিশ্ব বিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণ' (আনুষ্ঠানিক সংগীত—৩) গানটিতে। এবং জনকল্যাণের 'শিব'কেও যুক্ত করা হয়েছে। স্নাতককে হতে হবে 'তাপসরাজ।' এ আদর্শ চিরকালের গ্রহণীয় আদর্শ। এর মতো যজ্ঞ আর কী আছে! 'আনুষ্ঠানিক' সংজ্ঞাকে উত্তীর্ণ হয়ে এ পর্যায়ের গানগুলি উন্নততর যজ্ঞামৃত-ফল-প্রাপ্তির আশ্বাস দেয়।

পুরাকালে যজ্ঞের মধ্যে একটি ত্যাগের আদর্শ ছিল। যজ্ঞের তাৎপর্য ছিল— "দেবতাকে সর্বস্ব দিতে হইবে। যাহা কিছু প্রিয়তম, তাহাই দিতে হইবে। স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। যজ্ঞে আত্মসমর্পণ ব্যতীত ঈশ্বরের তুষ্টি হইবে না। তাই যীশু সমস্ত মানবজাতির নিষক্রয়-রূপে আত্মসমর্পণ-করিলেন।.. ক্রুশে চড়িয়া মৃত্যুই তাঁহার আত্মসমর্পণ।" (ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ, যজ্ঞ-কথা-রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।)

(নিষ্ক্রয়-বিনিময়, পরিবর্ত্য।)

নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়াই নিজেকে বড়ো করে পাবার উপায়। বিশ্বের তাবৎ মহামানবেরা তাই করেছেন। বুদ্ধ-খ্রিস্ট-শ্রীচৈতন্য নিজেদের ভুলে গিয়েছিলেন-পরার্থে। প্রকৃতপক্ষে এটাই যজ্ঞের অন্তিম-উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর 'যজ্ঞকথা'-য় খ্রিস্টযজ্ঞের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন বলেই তাঁর গানে 'আত্মহোমের বহ্নি' জ্বেলেছিলেন এবং গানের সুরেই স্বার্থবন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। জীবনের চরম ও পরম পাওয়া, জীবনের গভীরতম অনুভব-উপলব্ধির ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ এমন যজ্ঞই করেছেন। জীবনকে হোমশিখায় আহুতি দেবার কথা আছে তাঁর গানে। এখানে 'পূজা' পর্যায় ও 'প্রেম' পর্যায়ের দুটি গান উল্লেখ করি।

'সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে' সন্ধ্যাপূজার ঘন্টাধ্বনির আবহে কবি তাঁর জীবনের 'শেষ শিখাটি' জ্বেলে নিজেকে আহুতি দিচ্ছেন।—

"যখন পূজার হোমানলে
উঠবে জ্বলে একে একে তারা...
অস্তরবির ছায়ার সাথে মিলবে আয়োজন—
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন।।" (পূজা . ২০১)।

ঋষিদের আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে বেদ-উপনিষদের মন্ত্রগানে। কবির কাব্যসূক্তের উপলব্ধিগুলিও তেমনি দেখতে পাই গীতবিতানের কথায়-সুরে। যে-কোনো মুহূর্তেই ইচ্ছেমতো একটি গানের জন্ম হয় না। গভীরতম ভাবনাটিকে যখন তখন মধুরতম সুরে স্ফূর্তি দেওয়া যায় না। ব্যাপারটিকে অলৌকিক বলা যায়। সে সাধন যজুর্বেদের যজ্ঞের চেয়ে হীন নয়। প্রেমিকের গহনতম হৃদয়ের ভাবনাটির প্রকাশ মহত্তম যজ্ঞ দ্বারাও কি সম্ভব ?

কবির সেই যাজ্ঞসেনী ভাবনা মুক্তি পায় গানের সুরে। গানের সুরই সেই হোমানল।—

…"যে কথাটি বলব তোমায় বলে
কাটল জীবন নীরব চোখের জলে
সেই কথাটি সুরের হোমানলে
উঠল জ্বলে একটি আঁধার ক্ষণে…।।" (প্রেম-৯)

(ঞ)

রবীন্দ্রনাথের 'পূজা' এবং 'আনুষ্ঠানিক' পর্যায়ের গানে দেখলাম আত্মকেন্দ্রিক ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করার আহ্বান। 'স্বদেশ' পর্য্যায়ের গানেও দেখব নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে দেশ, এবং দেশ-কে উত্তীর্ণ হয়ে উদারতর বিশ্বমানবতার পথে স্বার্থহীন আত্মসমর্পণের কথাই বলা হয়েছে।

১৯/২০ শতকে বাংলার জাতীয় আন্দোলনের রথ যাঁদের টানে এগিয়েছিল—ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সে সময়ের এমন কোনো আন্দোলন ছিল না যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ অংশগ্রহণ ছিল না। সে সময়ের সব আন্দোলনই বাংলার সর্বাঙ্গীণ জাতীয় নব জাগরণের অভিমুখী ছিল। এ এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। পরাধীনতা, গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা, নারীমুক্তি, সাম্প্রদায়িকতা, সংগীত, চিত্রকলা—এ সবই এ যজ্ঞের অঙ্গ।

দীর্ঘকালের তামসিকতাচ্ছন্ন বাঙালি মনকে একদিকে স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা, অন্যদিকে স্বাদেশিকতার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে বিশ্বজনীন ভাবনায় উত্তীর্ণ করা—উভয় দিকেই চালিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। তিনি চেয়েছিলেন মানুষকে নির্ভয় স্বাধীন ব্যক্তিত্বে এবং উন্মুক্ত উদার মানবপ্রেমে জাগ্রত করতে। তাঁর 'স্বদেশ' পর্যায়ের গানগুলিকে পুরোপুরি স্বদেশী গান বলা যায় না। কারণ অধিকাংশ গানেই রয়েছে দেশনিরপেক্ষ জাতিনিরপেক্ষ মানব ভাবনা। দেশমাতৃকার মধ্যে তিনি বিশ্বমানবতার আদর্শ স্থাপন করেছেন। পূর্ব ও পশ্চিম উভয়কে সেই উদার ভারততীর্থে আহ্বান করেছেন। বিশেষ করে তাঁর শেষ জীবনের 'স্বদেশ'-গানে কবি বিশেষ থেকে নির্বিশেষে পৌঁছেছেন। ফলে তাঁর গানগুলি দেশে-কালে আবদ্ধ হয়নি।

শেষ পর্যায়ের গানগুলিতে কবি ভারতকে এঁকেছেন এক বিশেষ মূর্তিতে। শেষ পর্যায়ের গানগুলিতে জননীমূর্তি দেখা যায় না। যদিও আজও দেশবন্দনায় আমরা দেশকে 'মা' সম্বোধন করে থাকি, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের পরে আর দেশকে জননী সম্বোধন করেননি। কেবল 'জনগণমন' গানটির একস্থলে 'স্নেহময়ী তুমি মাতা' কথাটি আছে। কিন্তু গানটি 'ভারতভাগ্যবিধাতা'-কে উদ্দেশ করে লিখিত—যিনি সকল লিঙ্গ পরিচয়ের উর্ধ্বে। বোঝা যায়, এই যুগে তাঁর দেশপ্রেমে কিছুমাত্র ভাবালুতা ছিল না।

তবে মাতৃত্বের মধ্যে যে উদারতা আছে, ভারতকে তিনি তার থেকে বঞ্চিত করেননি। এই উদারতার বলেই ভারত সর্বজাতিকে আপনার কোলে স্থান দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'জনগণমন-অধিনায়ক' এবং 'হে মোর চিত্ত' গান দুটিতে ভারতকে 'বিশ্বমানবের

মহামিলনের 'সাগরতীর' বলেছেন। 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটির প্রথম স্তবকে বলেছেন—

পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে,........।

— (স্বদেশ ১৪)

কেবল ভারতের সব প্রদেশই নয়—নানা জাতি নানা ধর্ম, বিভিন্ন কালে ভারতে এসে ভারতকে নিজের করে নেবার জন্যে মিলে-মিশে এক হয়েছে। ভারতের একটি ঐক্যমন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রের আহ্বানে 'শক-হুণ-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।' 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন।... ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।' (১৩০৯)।

'জনগণমন' গানটিতে বলেছেন—

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।

— (স্বদেশ ১৪)

এই ভারতের মিলনক্ষেত্রে সকলকে কবি আহ্বান করেছেন—

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

— (স্বদেশ ১৫)

এ মহাযজ্ঞে জাতি, বর্ণ, ধর্ম সব মিলে গিয়ে এক মহাভারতে পরিণতি পেয়েছে। এই ঔদার্যবোধ অন্যান্য গীতিকারের থেকে রবীন্দ্রনাথকে স্বতন্ত্র করেছে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেয়েও কবির অধিকতর কাম্য ছিল দেশবাসীর আত্মশক্তির জাগরণ। দেশ কেবল একটা Idea-মাত্র নয়—বিগলিতকণ্ঠ মাতৃরবের সাশ্রু ভাবালুতাও নয়। দেশ মানুষের সমষ্টি। সেই মানুষের জাগরণই প্রথম প্রয়োজন। মানুষকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করাই দেশপ্রেমিকের প্রথম কর্তব্য।—

সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সংকটের কল্পনাতে হয়ো না ম্রিয়মাণ।

দুর্বলেরে রক্ষা করো দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়, নিজের পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়॥ (স্বদেশ ১১)

. . . .

যুগসন্ধিকালে নব যুগের এই মন্ত্র মহাভারতেও উচ্চারিত হয়েছিল—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ" (গীতা-২/৩)

"পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।" (গীতা-৪/৮)

সত্যনিষ্ঠা আত্মার সবচেয়ে বড়ো সম্পদ, —সত্যের পথে এগিয়ে গেলেই আত্মশক্তির উদ্বোধন।—

চলো যাই চলো, যাই চলো, যাই—

চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে॥
চলো মুক্তিপথে,........॥ (স্বদেশ-৩৯)

রবীন্দ্রনাথের একটি গানে মুক্তবন্ধ সমাজের রাজাপ্রজার আদর্শ সম্পর্কে বলা হয়েছে।—

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
....
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে।
....
রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে— . . . (স্বদেশ-১০)

'হে মোর চিত্ত' গানটিতে যে ভারততীর্থের কথা বলা হয়েছে, সেই তীর্থের পবিত্রতা কেবল ব্রাহ্মণ-স্পর্শেই নয়—'সবার পরশে।'

রবীন্দ্রনাথের পূজার গানে দেখা গেছে—শেষ জীবনে মহামানবই তাঁর ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছেন। স্বদেশ পর্যায়ের গানেও যেন ওই মহামানবই দেশ জননীর স্থান অধিকার করেছেন। ওই মহামানব আর ভারতভাগ্যবিধাতা প্রায় একই সত্তা মনে হয়। 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন' গানটিতে সেই মহামানবের বন্দনা আছে।—

বল জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম
জয় তপস্বীরাজ হে। (স্বদেশ ১৭)

রবীন্দ্রনাথের মহামানবের মন্ত্রেই দীক্ষিত হোক স্বদেশ প্রেমী। স্বদেশপ্রেমিক স্বদেশের চেয়ে বড়ো মানুক এই মহামানবের আদর্শকে। এই মহামানবের আহ্বানেই জেগে উঠুক মৃত্যুত্তীর্ণ আত্মজাগরণের গান।—

চল যাত্রী, চল দিনরাত্রি—

কর অমৃতলোকপথ অনুসন্ধান।
জড়তাতামস হও উত্তীর্ণ,
ক্লান্তিজাল কর দীর্ণ-বিদীর্ণ—
দিন-অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যুতরণ তীর্থে কর' স্নান॥ (স্বদেশ ৪০)

এই অমৃতের দিকেই ধাবিত হতে বলেছেন 'চলো যাই চলো, যাই' গানটিতেও।—

চলো অভয় অমৃতময় লোকে, অজর অশোকে,
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়—
অমৃতের জয় বলো ভাই॥

দেশে-দেশে ঘর আছে যে কবির,—তাঁর স্বদেশ কেবল ভৌগোলিক সীমায় আবন্ধ নয়, তাঁর মুক্তি কেবল ব্রিটিশের অপসারণেই নয়, এবং তাঁর স্বাদেশিকতার সাধনাও সকলের সঙ্গো ভিড়ের ডামাডোলের মধ্য দিয়ে হবার নয়। হঠকারিতার দ্বারা যথার্থ স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। মানসমুকুল আগুনে ভাজলে কখনোই ফুল ফোটে না। অবিচল সাধনই স্বাদেশিকতার সাধনা।

'সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে?
খাঁটি জিনিস হায় রে মাটি নেশার পরমাদে॥
কথায় তো শোধ হয় না দেনা, গায়ের জোরে জোড় মেলে না—
গোলেমালে ফল কি ফলে জোড়াতাড়ার ছাঁদে।

... ...

সৃষ্টিকরের ধন কি মেলে জাদুকরের ঝোলায়?
মস্ত বড়োর লোভে শেষে মস্ত ফাঁকি জোটে এসে,
ব্যস্ত আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশার ফাঁদে॥' (স্বদেশ-২৬)

এত বড়ো যজ্ঞসাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—'যত্র বিশ্ব ভবত্যেকনীড়ম্'—এর প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে বিশ্বময় বিস্তৃত।

আজ যখন চারিদিকে সংকীর্ণতার, আঞ্চলিকতার বর্ণধর্ম বিদ্বেষের নাগিনীরা বিষাক্ত নিশ্বাস ছড়াচ্ছে তখন রবীন্দ্রনাথের এ যজ্ঞসাধনাকে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের চেয়ে বহুগুণ উচ্চে স্থান দিতে পারি।

(ট)

রবীন্দ্রনাথ মরমী সাধনার কবি। তাঁর যজ্ঞে তাই নেই কোনো আয়োজন, নেই কোনো উপকরণ। গীতায় বলা হয়েছে—যজ্ঞ নানা প্রকার। যেমন,

"দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাহ্পরে।
স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশ্রিতব্রতাঃ॥
"অন্য কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করেন। কেহ কেহ
তপোরূপ যজ্ঞ এবং কেহ কেহ প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারাদি

যোগরূপ যজ্ঞ করেন। অপর কোনো কোনো দৃঢ় ব্রত
যত্নশীল যোগী বেদাভ্যাস (শাস্ত্র পাঠ) ও শাস্ত্রার্থ—
নিশ্চয়রূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে থাকেন।" (গীতা ৪/২৮) (উদ্‌বোধন)

রবীন্দ্রনাথ এ পথে যাননি।

আত্মনা আত্মনি আত্মানম্—গীতোক্ত (১৩/২৫) এই বাক্যটি মরমী সাধনার মূল কথা। আসল কথা তো এই আত্মজ্ঞান। মনের মানুষই তো আরশী নগরের পড়োশী। এই আত্মজ্ঞানই তো সাধ্য হয়ে উঠেছে ঋষিদের তপস্যায়, বাউল মরমীদের সাধনায়। আত্মজ্ঞানই ঈশ্বর জ্ঞান। 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।' (শ্বেতাশ্বতর ৪/১৭)। এই আত্মপরিচয়ের কথা আছে রবীন্দ্রনাথের 'পঁচিশে বৈশাখ' (পূরবী) কবিতায়।

প্রতিবছর এই দিনটি আসে, কবিকে সচেতন করে দেয় তাঁর আত্মস্বরূপ সম্পর্কে। সে নিয়ে আসে কবির 'জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী।'

"এই দিন এল আজ প্রাতে
যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষোমাঝে। ....
এই দিন বলে আজি মোর কানে,
'অম্লান নূতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে
একদিন তুমি এসেছিলে...।
সেই-যে নূতন তুমি,
তোমারে ললাট চুমি
এসেছি জাগাতে
বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।...
হে নূতন—
তোমার প্রকাশ হোক
কুজ্ঝটিকা করি উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন।...
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক
তোমা-মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।"(১)

এই চিরনূতন আত্মস্বরূপের পরিচয় কবির অজ্ঞাত নয়। অবসন্ন আত্মবিস্মৃত অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন-'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ...। (গীতা ২/৩)। পরন্তপ অর্জুন আত্মবিস্মৃত।

(১) রচনা-২৫.১.১৩২৯। এরই পুনর্লিখিত শেষ অংশে কবি সুরারোপ করেন ৬.৫.১৯৪১ তারিখে। এটিই কবির শেষ জন্মদিনে শেষ সুররচনা।

তাঁকে তাঁর স্বীয় ক্ষাত্র ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যেই শ্রীকৃষ্ণ এ কথা বলেছিলেন। 'শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি' কবিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে অর্জুনের বিষাদের মতো। জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখ তাঁর মলিন আচ্ছাদন দূর করে দিয়েছে।—

'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎ প্রসাদাৎময়াচ্যুত।
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ (গীতা-১৮/৭৩)

উপনিষদের প্রার্থনা—

হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে॥ (ঈশ-১৫)

গীতবিতানে এ প্রার্থনা বার বার উচ্চারিত হয়েছে।

'আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও
আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা।' (পূজা-৯২)
'আর রেখো না আঁধারে, আমায় দেখতে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনারে।' (পূজা-১৯২)

যজ্ঞের 'দীপের আলো ধূপের ধোঁওয়ার' আড়ালে যাঁকে পাওয়া যায় না—তাঁর জন্যে রবীন্দ্রনাথের আছে গান।

'...বঁধুর কাছে আসার বেলায়
গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য করে করব মূল্যবান।।' (পূজা-২০)

যতনে রাখিব হে

'প্রেম' শব্দটির দুরকম প্রয়োগ আমাদের নজরে পড়ে। একটি ব্যাপক, অন্যটি সংকীর্ণ। ব্যাপকরূপে শব্দটিকে আমরা সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহার করে থাকি। যেমন, ঈশ্বরপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, মানবপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, মাতৃপ্রেম, প্রভৃতি। একটা সাধারণ সম্বাদী সম্পর্ক এর সঙ্গে জড়িত এবং তার ফলেই হৃদয়ে একটা আকর্ষণ, আন্দোলন ও বিচ্ছেদবেদনা প্রভৃতিও বোধ করে থাকি।

তবে আদিম কাল থেকেই মা, সন্তান বা স্বভূমি প্রভৃতির নানা অনুষঙ্গী সম্পর্কের ধারণাকে ছাপিয়ে এই প্রেম, নরনারীর ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত, যৌন আকর্ষণ মূলক বিশেষ একটি সম্পর্কের বোধই আমাদের কাছে এনে দেয়। কারণ জীবজগতের সৃষ্টি ও বিবর্ধনের মূলে রয়েছে নরনারীর দেহজ তথা ইন্দ্রিয়জনিত আকর্ষণ। ফলে 'প্রেম' শব্দটি, সংকীর্ণরূপে, 'কাম' শব্দটির সাহচর্য নিয়ে আমাদের জীবনে বড়ো ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থেকেছে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও থাকবে।

এই মোহিনী মায়ার সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে, অথবা স্বীকার করেও, আমরাই আবার 'প্রেম' এর আরো এক ভিন্নতর ভূমিকাকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে 'প্রেম'-এর সংজ্ঞাকে দুভাবে গ্রহণ করেছি। এক, 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা,'—দুই, 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা।' এ বিভাজন বৈষ্ণবধর্ম সুলভ মনে হতে পারে, তাই আমরা একে সহজভাবে 'দেওয়া' ও 'নেওয়া', অথবা ত্যাগ ও ভোগ বলেও, ধরে নিতে পারি। যে ক্ষেত্রে মানুষ ভোগে নিজের আনন্দই চায় সেটা এক জিনিস আর যেক্ষেত্রে মানুষ পরস্পরকে, একে অন্যকে, আনন্দ দেওয়াকেই নিজের আনন্দ বলে মনে করে, সেটা অন্য জিনিষ।

মোটের উপর, প্রেমের গান বলতে আমাদের মনে প্রথমেই আসে নর ও নারীর ইন্দ্রিয়জনিত আকর্ষণ, মিলন, বিরহ, প্রভৃতির কথা। এর মধ্যে ত্যাগ বা দেওয়ার ভাবটা প্রধান হলেই তাকে আমরা 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা'-র বিকল্প বলে ভাবতে পারি,—যেখানে আত্মসুখের চেয়ে প্রিয়কে সুখী করার ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে।

'গীতবিতান'-এর গানগুলিতে, অনেক সময়ই, প্রেমের এই সংজ্ঞাটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে বলে মনে করি, তার ফলে 'প্রেম' পর্যায়ের অধিকাংশ গানই বা সেরা গানগুলি 'পূজা' পর্যায়ের গানগুলির সমধর্মী হয়ে উঠেছে। এ সব গানে পূজা ও প্রেম-কে স্বতন্ত্র করা যায় না। যেমন, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গানটি। মানব সম্পর্ক-জাত প্রেমের গান হলেও এটির স্থান হয়েছে 'পূজা' পর্যায়ে ব্রহ্মসংগীতরূপে এবং গানটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঈশ্বরভক্ত শ্রোতা-গায়ক আধ্যাত্মিক প্রেম-ভক্তির গান বলে মেনে এসেছেন। এ রকম বহু গানেই পূজা-প্রেম-প্রকৃতির পর্যায়গত

ভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন, 'পূজা' পর্যায়ের 'আজি বিজন ঘরে' গানটি নবদম্পতির বিবাহ বাসরে ঘনিষ্ঠ প্রেম-আকুলতায় নির্দ্বিধায় গীত হতে থাকায় কারো মনে কোনো সংশয় জাগে না।

এ রকম বহু গানেই 'পূজা' ও 'প্রেম'-এর মধ্যে ভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানগুলি যেন মর্ত্যসীমা চূর্ণ করে 'স্বর্গের অমর মহিমা'-প্রাপ্ত হয়েছে।—

রবীন্দ্রনাথ নরনারীর পার্থিব প্রেমকেও স্থাপন করেছেন দেহোত্তীর্ণ লোকে। তাই তিনি প্রেমিকাকে বলতে পারেন—

"চোখ বলে, যা দেখলুম,
তুমি আছো তাকে পেরিয়ে,
মন বলে, চোখে-দেখা-কানে-শোনার
ওপারে যে রহস্য—
তুমি এসেছ সেই অগমের দূত।"
(শেষসপ্তক-১২)

'শেষ সপ্তকে'র অন্য কবিতায় (৩০) বলেছেন—

"বিশ্বকবি তাঁর অসীম ছড়াটার থেকে
একটি পদ ছিঁড়ে নিলেন কোন কৌতুকে,
ভাসিয়ে দিলেন পৃথিবীর হাওয়ার স্রোতে...।
ফিরছে সে মিলের পদটি পাবে বলে।"

বিশ্বের তাবৎ আকর্ষণ-এর মূল উৎস-সূত্র এটিই। এই দুটি পদ পরস্পরের আকর্ষণে, অভিসারে ধেয়ে চলেছে।

তারা পরস্পরকে বলতে পারে—

"তোমায় যতনে রাখিব হে রাখিব কাছে—
প্রেমকুসুমের মধুসৌরভে, নাথ, তোমারে ভুলাব হে।"

পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আছে—দুটি পদ একদিন মিলবেই উভয়ের বাসনায়। তাই বলতে পারে—

'আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর...'। 'তোমায় যতনে রাখিব' গানটি 'পূজা ও প্রার্থনা' (রবিচ্ছায়া) উপপর্যায়ের। এটি 'প্রেম' পর্যায়েও থাকতে পারত। এর সব শব্দগুলিই তো প্রেমিকের ভাষা। 'নাথ' শব্দটি একালে অপ্রচলিত হলেও গানটির রচনাকালে (১৮৮৫) তা প্রেমিকের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। এমন কি বিশ শতকের (১৯৩৬) 'শ্যামা-ও বলেছে—'হে ক্ষমা করো নাথ।' সেই অসীম ছড়াটার ছিন্নবন্ধ পদদুটির মতো এ গানের বাদী সত্তা-ও তার সঙ্গীকে, সেই অগমের দূতকে, খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সুতরাং 'তোমায় যতনে রাখিব' গানটিকে নির্ভেজাল প্রেমের গান বলতে পারি—'প্রেম' পর্যায়ে না থাকলেও। রবীন্দ্রনাথের 'বৈষ্ণব কবিতা' কবিতাটি পাঠকের স্মরণে আসছে নিশ্চয়ই।

এ গানটির বক্তব্যে যেমন ঈশ্বর ও মানব উভয়কে সমপর্যায়ের মনে করা হয়েছে, 'প্রেম' পর্যায়ের 'আহা তোমার সঙ্গে'-গানটিতেও তেমনই ভাবা হয়েছে।

'কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনা রে' (পূজা) গানটিতেও 'প্রিয়তম'কে ডাকা হয়েছে। এ সব গানের পটভূমিকায় একটি মিলনকুঞ্জ কল্পনা করা যায়— যা প্রাচীন যুগের সংস্কৃত সাহিত্য, ও পরবর্তীকালের বৈষ্ণবপদাবলীর উত্তরাধিকার বলে মনে করা যায়—সেখানে নায়কও অভিসারে আসে, নায়িকা-ও যায়। 'আজি ঝড়ের রাতে'-(প্রকৃতি), 'দীপ নিবে গেছে মম' (প্রেম), 'আজ জ্যোৎস্না রাতে', (পূজা), 'যে রাতে মোর' (পূজা), 'কোথা হতে বাজে,' (পূজা), 'তোমায় যতনে রাখিব (পূজা), 'সেই ভালো সেই ভালো (প্রেম) 'তুমি তো সেই যাবেই চলে' (প্রেম ও প্রকৃতি),—পর্যায় নির্বিশেষে-এ সব গানে ওই মিলন কুঞ্জের আভাস আছে। আছে অভিসারের কথাও।

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি'—লালন ফকিরের এ গানটির 'অচিন'কে কবি আপনার প্রিয়ার মধ্যে দেখেছেন,—

'রাস্তায় চলতে চলতে
বাউল এসে থামল
তোমার সদর দরজায়।
গাইল, 'অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়।'
দেখে অবুঝ মন বলে
অধরাকে ধরেছি।
তুমি তখন স্নানের পরে এলোচুলে
দাঁড়িয়েছিলে জানলায়।
অধরা ছিল তোমার দূরে চাওয়া চোখের পল্লবে,
অধরা ছিল তোমার
কাঁকনপরা নিটোল হাতের মধুরিমায়'। (শেষসপ্তক-১৩)

নরনারীকে আশ্রয় করেই প্রেমের আবির্ভাব। তবে সে নরনারীকেও উত্তীর্ণ হয়ে যায়। সংগীত বীণাকে আশ্রয় করে বেজে ওঠে, কিন্তু গান যেখানে পৌছে যায়, বীণা সেখানে যেতে পারে না। কবিতাটিতে সে কথাটিই ব্যক্ত হয়েছে। রূপের আড়ালের অরূপবীণাই শেষ কথাটি বলে।

বসন্তের গানে, 'চেনা ফুলের গন্ধস্রোতে' নিত্যকালের অচেনাই ভেসে আসে কবির চিত্তে। (প্রকৃতি ২৬৯)। 'ফাগুনের পূর্ণিমা এল কার লিপি হাতে। ...জীবনের কোন্ কূলে এই বাণী জেগেছিল কবে কোন্ মধুরাতে।' এ গানে স্মরণ/পরপারের অতীতের স্মৃতি যেন অলখচরণপাতে ফিরে আসছে। প্রকৃতি- ২৬৬ সংখ্যক গানে আছে—

'এক ফাগুনের গান সে আমার আর ফাগুনের কূলে কূলে
কার খোঁজে আজ পথ হারালো নতুন কালের ফুলে ফুলে।'

অতীত-বর্তমানের ভেদ ঘুচে যায়, প্রকৃতি-প্রেমের 'পর্যায়'গত ভেদও ঘুচে যায়।

'বহু যুগের ওপার হতে' গানটি—অতীত আর বর্তমানকে মিলিয়ে দেয়। অতীতের

রেবা নদীর তীরে, মালবিকার পথ-চেয়ে-থাকা আর অতীতে থাকছে না,—'সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে।' এ-ও কালোত্তরণ!

'পূর্ণচাঁদের মায়ায়' ভাবনা যেন পথ ভুলে চলে যায় অতীতের পটভূমিতে (প্রকৃতি-৬)। এ গানেও খোঁজা হচ্ছে সেই 'অসীম ছড়াটার' ছিন্নবন্ধ পদটিকে।

অতীতের প্রেম কালান্তরেও অচেনা হয় না—

'তুই ফেলে এসেছিল কারে, মন, মন রে আমার।' (প্রেম)

'যে পথ দিয়ে চলে এলি, সে পথ এখন ভুলে গেলি—
কেমন করে ফিরবি তাহার দ্বারে..।।'

তাকে পাওয়া যাবে নদীর জলের কল্লোলে, বনের পাতার মর্মরে।

'মনে হয় যে পাব খুঁজি ফুলের ভাষা যদি বুঝি,
যে পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে'—

সে পথেই পাওয়া যাবে সেই হারানো পদটির ঠিকানা। 'ফুলের' ভাষায় তার সংকেত।

অতীতের প্রেম বর্তমানেও পথ চিনে আসে। রূপ বদলে যায় কিন্তু প্রেম বদলায় না। 'শাপমোচন'-এর গল্পে আছে—

অরুণেশ্বর বিকৃতদেহ নিয়ে বর্তমানে চলে এসেছে। কিন্তু মনের অতলে আছে মধুশ্রীর পুরনো প্রেমের আবছায়া। "সুরসভার অভিশাপে গন্ধর্বের দেহশ্রী হল বিকৃত, অরুণেশ্বর নামে তার জন্ম হল গান্ধার রাজগৃহে। ...মধুশ্রী জন্ম নিল মদ্ররাজকুলে, নাম নিল কমলিকা। স্বর্গলোক থেকে যে আত্মবিস্মৃত বিরহবেদনা সঙ্গে এনেছে অরুণেশ্বর, যৌবনে তার তাপ উঠল প্রবল হয়ে।" একদিন কমলিকার ছবি দেখে তার "মনে হল যা হারিয়ে ছিল এই জন্মের আড়ালে, তাই যেন ফিরে ধরা দিল অপরূপ স্বপ্নরূপে।"

আমরা বিস্মরণের এপারে বসে—

'...যে গান গাই জানিনে সে কার উদ্দেশে?...
ওই মুখপানে চেয়ে দেখি—
তুমি সে কি অতীতকালের স্বপ্ন এলে
নূতন কালের বেশে।' (প্রেম-২৩১)

অতীতের সঙ্গে পুনর্জাত বর্তমানের সম্পর্কটী কীভাবে রবীন্দ্রভাবনায় সংযোগ খুঁজে পেয়েছে? তার তো একটি মাধ্যম চাই। চাই একটি অভিজ্ঞান চিহ্ন। পার্থিব ও অপার্থিব, অতীত ও বর্তমান —এদের মধ্যে একটি সেতু আছে। 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' প্রবন্ধে বলা হয়েছে,— অশোক বনবাসিনী সীতার কাছে প্রিয়তম রামচন্দ্রের অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় এনে দিয়েছে হনুমান,—এ ঘটনাটির রূপকমূল্য আছে।—

"ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে।" শ্রাবণসন্ধ্যার বৃষ্টিভেজা ফুলের রূপেগন্ধে সেই হারানো পদটির উদ্দেশ আছে।

বর্ষামুখর শ্রাবণসন্ধ্যা কবিকে উন্মনা উতলা করে। প্রকৃতি তার নানা ঋতুর নানা রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে মানুষের সঙ্গে তার যোগটি স্মরণ করিয়ে দেয়। সব ঋতুই

এ ভাবে অতীত কালের সঙ্গে কবির যোগটিকে মনে করায়। তবে বর্ষার মতো এমন আর কোনো ঋতুতেই 'পুরাতন প্রাণের টান' জাগে না। (প্রকৃতি-বষা-৫৪)

এখানে বর্ষার দুটি গান বিশেষ ভাবে আলোচনা করছি যা এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

মানুষ দূর অতীত থেকে বর্তমানে এসে পৌছেছে। এ যেন তার প্রবাস। যেন যক্ষের মতোই সে অভিশপ্ত বিরহী জীবন যাপন করছে। ফিরে যেতে চাইছে অতীতের আবহাওয়ায়-যেখানে রয়েছে তার ফেলে আসা আপনজন। তার অস্পষ্ট স্মৃতি অরুণেশ্বরের মতোই মনকে যেন চঞ্চল করে তুলছে।—

'শ্রাবণের পবনে আকুল বিষন্ন সন্ধ্যায়
সাথিহারা ঘরে মন আমার প্রবাসী পাখি
ফিরে যেতে চায় দূরকালের অরণ্যছায়াতলে।'

কালিদাসের যক্ষ তো একবছরের জন্য বিরহী ছিল। মানুষ তো আজীবন দীর্ঘ পরবাস যাপন করছে। এই প্রবাসী পাখি যেতে চায় ফিরে আপন ঘরে—কিন্তু তা কি সম্ভব? 'তীর্থহারা যাত্রী ফিরে ব্যর্থ বেদনায়'।

তবু একেবারেই কি সে ব্যর্থ? তা নয়। তার ঠিকানা পাওয়া যায় কালের বর্তমানেও,— প্রকৃতির অভিজ্ঞানে। 'কোন্ গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে?' এ গানটিতে সেই আপন জনের স্পর্শ যেন কবির অঙ্গে সাড়া দিয়ে যায়।—

'ধরা অধরার মাঝে
ছায়ানটের রাগিণীতে আমার বাঁশি বাজে।
বকুলতলায় ছায়ার নাচন ফুলের গন্ধে মিশে
জানিনে মন পাগল করে কিসে।
কোন্ নটিনীর ঘূর্নি-আঁচল লাগে আমার গায়ে।।'

অথবা 'বসন্তে'-র 'মন যে বলে চিনি চিনি' গানটিতেও সেই 'পুরাতন দিনের পাখি'র ডাক শোনা যায়।

'...মোর পুরাতন দিনের পাখি
ডাক শুনে তার উঠল ডাকি,
চিত্ত তলে জাগিয়ে তোলে,
অশ্রুজলের ভৈরবীরে।।'

নরনারীর মানবিক প্রেমকে স্বর্গীয় হতে হলে তাকে তো পার্থিবতাকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। মূল বাদ দিয়ে, তার ফুল হতে পারে না। অপার্থিব প্রেমকেও তাই মানবস্বভাব-এর মধ্য দিয়েই এগোতে হয়। মানব জীবনে প্রেমকে তার সমগ্রতায় দেখতে হলে একেবারে পূর্বরাগ থেকেই দেখার চেষ্টা করা উচিত। বৈষ্ণব পদাবলিতে প্রেমের বর্ণনা করতে গিয়ে কবিরা প্রাথমিক স্তরগুলি বাদ দিয়ে একেবারে লোকোত্তর স্তরে উঠতে চেষ্টা করেন নি। সেই মান, অভিসার, মিলন, বিরহ সবই তার মধ্যে বর্ণিত আছে।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রেম' পর্যায়ের গানে এ সবের কথাও আছে। রবীন্দ্রনাথ 'অসংখ্য বন্ধন মাঝেই' মুক্তির স্বাদ খুঁজেছেন। 'আমায় মুক্তি যদি দাও বাঁধন খুলে, আমি তোমার বাঁধন নেব তুলে।' 'দুঃখ সুখের ঢেউ খেলানো' পার্থিবতা তাঁর বড়োই ভালো লেগেছে। অবশ্য ব্যক্তিস্বার্থের মোহবন্ধকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে এই 'সব ছোটো খাটো' (বিচিত্র-১৫) যে বিরাট অনন্তেরই অংশ —কবি এ কথাটি ভোলেননি। খন্ড পূর্ণ নয়, কিন্তু পূর্ণেরই অংশ, তাই জীবনের খন্ড অংশে যে প্রেম-মিলন-বিরহ ও তার নানা লীলা বৈচিত্র্য—তার কথাও গীতবিতানের 'প্রেম' পর্যায়ের গানে আছে।

'বৈষ্ণব কবিতায়' রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছেন—

হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।
... ... এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে !...

আধুনিক কালে বৈষ্ণবকাব্যে প্রেমের মানবিক উপাদানের আবিষ্কার করে যাঁরা মানব-অধিকারকে প্রসারিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পথিকৃৎ। প্রেম কিছু নিরালম্ব অবাস্তব অনুভূতির মনোবিকার নয়। প্রেমের গানও যতই আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতায় পর্যবসিত হোক না কেন—তারও মূল মানবজীবনের রস পান করেই বর্ধিত হয়। মানবমনের মুকুরেই ঈশ্বরের প্রতিফলন ঘটে। তাই যেখানে আমরা পদাবলি কীর্তন শুনতে গিয়ে পদকর্তার ভণিতার উচ্চারণের সঙ্গো সঙ্গো কপালে হাত ঠেকাই—সেখানে অজ্ঞাতসারে একথাটাই স্বীকার করি যে, পার্থিব মানবপ্রেমই নিকষিত হেমের ন্যায় এমন স্বর্গীয় উন্নতি লাভ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গানের ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ অনুভূতি হয়। প্রেমের গানের কথা বাদ দিলেও, 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতির গানেও দেখা যায় যে, ঈশ্বরের সঙ্গো প্রেমের বিস্তারের পথে রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত উপায় অবলম্বন করেছেন, ঈশ্বরের সঙ্গো মিলনের জন্য যে-সমস্ত সম্পর্ক স্থাপন করেছেন—সকলই মানব-অভিজ্ঞতার দ্বারা পরীক্ষিত।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা তাঁর যৌবনের ব্যক্তিত্বে দেখিনি। আমরা যখন তাঁকে পেলাম তখন তিনি আমাদের 'গুরুদেব'। সৌম্য শান্ত ঋষিপ্রতিম চেহারার স্নিগ্ধ সর্ববিস্তারী ব্যক্তিত্বে আমরা তাকে ভারত-আত্মার প্রতিভূরূপে গ্রহণ করলাম। কবি রবীন্দ্রনাথের যে ব্যক্তিগত প্রেমের দিকও থাকতে পারে তা ভুলেই গেলাম। অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর অতীত জীবনের মানব-সঙ্গিনীদের ভোলেননি। এই মানসিকতা কবির ছিল বলেই দেখা যায় যে, শেষ জীবনে পূজার গান রচনা স্তব্ধ হলেও প্রেমের গান রচনা স্তব্ধ হয়নি। মূলমন্ত্র—emotion recollected in tranquility—তার ফলে গানের ফসল ফলে উঠল কবির শেষ জীবনে, যা আরও পরিণত, আরও মধুর। বর্ষার বর্ষণের ফলশ্রুতি ঘটল বসন্তে।

মানবপ্রেমকে মহিমান্বিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই আজ কবিজীবনের প্রেম ও প্রেমিকা-সংক্রান্ত অনুসন্ধানে কোনো সংস্কার আর বাধা সৃষ্টি করে না। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যই বোধ হয় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রজীবনের এই দিকটি নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেন তাঁর 'কবিমানসী' গ্রন্থে।

একথা সত্য যে কবির ব্যক্তি জীবনের প্রেম ঘটনা তাঁর গান রচনায় অনুপ্রেরক হয়েছে। তবে অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে বিশেষ কোনো উৎসে জন্মালেও কবির গান নির্বিশেষেই পৌঁছেছে। গীতবিতানের গানগুলি বস্তুভারের মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে সৌন্দর্যের আকাশ বিহারের দক্ষতা অর্জন করেছে।

প্রেমে যতক্ষণ প্রিয়-র প্রাধান্য ততক্ষণই লীলার বৈচিত্র্য। প্রথম জীবনের প্রাক্-গীতাঞ্জলি পর্বের গানগুলির বিশ্লেষণে এই লীলার বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। যদিও নিরঙ্কুশ দেহমুখীনতা প্রথম বয়সের গানের মধ্যেও নেই, তবু প্রেম যে দেহ-আশ্রিত, এই বোধের পরিচয় পাওয়া যায় প্রাক্-গীতাঞ্জলি পর্বের গানেই। লীলা-বৈচিত্র্য ও প্রেম-বৈচিত্র্যের প্রকাশই তাঁর প্রথম বয়সের গানের প্রধান লক্ষণ।

এই পর্বের গানে এক সজীব নায়িকাকে প্রত্যক্ষ করা যায়—যে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য-প্রভাবিত, বৈষ্ণব পদাবলী-অধ্যুষিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে নিয়ত প্রেমবৈচিত্ত্য ও লীলাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই নায়িকা শুধু যে 'আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে'—তাই নয়, মানবজীবনে বয়ঃসন্ধিকাল থেকে প্রেমের যতরকম কুটিল বঙ্কিম রোমাঞ্চময় পথ আছে, সমস্ত পথেই তার অভিসার। এই চিরন্তন অভিসারের কথাই এইসব গানে বলা হয়েছে।

বয়ঃসন্ধিকালের প্রথম যে অস্পষ্ট অনির্দেশ্য এক সংবেদনা চিত্তকে চঞ্চল উন্মন করে দেয়, তার প্রকাশ দেখি এই গানটিতে—

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নব জীবন-'পরে। ...
আমার বাসনা আজি ত্রিভুবনে উঠে বাজি,
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনাভরে॥ (প্রেম ২৯/১৮৯৪)

এই বেদনার মূলকে সহজে জানা যায় না। তবে এই অনির্দেশ্য বেদনা যে সমগ্র অনুভূতিকে ছেয়ে আছে সেই বোধই চিত্তকে কস্তুরীমৃগের মতো চঞ্চল করে।

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় জলে।
কেন মন কেন এমন করে। (প্রেম-২৪৬/১৮৯২)

মনে সংশয়ের প্রশ্ন—এ আহ্বান কি বাইরের, না অন্তরের?

সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে—বনমাঝে
কি মনোমাঝে॥ (প্রেম, ১৪৪/১৮৮৪)

এ বিমুগ্ধ বিহ্বল অবস্থা পূর্বরাগের পূর্বাবস্থা। এ অবস্থার সুন্দরতর বর্ণনা আছে এই গানটিতে—

'হৃদয়ের একূল, ওকূল, দু কূল ভেসে যায়, হায় সজনি,
উথলে নয়নবারি।
যে দিকে চেয়ে দেখি ওগো সখি
কিছু আর চিনিতে না পারি॥ ...
কেন এমন হল গো
আমার এই নব যৌবনে।
সহসা কী বহিল
কোথাকার কোন্ পবনে।
হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ—
জানি না কী বাসনা, কী বেদনা গো—
কেমনে আপনা নিবারি।।' (প্রেম, ৮২/১৮৯৩)

প্রিয় প্রেমের আলম্বন। প্রকৃতির রূপান্তরশীল বর্ণ-গন্ধের উন্মাদনা প্রেমের উদ্দীপন। কিন্তু অন্তরে যদি অফুরান উৎস না থাকে তবে প্রেমের উদ্ভব কেবল বাইরের ধারাপাতেই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের এ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। প্রেম আদিমত, মূলত, আভ্যন্তর শক্তির বিকাশ। যৌবনের সমাগমের মতো আপন দেহমনের সমগ্র পরিমণ্ডলকে চঞ্চল করে দিয়ে এর আবির্ভাব। এ দিগ্‌ভ্রান্ত জীবন—উদাস হৃদয়, মরমের হুতাশ, —এই কূলপ্লাবী যৌবনজলতরঙ্গের উচ্ছ্বাস—প্রথমে মনে হয় এ যেন প্রিয়নিরপেক্ষ, এ যেন অনাহত সংগীত। এই হৃদয়-সমুদ্রের জোয়ার ঘটে আবার বাইরের যে গ্রহের আকর্ষণে, ক্রমে তারও সন্ধান মেলে। যদিও তার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না, তবু তার আভাস পাওয়া যায়।—

'এখনো তারে চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশি শুনেছি—
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।।' (প্রেম ৩৬৭/১৮৯৩)

গানটি পূর্বরাগের অনুভবের প্রকাশক।

এই মনপ্রাণ দিয়ে ফেলার পেছনে হয়তো আছে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় অনুমান-জননান্তর সৌহৃদানি। অথবা জন্মসূত্রে পাওয়া সংস্কার।

'মনোমাঝে' যে বাঁশি বাজে, তাই শোনা যায় বনমাঝে।' ধীরে ধীরে বাঁশির সুরের অমৃত প্রলেপে প্রিয়জনের চিত্র ভেসে ওঠে কায়ারূপ ধরে।

'বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়।।
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি—
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।।'
(প্রেম, ৫৬/১৮৮৬)

এই বাঁশির গান প্রিয়ের অধর এবং অধরের হাসিকে বহন করে যেন পরশমণির ছোঁয়া রেখে যায়। এর পরে পথে বার হবার গান—অর্থাৎ অভিসার ও প্রেমের লীলা প্রকাশের গান। রবীন্দ্রনাথের গানও পদাবলির পথ ধরে বাইরে নিয়ে চলে গৃহবন্ধ নিশ্চিন্ত নায়িকাকে। 'বলো সখী, জল আনিতে যমুনায় যাব কি?' —এই দ্বিধা ঘুচিয়ে

এবার সে চলে নায়কের উদ্দেশে। এবার সে সংকল্পে অটুট হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে আপনাকে সমর্পন করতে চায়। প্রিয়কে সে কীভাবে বরণ করবে? মানবিক প্রেমের কয়েকটি গানে সেই অসাধারণ romantic আকৃতি ফুটে উঠেছে।—

'ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরো কী তোমার চাই।......
আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া তোমারে পরানু বাস।
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি তোমার পুরাতে আশ।.....' (প্রেম-৩৫/১৮৯৭)

'জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি,
তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।' ...... প্রেম ৬২/১৮৯৫

পূর্বরাগের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। লীলার একটি প্রধান রূপ অভিমান। অভিমান-প্রকাশক গানে কৃত্রিম ক্রোধ ফুটে ওঠে। যেমন,

'ভালো যদি নাহি বাসে কেন তবে কহে প্রণয়ের কথা॥
মিছে প্রণয়ের হাসি বোলো তারে ভালো নাহি বাসি।' (রবিচ্ছায়া, ২৫/১৮৮৫)

মানভঞ্জনের পরবর্তী মনোভাবের গান—

'সখা, সাধিতে সাধাতে কত সুখ
তাহা বুঝিলে না তুমি...।
অভিমান-আঁখিজল, নয়ন ছলছল—
মুছাতে লাগে ভালো কত...।' (নাট্যগীতি, ৩৮/১৮৮৪)

এমনি নানা লীলা প্রেমকে বিচিত্র করে তোলে।

এই বয়সের গানের মধ্যেও পরবর্তী কালের বস্তুভারহীন প্রেমের গানের আভাস পাওয় যায়। 'তোমার গোপন কথাটি'—গানটিতে একদিকে বলা হয়েছে—

'ওগো ধীরমধুরহাসিনী, বোলো ধীরমধুর ভাষে— .....
বোলো অশ্রু জড়িত কণ্ঠে, বোলো কম্পিত স্মিতহাসে—
বোলো মধুর বেদনাবিধুর হৃদয়ে শরমনমিত নয়নে॥' প্রেম ৬৩/১৮৯৫

অন্য দিকে বলা হয়েছে—

'আমি কানে না শুনিবা গো, শুনিব প্রাণের শ্রবণে!' (প্রেম, ৬৩/১৮৯৫)

অর্থাৎ যে 'কথাটি'-র প্রকাশের জন্যে প্রেমিকা পাঁচটি সুন্দর বহিরঙ্গ অনুভবের সাহায্য নেবে, প্রেমিক সে কথাটি শুনবে বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে নয়, মর্মের সাহায্যে।

এ পর্বের অনেক গানে দেহাতীত প্রেমের সুরও শোনা যায়। প্রেমিকের ব্যাকুলতার তীব্রতা এই গানগুলির মধ্যে আবেগবিহীন স্তব্ধতা অর্জন করেছে। এবং ব্যাকুলতার তীব্রতা কায়িক সান্নিধ্যের কামনায় প্রকাশ না পেয়ে—বেগবান স্ফূর্তি পেয়েছে প্রিয়তমের মর্মে স্থান পাবার জন্যে। আপন হৃদয়ের পূর্ণ প্রেমের বিনিময়ে প্রতিপক্ষের এক কণা প্রেমের কামনা এই গানগুলিতে ফুটে উঠেছে।

'ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখো—তোমার
মনের মন্দিরে।..

আমার আকুল জীবনমরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো—তোমার
অতুল গৌরবে।' (প্রেম, ৩৪/১৮৯৭)

প্রিয়তমের মনে স্থান পাবার জন্য অধিক আতুরতা আছে এই গানটিতে—

'তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে।...
যদি পড়িয়া মনে
ছলোছলো জল নাই দেখা দেয় নয়নকোণে—
তবু মনে রেখো।' প্রেম, ১৫১/১৮

কবির প্রেমদৃষ্টিও মানসস্থিতা প্রিয়া, কায়াময়ী নারী আর বিশ্বসৌন্দর্যদেবীকে এক করে দেখে। দেশে কালে আবন্ধতা বিদীর্ণ করে প্রিয়াকে চিরন্তনী করে দেখে। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী'-র যাতায়াতের মতো এই প্রিয়া কখনো কাছের, কখনো দূরের। কখনো পরিচিতা, কখনো বিদেশিনী। কখনো হৃদিমাঝারে, কখনো সিন্ধু পারে। কবি কখনো Mystic কখনো Romantic—

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাক সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী॥
তোমায় দেখেছি শারদপ্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবীরাতে।
তোমায় দেখেছি হৃদি-মাঝারে ওগো বিদেশিনী॥ (প্রেম, ৮৬/১৮৯৫)

প্রেমের আলম্বন নারী। সেহেতু নারীকে তিনি স্বর্গীয় মহিমায় উন্নীত করেছেন। 'বিচিত্রিতা'-র 'পুষ্প' কবিতাটিতে তিনি নারীর ভালবাসার সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেছেন। পুষ্প নারীকে বলছে,—

'আজ সখি, বুঝিলাম আমি—
সুন্দর আমাতে আছে থামি,
তোমাতে সে হল ভালবাসা।'

গীতাঞ্জলির ঈশ্বরচিন্তার যুগ পার হয়ে এসেও কবি এই ভালবাসার অমৃতপিয়াসী বলেই নিজেকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।—

যে বাঁশি বাজিয়েছি
ভোরের আলোয়, নিশীথের অন্ধকারে,
তার শেষ সুরটি বেজে থাকবে
রাতের শেষ প্রহরে।
যে জীবনে আলো নিবল,
সুর থামল,
সে যে এই আজকের সমস্ত কিছুর মতোই
ভরা সত্য ছিল,
সে-কথা একেবারেই ভুলবে জানি,
ভোলাই ভালো।

তবু তার আগে কোন একদিনের জন্য
কেউ একজন
সেই শূন্যটার কাছে একটা ফুল রেখো
বসন্তের যে ফুল একদিন বেসেছি ভালো।
আমার এতদিনকার যাওয়া-আসার পথে
শুকনো পাতা ঝরেছে,
সেখানে মিলেছে আলোক ছায়া,
বৃষ্টিধারায় আম-কাঁঠালের ডালে ডালে
জেগেছে শব্দের শিহরণ,
সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল
জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল
চকিত পদে।
এই সামান্য ছবিটুকু
আর সব কিছু থেকে বেছে নিয়ে
কেউ একজন আপন ধ্যানের পটে এঁকো
কোনো একটি গোধূলির ধূসরমুহূর্তে। -শেষসপ্তক, ৬।

এই পরিচয়ই কবি রবীন্দ্রনাথের শেষ পরিচয়। আর এই পরিচয় নানারূপে নানা বৈচিত্র্যে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ব্যাকুল প্রকাশ লাভ করেছে তাঁর গানগুলিতে।

'গান' কথাটি প্রেমের গানের মধ্যেও বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হৃদয়ে প্রেমের বিকাশকে তিনি গানের রূপকমাধ্যমে অনুভব করতে চেয়েছেন। গান যেমন অনির্বচনীয়—প্রেমের প্রথম বিকাশও তেমনি অনির্বচনীয়। তার বেদনামূলও অনির্দেশ্য। প্রেমানুভূতিকে গান ছাড়া আর কিসেই বা ব্যক্ত করা যায়? তাই গানের মহিমা ও গুণ আরোপিত হয়েছে প্রেমে। প্রেমকে তিনি একই সঙ্গে নিকষিত হেমের মতো পবিত্র এবং শিল্পমূর্তির ন্যায় ভাবময় করে তুলেছেন তাঁর গানে বিশেষ করে প্রবীণ বয়সে রচিত গানে। যেমন,

'যায় নিয়ে যায় আমায় আপন গানের টানে
ঘর-ছাড়া কোন্ পথের পানে॥
নিত্যকালের গোপন কথা বিশ্বপ্রাণের ব্যাকুলতা
আমার বাঁশি দেয় এনে দেয় আমার কানে॥' (প্রেম, ১৪/১৩৩১)

'বলাকা'-র যুগে নবীনতার গতিচাঞ্চল্য কবির প্রৌঢ়ত্বের শুকনো পাতা ঝরিয়ে দিয়ে নবীন সাজে কবিকে সাজায়। জীবনের শেষদিনগুলি লীলাসঙ্গিনীর করস্পর্শে রঙিন হয়ে ওঠে। একদিকে মৃত্যুতরঙ্গিণীর খেয়ার কর্ণধার অপেক্ষমান, অন্যদিকে জীবনের শাখায় শাখায় নববসন্তের পলাশশিমূল বকুলবনের পাখি। একদিকে অস্তরবির ম্লানতা অন্যদিকে আকাশপারে রক্তরাগের বর্ণালি।—

আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো ধরলি রে কে তুই।
আমার শেষ পেয়ালা চোখের জলে ভরলি রে কে তুই॥
দূরে পশ্চিমে এই দিনের পারে অস্তরবির পথের ধারে
রক্তরাগের ঘোমটা মাথায় পরলি রে কে তুই॥ (প্রেম, ২৬/১৩৩০)

মৃত্যুদূত দূরে সরে দাঁড়ায়। প্রেম এসে জীবনকে নবীন প্রেমের মালা পরায়। কবি জীর্ণতার কথা ভুলে যান। ঋতুরাজের গায়ের সাদা চাদরখানা উলটে পরলেই যেমন নানারঙের আলপনার বর্ণশবল বেশ দেখা যায়—কবিরও তেমনি প্রৌঢ়ত্বের তপোভঙ্গের পরে মনে হয়—

আপনারে আমি দিতে আসি যেই জেনো জেনো সেই শুভ নিমেষেই
জীর্ণ কিছুই নেই কিছু নেই, ফেলে দিই পুরাতনে। ...
তোমার প্রেমে যে লেগেছে আমার চির নূতনের সুর। ...
মোর দানে নেই দীনতার লেশ, যত নেবে তুমি না পাবে শেষ—
আমার দিনের সকল নিমেষ ভরা অশেষের ধনে॥ (প্রেম, ৭৫/১৩৩২)

শেষ পর্যায়ের গানে, যেখানে নায়িকার উপস্থিতি মুখ্য নয়, সেখানে যেন সদ্যোদ্‌ভিন্ন-যৌবন তরুণ হৃদয়ে এক অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা সুর কস্তুরীমৃগের মত আপনাকে অকারণে চঞ্চল করে তোলে। কেন এই চঞ্চলতা?— মানুষ অন্তরের অন্তরে বিরহী। সে যেন তার অবিচ্ছেদ্য কোন অংশকে জন্মান্তরের দূরত্বে ফেলে এসে মনের গহনে তার সন্ধানে ফেরে। পূর্বজন্মাগত বা সহজাত এই স্মরণবেদনা কবিকে 'জননান্তর সৌহৃদানি' মনে করিয়ে দেয়। সেইজন্যেই যৌবনের আরম্ভকালে কেবলি মনে হয়,—

নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,
কাঁপে রে প্রাণ পাতার মর্মরেতে। (প্রেম, ৩০৭/১৩২১)

এই অনির্দেশ্য বেদনার প্রাণকেন্দ্র অন্বেষণের নিরন্তর সাধনা কবির শেষ জীবনের অনেকগুলি গানে ফুটে উঠেছে। কবির মনের মধ্যে যে গান বাজছে, তার সঙ্গে মিল আছে প্রকৃতিতে, যেখানে সর্বত্র এক চায় অন্যের সঙ্গ।—

আমার উদাস হৃদয় যখন আসে বাহির-পানে
আপনাকে যে দেয় ধরা সে সকলখানে
কচিপাতা প্রথম প্রাতে কী কথা কয় আলোর সাথে। ... (প্রেম, ২/১৩২৯)

এক চায় অন্যের সাথে মিলতে। কবির মনের মিলনের আকাঙ্ক্ষা এ পর্বের কয়েকটি গানে ফুটে উঠেছে। তা মানবপ্রেমের স্বাভাবিকতাকেই স্পষ্ট করে।—

আজি এ নিরালা কুঞ্জে আমার অঙ্গ-মাঝে
বরণের ডালা সেজেছে আলোকমালার সাজে॥ ...
অর্ঘ্য তোমার আনি নি ভরিয়া বাহির হতে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের আপন স্রোতে।
মোর তনুময় উছলে হৃদয় বাঁধনহারা,
অধীরতা তারি মিলনে তোমারি হোক-না সারা। (প্রেম, ৪১/১৩৩৪)

'অঙ্গা মাঝে বরণের ডালা' শরীরী আভাস কিছুটা দিলেও তা অতি ক্ষণস্থায়ী। প্রেম-চেতনার এই মুগ্ধ অবস্থায়—

প্রাণ যে আমার বাঁশি শোনে নীল গগনে,
গান হয়ে যায় নিজের মনে যাহাই বকি॥ (প্রেম, ১১৭/১৩৩৩)

এই অকারণ প্রেম-বৈচিত্ত্যের অনির্দেশ্য বেদনার স্বপ্নময় কেন্দ্রে বসে যে বাঁশি বাজায়, তার ঠিকানা অজ্ঞাত হলেও মন চায় স্বপ্নকে বাস্তবে দেখতে।—

স্বপনদুয়ার খুলে এসো অরুণ-আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে। ....
ছিলে আশার অরূপ বাণী ফাগুনবাতাসে
বনের আকুল নিশ্বাসে—
এবার ফুলের প্রফুল্ল রূপ এসো বুকের পরে॥ (প্রেম, ৬৪/১৩৩৩)

তারই প্রতীক্ষার সুর রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে আছে।

প্রবীণের প্রেমে প্রতীক্ষার কাল বিলম্বিত। প্রাপ্তির দুর্লভতায় প্রতীক্ষার আকুলতা তীব্র। মাঝে মাঝে উত্তরীয়ের হাওয়া এসে লাগে। একটি গানে বলা হয়েছে—

'দিনের পরে দিন যে গেল আঁধার ঘরে,
তোমার আসনখানি দেখে মন যে কেমন করে॥
পায়ের ধ্বনি গণি গণি রাতের তারা জাগে,
উত্তরীয়ের হাওয়া এসে ফুলের বনে লাগে।
ফাগুন বেলার বুকের মাঝে পথ-চাওয়া সুর কেঁদে বাজে—
প্রাণের কথা ভাষা হারায়, চোখের জলে ঝরে॥
(প্রেম, ২৬০/১৩৩৬)

'তুই ফেলে এসেছিস কারে' গানটিতে যার বিরহের কথা বলা হয়েছে, 'শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ন সন্ধ্যায়' গানটিতে সেই হারিয়ে-ফেলা অতীতের প্রিয়ার জন্যে মন 'দূরকালের অরণ্য ছায়াতলে' প্রবাসী পাখীর মতো 'ফিরে যেতে চায়'।

'কী জানি সেথা আছে কিনা আজও বিজনে বিরহী হিয়া
নীপবনগন্ধঘন অন্ধকারে—
সাড়া দিবে কি গীতহীন নীরব সাধনায়॥' (প্রেম-২৬৬, ১৩৪৪)

এই অস্তিত্বহীন নায়িকার প্রতি মননপ্রধান প্রেমই কবির জীবনের পাথেয়। শেষ বসন্তের ক্ষণ মিলনের স্মরণই কবির ধ্যানমন্ত্র হয়ে সারাজীবনের সম্বল হয়ে থাকবে। বিদায়ে বেদনা আছে, তবু স্মৃতি পরম রমণীয়।

স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে, জাগার বেলা হল—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো॥
ফিরিয়া চেয়ে এমন কিছু দিয়ো
বেদনা হবে পরম রমণীয়—
আমার মনে রহিবে নিরবধি
বিদায়খনে খনেক-তরে যদি সজল আঁখি তোলো॥ (প্রেম, ১৬০/১৩৩৬)

প্রিয়াকে বাস্তবে সম্পূর্ণ পাওয়া নয়, কবির দান গ্রহণের স্বীকৃতিই কবির পক্ষে যথেষ্ট। মিলন ক্ষণিকের হলেও তারই ক্ষণ-দীপ্তিতে চিরকাল আলোকিত হয়ে উঠতে পারে।

যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে,
মন তবু জানে জানে—
চকিত ক্ষণিক আলোছায়া তব আলিপন আঁকিয়া যায়
ভাবনার প্রাঙ্গণে॥ ...
মম ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে
যতটুকু পাই রয় উচ্ছলিতে।
দিবসের দৈন্যের সঞ্চয় যত
যত্নে ধরে রাখি,
সে যে রজনীর স্বপ্নের আয়োজন॥ (প্রেম, ২২৮/১৩৪৬)

কবির শেষ বয়সের কবিতার মতো, গানেও একটা বন্ধন-মুক্তির সুর শোনা যায়। 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে এর সূত্রপাত হলেও শেষ বয়সের গানে এর চরম পরিণতি। 'বাঁধন বিহীন সেই যে বাঁধন অকারণ'—সেই বন্ধনকে কবি শ্রেষ্ঠ বন্ধন মনে করেন। প্রেমিকাকে আপন অধিকারে না চেয়ে নিজেই প্রেমের স্বভাবিক গতিকে বরণ করে নিতে চান।' 'তবু মনে রেখো'—এই বাসনা আজ আর নেই। যদি প্রিয়ার স্মরণেও না থাকেন, তবু একদিনের মিলন-স্মৃতিই চিরদিনের ধ্যানের ধন হবে।—

দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি—
বরষ ফুরায়ে যাবে, ভুলে যাবে জানি॥
তবু তো ফাল্গুনরাতে এ গানের বেদনাতে
আঁখি তব ছলোছলো, এই বহু মানি॥ (প্রেম,১৫/১৩৩৪)

কবির এই দান করাতেই আনন্দ। 'গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছে আমায়।' কেবল আত্মনিবেদনের মধ্যে কবির প্রেমের প্রাপ্তি। সারাজীবনের অপ্রকাশিত বেদনার রসে প্রাণের পেয়ালা ভরে গিয়েছে, সমস্ত জীবনের মথিত অমৃতকে অঞ্জলি করে তুলে দেয়াতেই আনন্দ। (প্রেম ৮৫)। কোনো প্রতিদানের কামনা নেই। প্রত্যাখ্যানকেও কবি বুকের মালা করে রাখতে পারেন। কারণ বিরহ তো প্রেমের বিপরীত নয়।

তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে।
আমার ভাঙল যা তা ধন্য হল চরণপাতে॥
আমি রাখব গেঁথে তারে রক্তমণির হারে,
বক্ষে দুলিবে গোপনে নিভৃত বেদনাতে॥ (প্রেম, ২২১/১৩৪৬)

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে বৈষ্ণবতার বিশেষ প্রভাব এই বিরহের ক্ষেত্রে। বিরহের অনন্ত ব্যাপ্তিতে প্রেম সার্থক হয়ে ওঠে। প্রেমিকও অশেষ হয়ে দাঁড়ায়। কবি বিরহকে মিলনের চেয়ে বড়ো মনে করেন। কাছে-থাকার অংশের চেয়ে 'প্রেমের যে আধখানায় বিরহ' (মেঘদূত/লিপিকা) কবি তার মধ্যেই বাস করে তৃপ্ত। 'শেষ সপ্তক'-এর এক-

সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন—'হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ করে।' গানে বলেছেন—

'যখন থাক দূরে
আমার মনের গোপন বাণী বাজে গভীর সুরে।' (প্রেম, ১০৬/১৩৩৪)

কিংবা, 'পারিলে না তবু পারিলে না চিরশূন্য করিতে ভুবন মম
তুমি নিয়ে গেছ মোর বাঁশিখানি, দিয়ে গেছ তোমার গান॥'
(প্রেম, ১০৮/১৩৪৪)

বিরহ নিতান্তই কান্না নয়—অশ্রুর রসে ভরা। (প্রেম ২৪৫) স্মরণের আনন্দ!

প্রেম যখন কায়ামঞ্চ ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে ওঠে তখনই প্রেমের মধ্যে এক 'বিদেশিনী'-র আবির্ভাব ঘটে। কায়াকে আশ্রয় করে যে মহিমাময় প্রেমের উদ্ভব, তা এই বিদেশিনী বা অধরার যাদু ব্যতীত সম্ভব নয়। শুধু নারীই নয়, জগতের কায়াময় সবকিছুই এই বিদেশিনী-গত দূরত্বের আরোপেই মায়াময়, হয়ে ওঠে। 'জীবনস্মৃতি'-তে এর সম্বন্ধে কবি বলেছেন—'আমাদের এই জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে; কোন রহস্যসিন্ধুর পরপারে ঘাটের উপরে তাহার বাড়ি; তাহাকেই শারদপ্রাতে, মাধবীরাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে পাই; হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে; আকাশে কান পাতিয়া তাহার কন্ঠস্বর কখনো-বা শুনিয়াছি। সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল......বাউলের গানও ঠিক ওই কথাই বলিতেছে। মাঝে মাঝে বন্ধখাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়, মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না।' কথাগুলো বলা হয়েছে 'আমি চিনিগো চিনি তোমারে' গানটি প্রসঙ্গে।

মনে হয় এই বিদেশিনীকে কবির গানগুলিতেই আরও বেশি করে চেনা যায়। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।" (জীবনস্মৃতি)।

সংগীত-প্রসঙ্গে কবির প্রেমচেতনায় এই Mystic স্বভাব থাকার জন্যেই কবি ভাব-সম্মিলনের বৈষ্ণবী রাধার প্রেমকে আপন লেখনীতে আকর্ষণ করতে পেয়েছেন। 'এ কী সুধারস' গানটিতে কবির এই Mystic অনুভূতি ধরা পড়ে।—

'সে যে চিরদিবসেরই, নূতন তাহারে হেরি—
বাতাস সে মুখ ঘেরি মাতে গুঞ্জনগানে॥ ...
নীলাকাশ শ্যামধরা পরশে তাহারি ভরা—
ধরা দিল অগোচরা নব নব সুরে তানে॥' (প্রেম, ১১৮/১৩২৯)

কিংবা, 'অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে।' — (প্রেম-২৩০/১৩৪৬)

এই বিদেশিনী নানাকালে নানাবেশে কবিকে ধরা দিয়েছে। প্রেমের মধ্যে পরিচয়কে

প্রতিমুহূর্তে অপরিচয়ের বর্ণশাবল্যে সাজিয়ে দিয়েছে। জীবনের শেষ বেলায় প্রেম এসেছে নতুনরূপে।

কিন্তু জন্ম-রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বিদেশিনী যথার্থই অধরা বিদেশিনী। 'চিরদিন মোরে হাসালো কাঁদালো চিরদিন দিল ফাঁকি।' ('চিত্রা'-'সিন্ধুপারে')।

জীবনদেবতা, অন্তর্যামী, কৌতুকময়ী বা লীলাসঙ্গিনী-র মতোই এই বিদেশিনীর অস্তিত্ব টের পাওয়া গেলেও, সে আভাসেই থাকে। ওকে ধরা যায় না। তাই কবির Mystic নিশ্চিতি Romantic বৈচিত্র্যের আঘাতে ভেঙে যায়। এই দূরবর্তিনী চিরদিনই কেবল 'ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।' (বিচিত্র-৮৩)

এই বিদেশিনীর জন্যেই নিকট সুদূর-রোমাঞ্চে ভরে ওঠে। চেনা মানুষ দেখা দেয় অচেনার দূরত্বে, দেখা দেয় অন্য রঙের ওড়নার আড়ালে।—

'এই নিকটে থাকা
অতিদূর আবরণে রয়েছে ঢাকা।
যেমন দূরে বাণী আপনহারা গানের সুরে,
মাধুরীরহস্যমায়ায় চেনা তোমারে না চিনি।। (প্রেম, ২৩২/১৩৪৫)

প্রেমে এই বিদেশিনীরই অন্য নাম, মনে হয়, বিশ্বসৌন্দর্য। বিশ্বের সৌন্দর্যের আত্মাস্বরূপা যে দেবী, কয়েকটি প্রেমের গানে রবীন্দ্রনাথের অঞ্জলি নারী থেকে ক্রমে ক্রমে, নারীর মধ্য দিয়েই, সেই দেবীর চরণে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। Shelley যাকে বলেছেন—

The awful shadow of some unseen Power
Floats though unseen among us.
-Hymn to Intellectual Beauty.-

কবি বিহারীলাল যাকে দেখেছেন সারদারূপে,—উভয়ের মধ্যেই এই একটি মিল আছে যে, বিশ্বের নানা সৌন্দর্যের বস্তুগুলির অন্তর্নিহিত সাধারণ এক প্রাণসত্তার অস্তিত্ব উভয়ের কবিতাতেই স্বীকৃতি পেয়েছে। সে সাধারণ লক্ষণটির অস্তিত্বের দরুন উভয়ের সামীপ্য। সেটি রবীন্দ্রনাথের 'বিদেশিনী' পরিকল্পনার মধ্যেও রয়েছে। সমস্ত সৌন্দর্যের মূলীভূতা এই সত্তার পরিচয় 'উর্বশী' কবিতাতেও আছে।—

'সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল-হিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল ; ইত্যাদি।

উর্বশী-র রূপলীলাই বিশ্বের সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যলীলার সৃষ্টি করে। তাই মানবী-নারী-সৌন্দর্য আর বিশ্বসৌন্দর্য এক সংযোগে যুক্ত। যে নিরবয়ব অমূর্ত সৌন্দর্য নারীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত, তাই বিশ্বের যাবতীয় সুন্দর বস্তুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। মেঘে বিদ্যুতে-আকাশে আলোকে আঁধারে ভূমিতে-পর্বতে সমুদ্রে অরণ্যে বর্ষায় বসন্তে দেহে মনে যে নানা রূপের স্ফূর্তি তা ওই পরমসুন্দরেরই বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। নারীসৌন্দর্য সেই পরম সুন্দরেরই এক রূপবিকাশ। নারীর মধ্য দিয়ে কবি এই সুন্দরকেই দেখেন।—

কবি যাকে দেখেছেন 'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে', সেই 'তুলনাহীনা' কেবল নারী হিসেবেই রইল না। তার অবস্থিতি-'নিখিলের মাধুরীরুচি'-তে। এই তুলনাহীনা জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য-বিকাশের মধ্যেই আছে। এই অনিবর্চনীয়া অতুলনীয়াকে শরতের ক্ষীণ মেঘে, গানের রাগিণীতে—ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে—পাওয়া যায় (প্রেম-৩৮, ১৯৩০)। পাওয়া যায় 'শারদ প্রাতে', 'মাধবী রাতে' এবং 'হৃদিমাঝারে।'

— (প্রেম-৮৬)

অমলিন অন্তহীন সৌন্দর্যের আকর আবিষ্কৃত হয় প্রতিদিনের পথের ধুলার অন্তরাল থেকে।—

'হে নবীনা,
প্রতিদিনের পথের ধুলায় যায় না চিনা।' (প্রেম ৯৭/১৩৪০)

সীমার মধ্য দিয়ে যেমন অসীম প্রকাশিত, নারীর মধ্য দিয়েও তেমনি অরূপ সৌন্দর্য মূর্ত হয়ে ওঠে। কবির পূজার গানে যেমন ভূমির অন্তরালবর্তী ভূমাকে দেখা গেছে, (আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি) কবিতায় যেমন রূপের পদ্মে অরূপমধু আস্বাদন সম্ভব হয়েছে, প্রেমের গানে তেমনি নারীর "রূপের কোলে ওই যে দোলে অরূপমাধুরী।" সৌন্দর্যের অসীম অরূপ অধরা অপার্থিব স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে এই গানটিতে—

কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে মূলহারা ফুল ভাসে জলের 'পরে। ...
ধরা দেওয়ার ধন সে তো নয়, অরূপ মাধুরী॥

(প্রেম, ৩১৯/১৩৩০)

প্রেমের আলম্বনে যেমন নারী,—প্রেমের উদ্দীপনে তেমনি প্রকৃতির ভূমিকা অসাধারণ। প্রকৃতি-সৌন্দর্য ও নারী-সৌন্দর্য—উভয়েই নিকট সম্পর্কিত। চাঁদের আকর্ষণের সমুদ্রে যেমন জোয়ার আসে, মানব-হৃদয়েও তেমনি। পূজার গানে দেখেছি—যখন 'সুন্দর বহে আনন্দ-মন্দানিল'—তখন 'অন্তর পুলকাকুল।' প্রেমের গানেও তেমনি দেখা যায়, কাব্যের রসটিকে জাগিয়ে তোলে এই উদ্দীপক প্রকৃতি।

'উতলা হয়েছে মালতীর লতা, ফুরালো না তাহার মনের কথা।
বনে বনে আজি একি কানাকানি,
কিসের বারতা ওরা পেয়েছে না জানি,
কাঁপন লাগে দিগঙ্গানার বুকের আঁচলে—' প্রেম, ৫২/১৩৪৪

প্রকৃতির এসব ইঙ্গিত ঘোষণা করে- 'সে আসিবে'. . . .।

শুধু উপমা, Pathetic Fallacy বা উদ্দীপন বিভাব রূপেই নয়, —প্রকৃতি ও নারী যে সহোদরা, অর্থাৎ একই সৌন্দর্য-দেবীর অংশোদ্ভবা, রবীন্দ্রনাথের গানে তার পরিচয় আছে। কবির দৃষ্টি এই উভয়ের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যের একক কেন্দ্রে স্থাপিত হয়। পূর্বালোচিত 'সুনীল সাগরে,' প্রভৃতি গানের উদাহরণে তাই বলবার চেষ্টা করেছি।

শ্যামল প্রাণের নিকেতনে

১

প্রকৃতি বলতে দার্শনিক অর্থে আমরা বুঝি ব্রহ্ম বা পুরুষ বা বিশ্বস্রষ্টার শক্তি-কে। এই শক্তিকে স্রষ্টা থেকে আলাদা করা যায় না। স্রষ্টাই এই শক্তি বা প্রকৃতিবশে সৃষ্টিতে পরিণত হন। এভাবেই এই সৃষ্টিকে আমরা প্রকৃতি বলে থাকি। অব্যক্তের ব্যক্তি বা প্রকাশ। সহজ, স্বাভাবিক, ফলে অকৃত্রিম। প্রাকৃত বলতে আমরা বুঝি—যা সংস্কৃত নয়। সেভাবে প্রকৃতির অকৃত্রিমতাকে মেনে নিই। স্বাভাবিক বিকাশ। প্রকৃতি বলতে আমরা স্বভাবকেও বুঝি। আগুনের প্রকৃতি দহন—এটা তার স্বভাব। ইংরেজিতে বলি nature।

মানুষও প্রকৃতিরই একটা বিকাশ। তবে মানুষের মধ্যে মন এবং অস্মিতা-র উদ্ভব হওয়ায় সে আর প্রাকৃত থাকছে না। প্রাকৃতের সংস্কৃতরূপই মানুষ। স্বাভাবিকের সঙ্গে তাতে যুক্ত হয়েছে উদ্ভাবন ও নিয়ন্ত্রণ।

বিশ্বে কেবল দুটিই সত্তা আছে,—এক, আমি (self), দুই, আমি-ছাড়া বাকি জগৎ। এই বাকি জগতকেই সবাই বলে প্রকৃতি। আমি-রই চেতনার রঙে এই প্রকৃতিকে রাঙিয়ে নিয়েই আমাদের আনন্দ।

তবে তলিয়ে দেখলে, একটু বাস্তবমুখী হয়ে ভাবলে, এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, আমি-অতিরিক্ত যা কিছু—তারই সঙ্গে খাপ খাইয়ে, তারই আদল-অনুকূলে এই আমি-র বিবর্তন। প্রতীয়মান বিশ্বপ্রকৃতি কেবল আমারই চেতনার প্রতিবিম্ব নয়।

ভাববাদী ভাবনায় আমরা বলে থাকি—"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনী উঠল রাঙা হয়ে।..." বাস্তব সত্যটি হচ্ছে—সবুজ, বা রাঙা প্রভৃতি নানা বর্ণকে ধারণা বা অনুভব করার প্রয়োজনেই, তার ছাঁচে আমাদের চেতনার সৃষ্টি। 'আমি চোখ মেললুম আকাশে, অমনি জ্বলে উঠল আলো'—এর বাস্তব সত্যটা এই যে, আকাশের আলোর সঙ্গে মিল রেখেই আমাদের চোখের মণি তৈরি হয়েছে। কান তৈরি হয়েছে ধ্বনিকে অনুভব করার জন্যেই। অর্থাৎ আমি-র বাইরের প্রকৃতির প্রভাবেই আমি-র গঠন। কারণ প্রকৃতি মানুষ বা তার চৈতন্যের পূর্ব থেকেই বিরাজ করছে।

যে-আমি অ্যামিবা (amoeba) থেকে বাড়তে বাড়তে এক কোষ থেকে বহু কোষে বিচিত্র জটিল রূপ পরিগ্রহ করে আজকের মনচেতনা-যুক্ত আমি-তে এসে পৌঁছেছে—সে তো ওই অনেকান্ত প্রকৃতির উপাদানেই নিজেকে বহুব্রীহি করে তুলেছে।

এই বোধটি মনে রেখেই আমাদের বৈদিক যুগের বিস্মিত মানুষ প্রকৃতির নানা উপাদানকে অপরিহার্য মনে করেছে এবং নানা দেবতার নাম-রূপ-কল্পনায় সমৃদ্ধ করে স্তবরচনা করেছে। এভাবেই মৃন্ময়ী ধরিত্রী হয়েছে মাতৃরূপা চিন্ময়ী। বৃক্ষ-লতা-নদী-সূর্য

সকলেই পেয়েছে দেবতার পূজা, বর্ষার মেঘ হয়েছে পর্জন্যদেব। বৈদিক সাহিত্যে প্রকৃতির নানা উপাদান গুরুত্ব পেয়েছে এই আমি-র বিকাশে সহযোগিতার গুরুত্ব অনুযায়ী।

মানুষ তো একা থাকতে পারে না। তার সঙ্গী চাই। আর সঙ্গীর অভাবও তার নেই। আমি-ছাড়া বাকি-বিশ্বই তো তার সঙ্গী। সেই বিশ্বই দিবারাত্রি ঘিরে থাকছে তার দেহমনের সবকিছুকে। এই বিশ্বপ্রকৃতিই আমি-কে মোহিত করে, আকৃষ্ট করে—তার মনোবীণায় তোলে তান। যে দিকে সে তাকায়, যা-কিছু সে স্পর্শ করে সবই সেই যাদুকরী বিশ্বপ্রকৃতির মোহমন্ত্রে মধুময় হয়ে ওঠে। অনেকান্ত বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত আনন্দের সঙ্গে তার অবশ্যম্ভাবী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই আনন্দের কি কোনো রূপ আছে, কোনো মুর্তি আছে? একদিকে দেখতে গেলে সে অরূপ; অন্য দিকে দেখতে গেলে—বহুরূপেই সম্মুখে যারা আছে—তারাই সেই আনন্দময়ের বিকশিত রূপমূর্তি।

গীতবিতানের গানে সেই অনেকান্ত আনন্দময়ের সঙ্গে আমি-র সম্পর্ক নিয়ে শত শত বৈচিত্র্যময় পংক্তি ছড়িয়ে আছে। গীতবিতানের পূজা, প্রেম, প্রভৃতির সব গানেই তো সেই আনন্দময়ের কথা—কখনো হাসিতে, কখনো অশ্রুতে। রূপের মধ্যে রূপাতীত, দৈনন্দিন-প্রাত্যহিকের মধ্যে মহাকালের ছোঁয়া—এই নিয়েই গীতবিতান, এই নিয়েই আরশীনগর।

গীতবিতানের সব গানেই প্রকৃতি রয়েছে। কোথাও আছে প্রকৃতি তার স্বরূপে, কোথাও আছে মানুষের মন, মানুষের চরিত্র নিয়ে, কোথাও বা আছে মানুষের ভাবনার উদ্দীপক হিসেবে, আবার কোথাও আছে কেবল উপমা হিসেবে। যদিও গীতবিতানে 'প্রকৃতি' নামে একটি স্বতন্ত্র পর্যায় আছে—তবে সেখানেও নানা গানে 'পূজা' বা 'প্রেম' পর্যায়ের ভাব এসে গেছে।

আমার মনে হয় মানুষের মনে একটাই অনুভূতি। আমরা কখনো তাকে বলি ভক্তি, কখনো বলি প্রেম। পূজা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ—এ সবই প্রেম—যাকে আমরা নানা সময় নানা উপলক্ষ্যে নানা নামে ডেকে থাকি। তবে প্রকৃতির উদ্দীপন সব ক্ষেত্রেই সমান। বর্তমান আলোচনাটি প্রধানত প্রকৃতির উদ্দীপন-বিষয়ক। তাই এখানে পর্যায়গত বিশেষত্ব আলোচ্য নয়। এখানে মানবমনের রস-উদ্বোধনে প্রকৃতির 'উদ্দীপন'-এর কথাটিই বলতে চাই কয়েকটি গানের উদাহরণের সাহায্যে।

২

সাহিত্যশিল্প মানুষ ও তার নেপথ্যবর্তী প্রকৃতির কথাই বলে। তাই সে বিশ্বের প্রতিচ্ছবি বটে। আমাদের অলংকার শাস্ত্রে বলে, এই নকল বিশ্বে, অর্থাৎ সাহিত্যের জগতে, রসোৎপত্তির কারণ—'বিভাবানুভাবসঞ্চারীসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ।' এ তিনটির মধ্যে বিভাব-এর স্থান প্রথমে। বিভাব দুরকম—আলম্বন ও উদ্দীপন। উদ্দীপন—যা দেখলে শুনলে বা আস্বাদন করলে রসের সঞ্চার হয়। এই উদ্দীপনকে নিয়ে যদি একটু মাথা ঘামাই তাহলে দেখা যাবে—তাবৎ বিশ্বপ্রকৃতিই তো মনের মধ্যে রসের উস্‌কানি দেয়। বিশ্বের যেখানে যত দৃশ্য, শব্দ প্রভৃতি আছে সবাই মনের মধ্যে বিবিধ রসের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ 'নটরাজের' ভূমিকায় বলেছিলেন যে নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যের

এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয় আর অন্য পদক্ষেপে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হয়ে ওঠে। তার মানে বাইরের জগতের বা প্রকৃতির উদ্দীপনেই মনের মধ্যে রসোৎপত্তি ঘটে।

'বিচিত্র' পর্যায়ের একটি গানে আছে (৩৬)—
'আকাশ হতে আকাশপথে হাজার স্রোতে
ঝরছে জগৎ ঝরণা ধারার মতো।
আমার শরীর মনের অধীর ধারা
সাথে সাথে বইছে অবিরত।
দুই প্রবাহের ঘাতে ঘাতে উঠতেছে গান দিনে রাতে।
সেই গানে গানে আমার প্রাণে ঢেউ লেগেছে কত॥'

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—বৃক্ষলতাদি মানুষের নিকটতম প্রতিবেশী। শুধু তাই নয়, মানুষ তো প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতিরই সন্তান। বিবর্তনবাদী রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রের' রচনায় অনুভব করেছেন প্রকৃতির সঙ্গো তাঁর রক্তের সম্পর্ক—যাকে গানের ভাষাতে বলেছেন—'নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান'। বিশ্বভরা প্রাণের অনন্তে, মহাবিশ্বে মহাকাশের মধ্যে যে মানবের আসন আছে—সেই আনন্দ, সেই বিস্ময়ই কবির মনে গান সৃষ্টি করে।

৩

কোনো সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনায় তার anatomy এবং উপাদানগুলির কথা ভেবে দেখা উচিত প্রথমেই—একথা আধুনিক সমালোচকরাও মানেন। দেখা উচিত একটি গান কীভাবে কী উপকরণ নিয়ে তার সৃষ্টির সংসার গড়ে তোলে। দেখা দরকার একটি গান অন্তিমতঃ কী দিয়ে যায়, কী রেখে যায় আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়ের কুহরে।

আমাদের শাস্ত্রকথিত মানবমনের ৮/৯টি ভাবের মধ্যে একটি ভাবকে 'বিস্ময়' বলা হয়েছে। যার রস-পরিণতি—'অদ্ভুত'। তবে অন্যান্য ভাবগুলিও রসায়নকালে কিছু অদ্ভুত বা 'বিস্ময়'-এর মিশ্রণ না পেলে 'রস' হয়ে উঠতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ-উদাহৃত বৈষ্ণবগান 'তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে'—এর মধ্যে যে একটি অচেনা-র (বিদেশিনী) বিস্ময় কাজ করেছে—সমস্ত বিশ্বেই এই বিস্ময় কাজ করে বলেই নিতান্ত বাস্তববাদী সাহিত্যেও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। ভয়, ঘৃণা, হিংসা, নৃশংসতা,—এরাও সাহিত্যে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিশ্বসৃষ্টিতে স্রষ্টার যে আনন্দ,—দৈনন্দিন লৌকিকতায় যাকে আড়াল করে রেখেছে ;—শিল্পীর রঞ্জনকৃতিত্বে, লিপির যাদুতে সেই হারানো আনন্দকে ফিরে পাওয়া যায়। তখনই 'হারাধন পেলে সে যে হৃদয়-ভরা' (প্রেম-৩২৫)—এখানেই আবার তাকে মনে হয় অচেনা, বিদেশিনী। নতুন করে পাওয়া।

৪

একটি গান খুঁজে দেখা যাক—'কে গো অন্তরতর সে'। (পূজা-৫২৫)।

'পূজা' পর্যায়ের আর একটি গানে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি রচিয়া তুলিছে বিচিত্র তব বাণী'। (পূজা-৮৫)

এই বিচিত্র প্রকাশের কথা বর্তমান 'কে গো অন্তরতর' গানটিতেও আছে।

বহির্বিশ্বের আনন্দরূপ আর ব্যক্তিচিত্তের 'অন্তরতর' আসলে সহৃদয় সম্বাদী সম্পর্কের ব্যাপার। মানুষের খাঁচার ভিতর অচিন পাখির যাতায়াত তো নিত্যই আছে। তাই বিশ্বপ্রকৃতি বাইরে থাকলেও অন্তরে তার প্রতিফলন আর 'অচিন' থাকে না।

কথাটি হচ্ছে উদ্দীপন। বিশ্ব প্রকৃতির সোনালি রূপালি সবুজ সুনীল—এই নানা বর্ণের আলপনার প্রাকৃতিক নানা উপকরণ, রূপ বৈভব হচ্ছে এ গানের উদ্দীপন। এ উদ্দীপনটুকু না থাকলে চিত্ত রসরঞ্জিত হতে পারবে না। এখানে তাই আছে সম্মোহন। 'আমার চেতনা আমার বেদনা' এই অন্তরতরে-র সুগভীর পরশের সম্মোহনে রসরঞ্জিত হয়ে ওঠে। চাঁদের অলখ সম্মোহনে জোয়ার জেগে ওঠে। এ গানে যাদুকরের ওই সম্মোহনটুকু অন্তরায় বিবৃত হয়েছে—

'আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,—
বাজায় হৃদয়-বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ কত সুখে দুখে হরষে।'

বহির্লোক আর অন্তরলোক মিলে মিশে যায়। রূপলোক রসলোকে মিলে যায়। ভাণ্ড আর ব্রহ্মাণ্ড এক হয়ে যায়। 'ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে' (পূজা ৩৪৭)। 'রূপের আড়ালে অরূপ বীণা।' (ঐ)

'তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন, (পূজা ৫২৭) গানটিতেও এভাবে বোঝা যায় বিশ্বপ্রকৃতির উপকরণগুলি কেমন উদ্দীপিত হয়ে তাদের নেপথ্যবর্তী 'আনন্দরূপমমৃতম্‌কে প্রকাশিত করেছে।

তরুণ অরুণ নবীনভাতি
পূর্ণিমাপ্রসন্ন রাতি
রূপরাশি বিকশিত তনু কুসুমবন।' (পূজা ৫২৭)

এই প্রকৃতি যে আমাদের নয়নকে মুগ্ধ করছে, মনকে পুলকিত মোহিত করেছে—এসবের নেপথ্যে রয়েছে 'তুমি',—অর্থাৎ আনন্দরূপমমৃতং। তারই যাদুতে সব প্রাকৃত উপাদানগুলি উদ্দীপিত হয়ে স্বর্গীয় সৌন্দর্যলাভ করছে। 'তোমা পানে চাহি সকলে সুন্দর'। প্রাকৃত উপকরণ অপ্রাকৃত রসলোক প্রস্তুত করছে। এর আর একটি উদাহরণ—'এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ, (পূজা ৫২৬) গানটি।

পাতায় পাতায় সোনার বরণ আলোর নাচন, মধুর আলসভরে আকাশ পরে মেঘের ভেসে যাওয়া, বাতাসের স্পর্শ—এদের উদ্দীপনে অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়। এরই মধ্য দিয়ে আসে ঈশ্বরের প্রেম। প্রভাত আলোর ধারা ঈশ্বরের বাণীর সন্ধান দিচ্ছে। ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের একটি স্নেহ-চুম্বনের চিত্রকল্প এ গানটিকে অলৌকিক মাধুর্য দিয়েছে। এভাবেই প্রাকৃত উপকরণ অমৃত হয়েছে,—তারই মধ্যে ঈশ্বরের চরণস্পর্শ পাচ্ছি আমরা—

'তোমারি মুখ ওই নুয়েছে।
মুখে আমার চোখ থুয়েছে।
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ।'

প্রকৃতির নিছক বাস্তব বর্ণনা 'প্রকৃতি' পর্যায়ের গানে থাকলেও 'পূজা' ও 'প্রেম'-এর গানে নেই। 'পূজা' ও 'প্রেমে'র গানে প্রকৃতি উদ্দীপনের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। 'পূজা'-র আরো গান দেখা যেতে পারে। 'যেতে যেতে একলা পথে'-র 'ঝড়' অভিসারের 'সাথি' হয়েছে ; তার বজ্ররব নূতন পথের বার্তা ঘোষণা করছে। 'এই তো তোমার আলোকধেনু'-র সমস্ত বর্ণনা রূপক হয়ে কৃষ্ণের গোচারণ লীলা-র ছবি এঁকে দিয়েছে,—আর এ প্রসঙ্গেই ভক্ত কবি বিশ্বরাখালের বেণুর আহ্বান আশা করছেন জীবন-গোধূলিলগ্নে।

৫

'প্রেম' পর্যায়ের একটি গান—'একদা তুমি প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে'। গানটি স্মৃতিচারণের গান। প্রিয়া একদা এসেছিল জীবনে ; তারি ফেলে যাওয়া স্মৃতিসরণী বেয়ে মন চলে যায় অতীত-চারণে। প্রিয়া চলে গেছে দূরে পুরনো প্রেমকে ভুলে। কিন্তু সে দিনের মিলন চিহ্নগুলি আজো ধরে রেখেছে সেই হারানো প্রেমকে।

পৃথিবীতে প্রেমের ঘটনা কতই তো ঘটে, কালক্রমে হারিয়েও যায়। কিন্তু স্মৃতির অভিজ্ঞান তাদের বাঁচিয়ে রাখে, এবং সফল কবির হাতে তা হয়ে ওঠে কালজয়ী।

এ গানটিতে সে অভিজ্ঞান দেখছি কয়েকটি শব্দের মধ্যে ;—(১) তরুমূলে ; (২) নদী—, যার স্রোতের আঁকাবাঁকা ঢেউ-এ আছে প্রিয়ার বেণীর প্রতিরূপ, যার কূলে আছে প্রিয়ার পদরেখা ; (৩) তৃণে তৃণে প্রিয়ার কণ্ঠের রাগিণীর অনুরণন ; (৪) চাঁপা ফুল—আঁচলে রাখা মালা-গাঁথার চাঁপা ফুল,—কবির জীবনের ফাল্গুন আজো যে ফুলে তার হরষণ-সুধা-ঢালা পরশন খুঁজে ফেরে।

কাব্যে অলংকারের ভূমিকা সবচেয়ে বড়ো এ অর্থে, যে,—অলংকারের সীমিত কুশল প্রয়োগে ব্যক্তির বেদনা বিশ্বজনীন হয়ে যায়। যে কথা একান্তই কবির, তা অলংকারের, ধ্বনির রণনে শ্রোতা-পাঠকের হৃদয়তারে রাগিণী হয়ে বেজে ওঠে—তা হয়ে ওঠে সহৃদয়। এ গানটিতে ওই শব্দ চিহ্নগুলি প্রেমিক কবির বেদনার উদ্দীপন হিসেবে অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত।—বিশেষত শেষের আভোগ-এর পংক্তিগুলি শ্রোতা কখনোই ভুলতে পারে না।—

'গাঁথিতে যে আঁচলে ছায়াতলে ফুলমালা
তাহারি পরশন হরষণ-সুধা-ঢালা,
ফাগুন আজো যে রে খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে।' (প্রেম ২৯৩)

প্রিয়ার কাছে সব ফাঁকি হয়ে গেছে, সে ভুলে গেছে হয়তো সব ; কান্নাটা রেখে গেছে শ্রোতার জন্যে, চিরতরে। যতদিন ফাগুন থাকবে—ততদিন সেই খুঁজে ফেরার দীর্ঘশ্বাস থাকবে।

৬

আর একটি গান, শেষ বয়সের প্রেমের গান—যে বয়স জানে—অপ্রাপ্তিটা দুঃখজনক হলেও সামান্য প্রাপ্তিটার মূল্যও তো কম নয়, বিন্দুতেও তো সিন্ধুর স্বাদ মেলে।

'যদি হায়, জীবন পূরণ নাই হল মম
তব অকৃপণ করে'—(প্রেম ২২৮)।

এ গানে দুটি উদ্দীপন বাচক-উপাদান আছে। (১) আলোছায়া,—ক্ষণিকের আলোছায়া, পূর্ণ আলো নয়,—স্মৃতির আলপনা এঁকে যায় ভাবনার প্রাঙ্গণে। সারা জীবন এ আলপনা ভাবনাকে সম্পন্ন করে রাখে। (২) বৈশাখের শীর্ণ নদী—এ নদীতে ভরা স্রোতের দান নেই, তবু তার ক্ষীণ ধারার পলাতক শীতল স্পর্শ পিপাসিতকে তৃপ্ত করে। বহু বাসনা নয়, তীব্র বাসনা নয়, ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে যতটুকু পাওয়া যায় তাই যেন যথেষ্ট। দিবসের দৈন্যের সঞ্চয়, কিন্তু স্বপ্নচারণার আয়োজনকে সে অসীম করে তোলে, শুধু কবিব্যক্তি নয়—দূরকালের দূরদেশের শ্রোতার /পাঠকের জন্যেও।

আর দুটি গানের কথা বলি। দুটি গানেরই প্রধান উদ্দীপন ফুল। যা প্রেমের ও প্রেমের স্মৃতির উদ্দীপকের সুন্দর উপকরণ।

'এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে' (প্রেম ২২৩)—বিদায়ের গান ; বিদায় জানবার এবং বিদায় উপহার দেবার গান।

জীবনে যাই হোক, কাব্যে মিলনের চেয়ে বিরহের গানই মধুরতর—Sweetest songs...। কারণ দুঃখ সেখানে মিলনের চেয়ে কিছু বেশি দেয়। ('তার হাতে ছিল হাসির ফুলের ভার' গানটিতে রবীন্দ্রনাথ তা বুঝিয়েছেন।)

এ গানে উদ্দীপনের উপাদান প্রধানত ফুল—ফুলের মুকুল—যা বিদায়ের পরে ফুটে উঠবে প্রেমিকার কোলে। পটভূমিকে মেদুর করে দেওয়ার জন্যে রাখা হয়েছে আরো কয়েকটি উপকরণ,—উদাসী হাওয়ার পথ, তন্দ্রাহারা বৌ কথা কও, বিভোর রাত, বসন্তপূর্ণিমা বা দোলের পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাধারা। কাল যখন মুকুলগুলি ফুটবে নায়িকার মালা গাঁথার আঙুলের মাঝে—তখন এই দুজনের কানাকানি কথা, দুজনের মিলন বিহ্বলতা—আজকের এ সমস্তের আভাসগুলি সে মালায় গাঁথা থাকবে।

৭

আর একটি গান—'দিন শেষের রাঙা মুকুল' (প্রেম ১০১)। এ গানের 'মুকুল' যেন রূপকের মতো নায়িকার প্রেমেরই প্রতীক। উপমান এবং উপমেয় একই সঙ্গে পূর্ণ পরিণতির আকাঙ্ক্ষী। দিনশেষের রাঙা মুকুল,—দিনশেষের গোধুলি আলোর রং লেগেছে সে মুকুলের গায়ে। এ মুকুল জাগছে 'চিতে'—অর্থাৎ নায়িকার হৃদয়ের বিকাশোম্মুখ প্রেমের কথাই জানাচ্ছে। প্রেমের মঞ্জরীতে সংগোপনে ফুটে উঠবে—শ্রোতার মনে আসন্ন মিলনের আশ্বাস দিয়ে। নায়কের অভিসারের পথকে গন্ধমদির করে দেবার জন্যে রাঙা মুকুলের মঞ্জরী 'মন্দবায়ে অন্ধকারে' দুলবে।

কাব্যের পূর্ণতা জীবনের চেয়ে একটু অন্যরকম। নায়ক এলে বাস্তব জীবনের অভিসার পূর্ণ হতো—কিন্তু তাতে চিরকালের শ্রোতা/পাঠকের কী লাভ হতো? এ গানে নায়িকার প্রার্থনা—'রাত যেন না বৃথা কাটে প্রিয়তম হে—না, না।

এসো এসো প্রাণে মম, গানে মম হে,
এসো নিবিড় মিলনক্ষণে রজনীগন্ধার কাননে।'

অথচ বলা হল 'স্বপন হয়ে এসো আমার নিশীথিনীতে
—ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে।'

প্রকৃতিকে তার আপন স্বরূপে বর্ণনা প্রায় অসম্ভব। কারণ কবির ইন্দ্রিয়ের ছোঁয়া তো কিছুটা লাগবেই। তবু 'বিশ্ববীণারবে'-র মতো দু একটি গানে প্রকৃতির objective বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় 'প্রকৃতি' পর্যায়ের প্রায় সব গানেই নটরাজের উভয় চরণেরই আঘাতের চিহ্ন পড়েছে। নয়তো রসলোকে আলোড়ন আসতে পারতো না। প্রকৃতির বর্ণনা বিজ্ঞানে ভূগোলে যান্ত্রিক যাথার্থ্যে করা সম্ভব হলেও কবির কবিতায় তা অসম্ভব। সেখানে চেতনার রং (pathetic fallacy) লাগবেই।

সে রং 'প্রকৃতি' পর্যায়ের সর্বত্রই আছে। দু'একটা উল্লেখ করি—

'আজ বারি ঝরে ঝরো ঝরো'—এটা বাইরের আকাশের ঘটনা, যার বর্ণনা পাওয়া যাবে অন্তরা পর্যন্ত। কিন্তু সঞ্চারীতে এসেই এ বর্ষা নামছে কবির হৃদয়ে, অন্তরাকাশে (subjective) ⊢

"ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, লুটেছে এই ঝড়ে—
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে।
অন্তরে আজ কী কলরোল, দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল
হৃদয়মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে।" (প্রকৃতি/বর্ষা-৩৪)

এ বর্ষার মাতন ঘটছে 'বাহিরে', 'ঘরে'—উভয়ত্রই।

'আমার বনে বনে ধরল মুকুল'—এটা বহির্ভুবনের বনভূমির ব্যাপার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরলোকের কথাও আছে—'বহে মনে মনে দক্ষিণ হাওয়া।' (প্রকৃতি/বসন্ত ২০০)

৮

প্রকৃতির গাছপালা ফুল হাওয়া—এ সব উপকরণের মধ্যে মানব চরিত্র ও মানবিক সম্পর্ক আরোপ করে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ঋতুনাট্য প্রস্তুত করেছেন—'বসন্ত', 'নটরাজ'! প্রভৃতি। সেগুলি স্বতন্ত্র আলোচনার ব্যাপার। ('নটরাজ' প্রবন্ধ দেখুন)

'ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে'—গানটি 'ফাল্গুনী'-র অন্তর্গত। নাট্যসূত্র বাদ দিয়ে গীতবিতানের 'প্রকৃতি' পর্যায়ের বসন্তঋতুর গান হিসেবেই আলোচনা করছি।

এ গানে মানবচরিত্র-গুণ আরোপ করে প্রকৃতিকে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রকৃতিই প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।

'লেগেছে' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। 'লগ্ন' হওয়া থেকে 'লেগেছে' কথাটি এসেছে। যেন বাইরে থেকে এসে দখল জমিয়েছে। ঋতুরাজ বসন্ত এসেছে মৃতপ্রায় প্রকৃতিকে নাড়িয়ে দিতে, জাগিয়ে দিতে। 'লেগেছে' শব্দটির মধ্যে লৌকিক ব্যবহারের আঁচও পাওয়া যায়। 'ফাল্‌গুন' শব্দটিও বোধহয় সে কারণেই 'ফাগুন'-এ পরিণত হয়েছে। 'ফাগুন লেগেছে' বাক্যাংশটির সঙ্গে 'আগুন লেগেছে'-এর ধ্বনিগত মিল আছে। আর বসন্তের পলাশ শিমূল কৃষ্ণচূড়ার রঙের সঙ্গে ফাল্‌গুন ও আগুন—উভয়েরই যোগ আছে।

'মর্মরে মোর মনে মনে'—বাক্যাংশটিতে কবির আপন মনের অনুভূতিও (মন্ময়তা, Subjectivity) প্রকাশ পেয়েছে।

বনভূমি-র সর্বত্রই দাবানলের মতো 'ফাগুন' লেগেছে। তারই সঙ্গে যোগ রেখে

আকাশেও রঙ লেগেছে। বসন্তযৌবনা পৃথিবী সেজেছে আকাশের মন ভোলাতে। যেন ধ্যানমগ্ন অটল সন্ন্যাসীর তপোভঙ্গের জন্যে উর্বশীর আবির্ভাব। বর্ণগীতবৈভবে অলংকৃতা অবনী যেন নিরঞ্জন তপস্বীর ধ্যান ভাঙতে পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করছে। আর অতল ধ্যানলোকের মগ্ন গভীরতায় লাগছে শিহরণ।

'হের হের অবনীর রঙ্গ,—গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তার মৌন রহে না আর।
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।'

আভোগ অংশটিতে মানব স্বভাব আরো প্রকট।

'বাতাস ছুটিছে বনময় রে,
ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে।' (প্রকৃতি/বসন্ত-২০৭)

এই উন্মাদ ফাগুন হাওয়ার বসন্তবিভ্রমের এমনি একটি ছবি 'প্রেম' পর্যায়ের একটি গানে ও আছে—

'পাগল হাওয়া বুঝতে নারে
ডাক পড়েছে কোথায় তারে—
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো।'
(প্রেম ৯৪/'পরিত্রাণ')

৯

রবীন্দ্রনাথ কোনো খণ্ডকেই পূর্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে খণ্ড তো পূর্ণেরই অংশ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভুবনও আকাশেরই অংশ। প্রকৃতির ছয় ঋতুর ক্ষণকালিন রংবদলের বর্ণনাকালে কবি ভোলেননি যে মানুষও অখণ্ড বিশ্বপ্রকৃতির অংশ। সুতরাং মানুষের এই মহৎ গরিমা তাঁকে পূর্ণের অনুভব এনে দেয়। 'রিক্ততার বক্ষ ভেদি' আপনার স্বরূপকে দেখতে তিনি আগ্রহী; 'সেই পূর্ণতার পায়ে' তিনি স্থান প্রার্থনা করেন। গীতবিতানের টুকরো গানগুলির ইংগিত ওই পূর্ণতার মহাকাব্যের দিকে। 'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে' গানটির সঞ্চারী-আভোগে তিনি তাঁর কালহারা অস্তিত্বের কথা স্মরণ করেন।

'প্রথম যুগের বচন শুনি মনে
নব শ্যামল প্রাণের নিকেতনে।
'পুবহাওয়া ধায় আকাশতলে,
তার সাথে মোর ভাবনা চলে
কালহারা কোন্ কালের পানে ছুটে।' (প্রকৃতি/বর্ষা-৫৬)

এই 'পুরাতন প্রাণের টানে' (প্রকৃতি ৫৪), 'ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা' (প্রকৃতি ৬৪) প্রভৃতি পংক্তি সুদূর কালের কথা মনে করায়।

শুধু এই নয়, অন্তহীন কাল, সীমাহীন দেশ-এর কথাও আছে অন্তিমত, তাঁর গানে।

১০

আকাশের কথা বলি। আকাশও প্রকৃতির অংশ বা পূর্ণ প্রকৃতিও বলা যায়। উপনিষদে বলা হয়েছে—ওঁ খং ব্রহ্ম। খ = আকাশ। 'ওরে ভাই, ফাগুন...' গানটিতে যে গগনের কথা বলা হয়েছে তা পৃথিবীরই অংশ বা অঙ্গ। কিন্তু এই 'খ' বা আকাশ অনন্ত,—তাই এই সৌরলোক, নক্ষত্রনীহারিকাদি-বেষ্টিত পৃথিবী-এ অবনী, সবই ওই 'খ' বা মহাকাশের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সেই অসীম আকাশ থেকেই—

'ঝরছে জগৎ ঝরণাধারার মতো, (বিচিত্র-৩৬)। কবিও ওই 'আকাশডোবা ধারার দোলায়' দুলছেন অবিরত।

আকাশের অসীম কালো-ই অনন্তব্যাপ্ত। কিন্তু সে কালো কি নেতিমূলক অন্ধকার (অর্থাৎ আলোর অনস্তিত্ব) ? তা নয়। এই অনন্ত লোকের অনাবিষ্কৃত অনধিগত অঞ্চলে যে আলো আছে তাকে প্রাচীন কালের মনীষীরা বলেছেন—'ব্রহ্মজ্যোতিঃ'। যা সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রেও নেই। 'কুতো অয়ম্ অগ্নিঃ ?' এই জ্যোতির আভাসও গীতবিতানে আছে। উপনিষদ/গীতা-কথিত ওই ব্রহ্মজ্যোতিঃ বা ব্রহ্মলোক অর্থাৎ অসীমের ধারণা রবীন্দ্রনাথের ছিল। গীতায়—

ন তদ্‌ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

অথবা উপনিষদের—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঅয়ম্ অগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।

এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ বা তার আধার যে অনন্ত দেশ-কাল—তার আভাস দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের 'তাঁহারে আরতি করে' 'আজি শুভ শুভ্র প্রাতে', 'কেমনে রাখিবি তোরা', 'অসীম কালসাগরে', 'মহানন্দে হের গো', 'মহারাজ একি সাজে', হে মহাপ্রবল বলী', প্রভৃতি গানের পংক্তিতে।

এই ব্রহ্মজ্যোতিরই আলোর কণিকায় জন্ম পেয়েছে সূর্য-চন্দ্র-নীহারিকা-ছায়াপথ। এদের তো ক্ষয় আছে, বিনাশ আছে, নির্বাণ আছে। কিন্তু সেই অনির্বাণ আলোকের তো ক্ষয় নেই।

রবিশশী গ্রহ তারা হয় নাকো দিশাহারা,
সেই আঁখিপরে তারা আঁখি রেখেছে॥ (পূজা-৫০৬)

কবি তারই স্পর্শ চেয়েছেন তাঁর গানে।

'নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা—
'আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা।
নির্বাণহীন আলোক-দীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি'। (পূজা-৯)

এই বিশ্বজগতের চিরদিনের কান্না হাসি উঠছে ভেসে রাশিরাশি—

'এসব দেখতেছে কোন্ নিদ্রাহারা নয়ন অবনত।
ওগো সেই নয়নে নয়ন আমার হোক্-না নিমেষ হত—

প্রকৃতি ও বিশ্ব-প্রকৃতির অঙ্গ হিসেবে কবি নিজেকে অনুভব করে, গর্বিত, বিস্মিত। 'পূজা' পর্যায়ের গান—(৩৩৭)

'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।।'

এই বিস্ময় থেকেই আসে গান। এবারে সেই গানটিই বিনা ব্যাখ্যায় তুলে দিচ্ছি—

'আকাশ-ভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।
অসীম কালের যে হিল্লোলে
জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি,
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।

বুকের কাছে বাজল যে বীণ

(১)

বিধাতার বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সংগীতের এক অদৃশ্য কিন্তু অচ্ছেদ্য যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গীতবিতান'-এর ভূমিকা হিসেবে যে অপূর্ব একটি গানকে উপস্থিত করেছেন— তার মাধ্যমে সে কথা আবার নতুন করে, যেন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় শুনতে পেলাম।

যখন তপোবনগুলির প্রার্থনা চলছিল— অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবীরাবীর্ম এধি— তখনই স্ফোটবাদেরও ইঙ্গিত পেয়েছি আমরা। জেনেছি, সৃষ্টির আদিতে আছে প্রণব, আছে অনাদি অনাহত ধ্বনি। রবীন্দ্রনাথ 'গীতবিতান'-এর ভূমিকায় বলেছেন, সৃষ্টির প্রথম যুগে 'প্রকাশপিয়াসী ধরিত্রী বনে বনে শুধায়ে ফিরিল সুর খুঁজে পাবে কবে।' এই প্রকাশ বা আবিঃ-এর সঙ্গে সংগীতের যে সম্পর্ক তারই বিশ্লেষণ আছে স্ফোটবাদে।

পূর্বকালের ধ্যানী জ্ঞানীদের সাধনার চরম বিকাশ যদি পেয়ে থাকি উপনিষদ বা বেদ-এ, তবে একালের দর্শন আছে রবীন্দ্রনাথে— আর 'গীতবিতান' হচ্ছে এ কালের উপনিষদ, বেদ এবং গীতা। কলৌ নামৈব কেবলম্! বলা উচিত কলৌ গানৈব কেবলম্। আর তার জন্যে আছে গীতবিতান। এতদিন গীতা পাঠ করে এসেছি, এবার আসুন গীতবিতান গেয়ে দেখি।

এই স্ফোট কী? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— 'All this expressed sensible universe is the form, behind which stands the eternal inexpressible Sphota, the manifester as Logos or Word. This eternal Sphota, the essential eternal material of all ideas or names, is the power through which the Lord creates the universe : nay, the Lord first becomes conditioned as the Sphota, and then evolves Himself out as the yet more concrete sensible universe.'[১] অনন্ত এ বিশ্বসৃষ্টির কারণই এই স্ফোট, (স্ফোট শব্দটির অর্থ = ফুটে ওঠা বা প্রকাশ হওয়া, বিকশিত হওয়া)।

এরপরেই তিনি বলেছেন— 'This Sphota has one word as its possible symbol, and this is the 'OM'[১]

এই 'ওম্' শব্দটি আলোচিত হয়েছে নানা উপনিষদে। বরুণ তাঁর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু পুত্র ভৃগুকে বলেছেন— 'ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্।'[২] 'ওম্' এই অক্ষরটিই ব্রহ্মের বাচক)। এই সমস্তই ওঙ্কার অর্থাৎ ওঙ্কার দ্বারাই সমস্ত শব্দজগৎ পরিব্যাপ্ত।[২]

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের ব্যাখ্যায় আছে— 'ওম্ শব্দের ভেতর পাই অ উ ম তিনটি অক্ষরের সমাবেশ। শব্দতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় অ-উ-ম তিনটি

অক্ষর বিশ্বের সকল শব্দের সৃষ্টিকেন্দ্র বা উৎস। ... অ-কারেই সকল উচ্চারিত বর্ণ ও শব্দের প্রথম প্রকাশ ও স্থিতি এবং ম-কারেই সমাপ্তি।'[৩]

বিশ্বের প্রকাশ ও বিবর্তনের সঙ্গে যে গানের উপমা আছে রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানে তা বিচিত্রভাবে উপস্থিত। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'শোনা' প্রবন্ধটির অংশবিশেষ পড়ে দেখা যাক।

'বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে।
অমল কমল-মাঝে, জ্যোৎস্নারজনী-মাঝে,
কাজল ঘন-মাঝে, নিশি-আঁধার-মাঝে
কুসুম-সুরভি-মাঝে বীণরণন শুনি যে—
প্রেমে প্রেমে বাজে।

'কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে আমার মন সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে 'বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে।' এ কবি-কথা নয়, এ বাক্যালংকার নয়— আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সংগীত বেজে উঠছে।'

... 'এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্বগানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারিনে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয়— চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানা দিক দিয়ে তাকে নানারকম করে নিই। একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি শুনি, ছুঁই, শুঁকি আস্বাদন করি।

'এই বিশ্বের অনেকখানিকেই যদিও আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি নে, তবুও বহুকাল থেকে অনেক কবি এই বিশ্বকে গানই বলেছেন। গ্রীসের ভাবুকেরা আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর যাতায়াতকে নক্ষত্রলোকের গান বলেই বর্ণনা করেছেন।...'

'গায়ত্রী মন্ত্রে তাইতো শুনতে পাই সেই বিশ্ব সবিতার ভর্গ, তাঁর তেজ, তাঁর শক্তি ভূ ভুর্বঃস্বঃ হয়ে কেবলই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে এবং তাঁরই সেই এক শক্তি কেবলই ধী-রূপে আমাদের অন্তরে বিকীর্ণ হচ্ছে। কেবলই উঠছে, কেবলই আসছে সুরের পর সুর, সুরের পর সুর।'

'... এখন কেবল এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, সব তারগুলি বেশ এঁটে বাঁধা চাই, ঢিল দিলেই ঝন্‌ঝন্ খন্‌খন্ করে। যেমন এঁটে বাঁধতে হবে তেমনি তাকে মুক্তও রাখতে হবে— তার উপরে কিছু চাপা পড়লে সে আর বাজতে চায় না। নির্মল সুরটুকু যদি চাও তবে দেখো তারে যেন ধুলো না পড়ে, মরচে না পড়ে— আর প্রতিদিন তাঁর পদপ্রান্তে বসে প্রার্থনা করো— 'হে আমার গুরু, তুমি আমাকে বেসুর থেকে সুরে নিয়ে যাও।'[৪]

দর্শনাদি ব্যাপারে তাঁর বাছবিচার ছিল না। তবে একথা ঠিক যে তাঁর দার্শনিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল উপনিষদেরই মন্ত্রভিত্তিতে। তাই বিশ্বসৃষ্টির আদিতে যে চিরন্তন অনাহতের ধ্বনি ঋষিরা শুনেছেন রবীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কে বধির ছিলেন না। এই অনাহত ধ্বনির গান—

'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা॥
বাজে অসীম নভোমাঝে অনাদি রব...'।[৫]

আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে'—রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশ্বস্রষ্টার এ 'আনন্দ রূপ' আমরা বারবার লক্ষ্য করি। 'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা' শীর্ষক এ ভাঙাগানটিতে, এবং অন্য বহু গানেই সেই অনাহত আনন্দগানের 'অনাদি রব'-এর কথা আছে।

এই অনাহত ধ্বনির গান কোথায় বাজে, সে গান শোনার মতো ইন্দ্রিয়ই-বা কোথায়! অনাহত ধ্বনি বেজে চলেছে বিশ্ব-বীণারবে। রবীন্দ্রনাথ সেই বীণা শোনার মতো ইন্দ্রিয় চান। বিশ্বরূপ দর্শনের জন্যে অর্জুনের যেমন প্রয়োজন বিশেষ দিব্যদৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথেরও তারই প্রার্থনা। দিব্য শ্রুতি— 'দাও মোরে সেই কান'। (পূজা-২২২)

বিশ্ববীণা-র গান বাজাবার জন্যে চিত্তবীণাকেও সেই আদলে গড়ে তুলতে চান কবি।

'সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্তবীণার তারে'। (পূজা-২২২)

'শোনা' প্রবন্ধে যেমন বলেছেন—'সব তারগুলি বেশ এঁটে বাঁধা চাই।' সেই এঁটে বাঁধা, সুরে বাঁধা চিত্তবীণা রবীন্দ্রনাথ আয়ত্ত করেছিলেন। তাই তিনি অনাহত 'অনাদি বীণাধ্বনি' শুনতে পেয়েছেন।—

'শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণাধ্বনি।'[৫] (পূজা-৫৩৭)

এ গানটিতে যেমন বহির্জগতের মন্দানিল-বসন্ত-পুণ্য-গন্ধে পুলকাকুল অন্তরে অনাদি বীণাধ্বনি শোনা যাচ্ছে— 'হৃদয় শশী হৃদি গগনে উদিল' গানটিতেও তেমনি—

'....গভীর সংগীত দ্যুলোকে ধ্বনিছে....
চিত্তমাঝে ... বাজে রে অপরূপ তন্ত্রে...।'

রবীন্দ্রনাথ একটি গান রচনা করেছেন— 'প্রথম আদি তব শক্তি', যার সুরের উৎস সোহিনী রাগের 'প্রথম আদ শিবশক্তি' শীর্ষক একটি সুরফাঁকতালের ধ্রুপদ। শিবশক্তি-সম্পর্কিত পৌরাণিক-আধ্যাত্মিক ভাবনায় তাঁর সায় না থাকলেও বন্দেশটির শব্দ ও ভাব-কাঠামো তাঁকে প্রভাবিত করেছে। গানটি নিম্নরূপ—

প্রথম আদ শিবশক্তি, নাদ পরমেশ্বর,
নারদ, তুম্বুরু, সরস্বতী ভণ রে॥
অনহূত আদ নাদ, গুণ সাগর স্বরূপ,
অচ্ছর সুধ বুধ মত গুণীগণ রে॥ ইত্যাদি (বৈজুবাওরা।)
রবীন্দ্রনথের ভাঙা গানটিঃ-
প্রথম আদি তব শক্তি-
আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে
গগনে গগনে॥
তোমার আদি বাণী বহিছে তব আনন্দ,
জাগিছে নব নব রসে হৃদয়ে মনে॥

তোমার চিদাকাশে ভাতে সূরয চন্দ্র তারা,
প্রাণতরঙ্গা উঠে পবনে।
তুমি আদি কবি কবিগুরু তুমি হে,
মন্ত্র তোমার মন্দ্রিত সব ভুবনে।।[৫]

মূল গানে শিবশক্তি নাদের (শিব → শক্তি → নাদ) কথাই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানটিতে বিশ্বস্রষ্টাকে আদি কবি সম্বোধন করা হয়েছে। সেই কবির কবিতাই সব ভুবনময় মন্দ্রিত। এই সর্বব্যাপ্ত শক্তিই জোতি রূপে, বাণীরূপে প্রকাশিত। এই বিশ্বপ্রকৃতি যে স্রষ্টা-কবির মানস পরিকল্পনারই ব্যক্তরূপ, সেই মন্ত্রই যে বিশ্বে ধ্বনিত,—সঞ্চারীতে সে কথা বলা হয়েছে। স্রষ্টার এই মনোভূমি সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,—

'....অস্ফুট মন-আকাশে জগৎ সংসার ভাসে।'[৩]

এই 'মন-আকাশ ; বা হৃদয়াকাশ সম্পর্কে ছান্দোগ্য উপনিষদে আলোচনা আছে।[৭] রবীন্দ্রনাথের গানটিতেও ওই আদিকবির মনোলোকের সূর্য-চন্দ্র-তারার বা পবনের প্রাণতরঙ্গোর কথাই বলা হয়েছে।

সেই আদি অব্যক্ত বাণীর ব্যক্ত রূপই যে এই বর্তমান বিশ্ব—'বাণী তব ধায়' গানটিতে সেই ভাবটি বিস্তৃত হয়েছে।—

বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে গগনে লোকে লোকে,
তব বাণী গ্রহ চন্দ্র দীপ্ত তপন তারা।।
সুখ দুখ তব বাণী, জনম মরণ-বাণী তোমার,
নিভৃত গভীর তব বাণী, ভক্তহৃদয়ে শান্তিধারা।।[৫]

বহির্বিশ্বে ও অন্তরলোকে এই বাণীরই সংগীত ধ্বনিত।

(২)

কত সুন্দর সুন্দর অলংকার, চিত্রকল্প গড়ে উঠেছে গীতবিতানের গানগুলিতে। স্রষ্টা আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন কবির মনে—সুরের আগুন। সে আগুনে জ্বলছে প্রকৃতি। তারই মধ্যে—

'নিশীথের বুকের মাঝে এই-যে অমল
উঠল ফুটে স্বর্ণকমল, রে....।' (পূজা-৬)[৫]

একটি নবীন জীবন কীভাবে জন্ম নেয়, কীভাবে বেড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে, তার একটি সুন্দর চিত্র আঁকা আছে একটি গানে।—মৃত্যোর্মামৃতং গময় —এই কথাটি রূপ পেয়েছে অনন্য ভঙ্গিতে 'তোমার কাছে এ বর মাগি' গানটিতে। একটি জীবন্ত চলচ্ছবি আঁকা হয়েছে মাটি থেকে জন্ম নেওয়া তরুতৃণের মধ্য দিয়ে।—

'তোমার কাছে এ বর মাগি
মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে।'[৫]

গানের সুরই নবজাতককে 'মাতার স্তন্যসুধা-হেন নবীন জীবন দেয় গো পুরে।' গান যেমন বাঁশির বুকে জন্ম নেয়, তেমনি—

'সেথায় তরু তৃণ যত
মাটির বাঁশি হতে ওঠে গানের মতো।

তৃণ-তরুর পক্ষে যেমন আলোকসংশ্লেষ, নবজাতকের পক্ষেও তেমনি আকাশের আলোর প্রয়োজন— যে আলোক অসীম আকাশের আনন্দবাণীকে নিয়ে আসবে গানের সুরের মাধ্যমে। বিশ্বপ্রকৃতিতে জীবনের যে উদ্ভব তা ওই বাঁশির গানের তানেরই মতো।

বিশ্বের সর্বত্রই, সব কিছুর মধ্যেই গান। আমরা গানের ঝরনা তলায় দাঁড়িয়ে আছি—'যে সুর গোপন গুহা হতে ছুটে আসে আকুল স্রোতে' (পূজা-৩০)[৫] তারই ধারায় অবগাহনের জন্যে। প্রভাত সূর্যের স্বর্ণরঙে আকাশের উদ্ভাস, সেও তো উষার বাণী নিয়ে সুরেরই আগমন।

আবার চৈত্র দিনের মধুর খেলা খেলে—যাবার সময় চাঁপার পেয়ালা ভরে উজাড় করে দেয় আপনাকে— সেও তো গান।

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির যুগের 'পূজা' পর্যায়ের গানগুলির মধ্যে বহু গানেই আছে ঈশ্বরের সঙ্গে কবির গায়ক-শ্রোতার সম্পর্ক। এসব গান 'পূজা' পর্যায়ের অন্তর্গত হলেও মনে হয় ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ।

গীতবিতানের গানগুলিতে সাঙ্গীতিক উপকরণগুলি ব্যবহৃত হয়েছে বারবার। তাঁর গানে বীণা বাঁশি মন্দিরা একতারা বহুবার এসেছে। শুধুমাত্র যন্ত্র হিসেবেই নয়,—জীবনের ভিত্তি হিসেবে, সুখ দুঃখের সঙ্গী হিসেবে। কাব্যগুণে গীতবিতানের বহু গান কবির বহু কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। দু-একটি উপমা, চিত্রকল্প বা সুন্দর প্রয়োগের কথা উল্লেখ করি। রবীন্দ্রনাথের অলংকার প্রয়োগে আতিশয্য নেই, নেই কষ্টকল্পনার আড়ষ্টতা। এ যেন জন্মলব্ধ লাবণ্য। ভাব থেকে একে স্বতন্ত্র করা যায় না—যাকে বলে অপৃথগ্‌যত্ন নিবর্ত্য।

'আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু বাজিল গম্ভীর গরজনে'[৫] গানটির সর্বাঙ্গেই রয়েছে গম্ভীর ভাবোদ্দীপক মহাপ্রাণবর্ণ ও যুক্তাক্ষরবহুল অনুপ্রাস ও ধ্বনিসমষ্টি। ঝড়বৃষ্টির উন্মত্ততা বোঝাতে প্রচণ্ড ডম্বরু-র ধ্বনিকে সমস্ত গানটির মধ্যেই ছড়িয়ে দিয়েছেন কবি।

রবীন্দ্রনাথের গানে গজলের মতো মদিরা, সাকী, পেয়ালা প্রভৃতির আমদানি যেটুকু হয়েছে তা ধ্রুপদী অথচ কাব্যময়। এ গানে আছে—

'কদম্বকুঞ্জের সুগন্ধমদিরা অজস্র লুটিছে দুরন্ত ঝটিকা।' বাদল দিনের আর একটি গানে এনেছেন—

'বৃষ্টিনেশাভরা সন্ধ্যাবেলা কোন বলরামের আমি চেলা,
আমার স্বপ্ন ঘিরে নাচে মাতাল জুটে।' (প্রকৃতি-বর্ষা-১৩৭)[৫]

এ বলরাম মহাভারতের বলরাম হতে পারেন, যিনি কিছুটা মদিরাসক্তও ছিলেন,—আবার লোকায়ত সাধক বলাখ্যাপাও হতে পারেন—যাঁর সম্প্রদায়ে মদিরা-মত্ত নৃত্য উপাসনারই উপকরণ।

'আঁধার অম্বরে'-এর চেয়েও ঝড়বৃষ্টির উন্মত্ততা ফুটে উঠেছে বেশি 'মধু-গন্ধে ভরা' গানটির সঞ্চারীতে, এবং সেখানকার মদিরাও লৌকিকতার মালিন্যমুক্ত হয়ে রসলোকে পৌঁছে দেয় আমাদের—

'পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয়মদিরা
উন্মুখর তরঙ্গিনী ধায় অধীরা।' (প্রকৃতি-বর্ষা-১০৪)[৫]

আর দুটি গানের কথা বলি, যেখানে ফুলের বিকশিত হয়ে ওঠার সঙ্গে প্রেমের আনন্দ-বেদনার গতি-পরিণতি-সম্পর্ক বড়ো সুন্দর দেখানো হয়েছে—একটিতে মিলন, অন্যটিতে বিদায়।

'দিন শেষের রাঙা মুকুল'[৫] (পূজা-৩০) সংগোপনে ফুটবে প্রেমের মঞ্জরীতে।' সম্পূর্ণ গানটির মধ্যে দিয়ে এই বিকশিত হয়ে ওঠারই কথা বলা হয়েছে। তেমনি 'এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে'[৫] যে মুকুলগুলি ঝরে পড়ে তাদেরই পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠার কথা আছে এই দ্বিতীয় গানটিতে। প্রথমটিতে রাঙা মুকুলের এবং প্রেমিকের আছে মধুর মিলনের আশ্বাস আর দ্বিতীয়টিতে আছে বিদায় বেদনার আর্তি—উভয়ই বড়ো সুন্দর এবং জীবন্ত গতিশীল রূপ পেয়েছে গান দুটিতে।

এরকম সুন্দর চলচ্ছবির অলংকরণে গীতবিতান অতুল্য।

বীণা বা বাঁশির প্রয়োগ সম্পর্কে দু'একটি গানের কথা বলি।

'আঁধার অম্বরে'তে ডম্বরু আছে, যা শিবের তাণ্ডবের সঙ্গী। বীণা বহুবার বহুভাবে বহু গানে এসেছে। আকাশবীণা (আমার নয়ন ভুলানো), অগ্নিবীণা (অগ্নিবীণা বাজাও), প্রভৃতির চেয়ে আরও বহু ব্যঞ্জনাবহ প্রয়োগ রয়েছে 'বাজে করুণ সুরে'-র 'পন্থবীণা' শব্দটিতে। পথের সঙ্গে বীণার তুলনা নজিরবিহীন। 'নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে' নায়কের 'চরণচুম্বিত' পথটিকে নায়িকার মনে হয়েছে বীণার করুণ গানের মতো। নায়কের স্মৃতিকে বহন করে পথ চলে গেছে দূরে।[৫] কোন ভাঙনের পথে'[৫] (প্রেম-২২১) সে এসেছিল? 'কোলে নিয়ে ছিলে সেতার (বীণা), মীড়। 'দিলে নিষ্ঠুর করে।' তারপরে 'ছিন্ন হলো যবে তার ফেলে গেলে ভূমি পরে।' তারপরে 'নীরব তাহারি গান' প্রেমিকের দান হয়ে 'ফাল্গুন হাওয়ায় হাওয়ায়' 'সুরহারা মূর্চ্ছনাতে' বেজে চলে সারাজীবন। 'পন্থবীণা' ও তেমনি বেজে চলেছে করুণ সুরে।

'পন্থবীণা' শব্দটি কবীর-এর গানে আছে— 'পন্থবীণা সতরাগ উচারে।' রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ–Harp of the poems. ('One hundred poems of Kabir) তবে 'করুণ সুরে'-র ব্যঞ্জনা তাতে নেই।

নিজেকে বীণার সঙ্গে একাকার করে দেখার উদাহরণ আছে 'আমারে করো তোমার বীণা,' 'যখন তুমি বাঁধছিলে তার', প্রভৃতি গানে। তবে সব চেয়ে আমার কাছে সুন্দর ও কাব্যময় মনে হয় পন্থবীণা এবং তনুবীণা।—

'কী ধ্বনি বাজে গহন চেতনা মাঝে!
কী আনন্দে উচ্ছ্বসিল মম তনুবীণা।'[৫]

একটি বাঁশিকে চিত্রায়িত করেছেন (বাঁশি' শব্দটি ব্যবহার না করেও) 'অরূপ তোমার বাণী'[৫] গানটিতে। রূপের মধ্যে অরূপের প্রতিস্থাপনার মাধ্যমে মেলে মুক্তি। এ গানে কবি সেই মুক্তিই চেয়েছেন। কেমন করে তা পাওয়া যাবে ?

...... আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিশ্বাস দাও পূরে,
শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক সুরে,.....

পূর্বে-আলোচিত 'তোমার কাছে এ বর মাগি'-তেও এই 'মৃত্যোর্মামৃতং গময়'-সুর প্রসঙ্গে বাঁশির উল্লেখ আছে।

'তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে'[৫] গানটিতে আছে—

আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল আঁধার যামিনী,
সে যে তোমার বাঁশরি।

এ যেন mystic - দের হৃদয় গহনে ঈশ্বরের গোপন আহ্বান ; অথবা রাধার 'কানের ভিতর দিয়া' মরমে প্রবিষ্ট মহাকর্ষক কৃষ্ণের আহ্বান।

৪

রবীন্দ্রনাথ সুরশিল্পী। কেন সুরকে চাই। তাঁর তো অন্যান্য মাধ্যমও ছিল। সে কারণটি অনুসন্ধান করা যাক।

'ক্ষণিকা' কাব্যের 'যথাস্থান' কবিতায় কবির প্রশ্ন—'কোন হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান ? কোনখানে তোর স্থান ?' গান কিন্তু যেতে চায় সেখানেই যেখানে অনাড়ম্বর সহজ সরল আন্তরিকতা আছে, আছে হৃদয়ের সুখদুঃখের জোয়ার ভাঁটার গল্প।—

সেইখানেতে সরল হাসি সজল চোখের কাছে
বিশ্ব-বাঁশির ধ্বনির মাঝে যেতে কি সাধ আছে ?
হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া কহে আমার গান—
সেইখানে মোর স্থান।' (যথাস্থান-ক্ষণিকা)[৯]

সুখ দুঃখের কথা আছে 'পুনশ্চ'-র 'বাঁশি' কবিতাটিতেও—যেখানে পঁচিশ টাকা বেতনের সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি হরিপদ আর আকবর বাদশাহ একই সঙ্গে যেতে পারে গানের বৈকুণ্ঠে। হরিপদ ভুলে যায় তার আধমরা জগাতের দুরবস্থার কথা, সংগীতের মায়ালোকে ফিরে পায় ব্যর্থ-বাসনার অপূর্ব সান্ত্বনা।

.......'এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলি লগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া ;
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা করে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর।'[১০]

(৫)

গানের কোন ভূমিকাটি কবির কাম্য। এবারে পড়া যাক 'লিপিকা' গ্রন্থের 'একটি চাউনি' নামের গল্প-কথিকাটি। বুঝতে চেষ্টা করি রবীন্দ্রনাথ গানকে কী ভূমিকায় খোঁজেন।

"একটি চাউনি"

গাড়িতে ওঠবার সময় একটুখানি মুখ ফিরিয়ে সে আমাকে তার শেষ চাউনিটি দিয়ে গেছে।

এই মস্ত সংসারে এটুকুকে আমি রাখি কোন্‌খানে।

দণ্ড পল মুহূর্ত। অহরহ পা ফেলবে না, এমন একটু জায়গা আমি পাই কোথায়.....

গানের সুর বললে, 'আচ্ছা আমাকে দাও। আমি রাজার প্রতাপকে স্পর্শ করিনে, ধনীর ঐশ্বর্যকেও না, কিন্তু ঐ ছোটো জিনিসগুলিই আমার চিরদিনের ধন ; ঐগুলি দিয়েই আমি অসীমের গলার হার গাঁথি।"

এখানেই গানের শক্তি। প্রকৃতির মেঘের সোনার রঙ, নাগকেশরের সোনালি রেণু—সবই যায় হারিয়ে। তারা জানে না অমরাবতীর ঠিকানা। গানের সুরই পারে একটি চাউনিকে অসীমের গলায় মালা করে দুলিয়ে দিতে। 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' আজ এনে দিলেও 'হয়তো দিবে না কাল ; রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।' কিন্তু 'এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে তব বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী বহি তব সম্মান।' এখানেই গানের জয়।

... 'সে কোন বিহান বেলায় এই পথে কার পায়ের তলে
নাম-না-জানা তৃণ কুসুম শিউরে ছিল শিশির জলে।
অলকে তার একটি গুছি করবীফুল রক্তরুচি,
নয়ন করে কী ফুল চয়ন নীল গগনে দূরে দূরে।' (প্রেম-১২)

এমন একটি ছবি ছিল কবির রাত জাগা স্মৃতিতে। 'নিদ্রাহারা রাতের'[৫] সেই স্মৃতিকে গানে গেঁথে রাখবার মতো সুর কোথায় পাওয়া যাবে, কোন্ রজনীগন্ধার কলিতে আছে তার স্বরবিন্যাস ? সুরের কাঙাল কবির এই ব্যথা গাঁথা পড়ল বেহাগ-খাম্বাজের সুরের ফ্রেমে।

'আজি কোন্ সুরে বাঁধিব দিন-অবসান-বেলারে' গানটি লক্ষ করুন।[৬] 'সঙ্গীজনবিহীন শূন্য ভবনে' দিনান্তবেলার গানকে কোন্ সুরে বাঁধা যায় ?

'সে কি মূক বিরহস্মৃতিগুঞ্জরণে তন্দ্রাহারা ঝিল্লি রবে।
সে কি বিচ্ছেদরজনীর যাত্রী বিহঙ্গের পক্ষধ্বনিতে।
সে কি অবগুণ্ঠিত প্রেমের কুণ্ঠিত বেদনায় সম্বৃত দীর্ঘশ্বাসে।
সে কি উদ্ধত অভিমানে উদ্যত উপেক্ষায় গর্বিত মঞ্জীরঝঙ্কারে।।'

গানটি বাঁধা হয়েছে ইমন কল্যাণে। তবে শুধু বেহাগ-খাম্বাজ বা ইমন কল্যাণ নয়, এসব গান অনুধাবনে প্রয়োজন গীতবিতানের পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন।

রবীন্দ্রনাথের গানের সুর আর পাঁচটা গানের সুরের মতো নয়। এ সুরের স্বতন্ত্র মূল্য থাকলেও কথার সঙ্গে মিলেই সে এমন পূর্ণতা পেয়েছে। সে সুর কেবল রাগরাগিণীর সারেগামাতেই উৎপন্ন হতে পারে না। কথার ভিতেই এর সৌন্দর্যপুরী। তাই কথার পাঠেরও বিশেষ প্রয়োজন।

(৬)

'যারা আমার সাঁঝসকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
.... সেই যে আমার আপন মানুষগুলি ....
যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্নবেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো...।

(পূরবী)[৮]

এই যে আমাদের মতো মানুষের সংস্পর্শে কবির মনে গান জেগে উঠেছে— তাদের জন্য কবি কী রেখে যাচ্ছেন? 'শেষ সপ্তক'-এর ৪৩ সংখ্যক কবিতায় কবি বলছেন—

...'রেখে গেলেম তোমাদের জন্যে
আমার আশীর্বাদ।
যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল বলে
করব না অহংকার।'[২]

নিরাসক্ত কালের হাতে নয়, আমাদের মতো সুখ দুঃখে গড়া মানুষের জন্যেই তিনি রেখে গেছেন তাঁর সৃষ্টি। শুনুন একটি গানে তাঁর অঙ্গীকার—

'আসা-যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন—
যাবার বেলায় দেব কারে বুকের কাছে বাজল যে বীণ॥
সুরগুলি তার নানা ভাগে রেখে যাব পুষ্পরাগে,
মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণরেখায় করব বিলীন॥
কিছু বা সে মিলনমেলায় যুগল গলায় রইবে গাঁথা
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে দুই চাহনির চোখের পাতা।
কিছু বা কোন চৈত্রমাসে বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে
মনের কথার টুকরো আমার কুড়িয়ে পাবে কোন্ উদাসীন।'[৫]

তারপরে, কবিতায় যেমন বলেছেন, তাঁর শেষ যাত্রার কথা,—

'... নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়। (শেষ সপ্তক, ৪৩)[৩]

গানেও তেমনি বলেছেন—

'... এ পারে কৃষি হল সারা,
যাব ও পারের ঘাটে। ...
ভাঁটার নদী ধায় সাগরপানে কলতানে,
ভাবনা মোর ভেসে যায় তারি টানে। ...
শুনি শুধু মাঝির গান আর দাঁড়ের ধ্বনি তাহার স্বরে।'[৫] (প্রেম-২৩৫)

(৭)

যাঁরা গান করেন তাঁদের উদ্দেশে একটি নিবেদন। পূর্বে, অর্থাৎ ১৯৪০-৫০-এর দশকে যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন তাঁরা জানতেন— স্বরলিপি কাঠামো মাত্র। ফলে সুরের একটু আধটু বিচ্যুতি ক্ষমা করা হতো। কিন্তু তারপরে ক্রমশ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশ্বভারতীর নিয়ন্ত্রণে গায়ক স্বরবিতানমুখী হতে শিখলেন-- যা প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রসংগীতের শারীরিক সুস্থতার ও সুরক্ষার জন্যে। আশা করি সে শিক্ষা পূর্ণ হয়েছে। এবার গায়কেরা গীতবিতান-মুখী হলে ভালো হয়। তাহলেই অমরাবতীর ('একটি চাউনি') ঠিকানায় পৌঁছতে পারব, আমরা শ্রোতারা— এবং গায়কেরাও।

সূত্র নির্দেশ—

১। Complete Works of Swami Vivekananda, vol.-3-Advaita Ashram
২। তৈত্তিরীয় উপনিষদ— উপনিষদ অখণ্ড সংস্করণ— হরফ প্রকাশনী
৩। স্বামী বিবেকানন্দের সাধনায় মন্ত্রভাবনা ও সংগীত-স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
৪। শান্তিনিকেতন— রবীন্দ্ররচনাবলী— ১২-প.ব.সরকার—১৯৬১
৫। গীতবিতান— বিশ্বভারতী
৬। রবীন্দ্রসংগীত গবেষণা গ্রন্থমালা-৩— প্রফুল্লকুমার দাস— জিজ্ঞাসা
৭। ছান্দোগ্য— ৫৮৪। উপনিষদ— হরফ প্রকাশনী
৮। পূরবী— রবীন্দ্ররচনাবলী-২ প.ব.সরকার-১৯৬১
৯। ক্ষণিকা— রবীন্দ্ররচনাবলী-১ প.ব.সরকার ১৯৬১
১০। পুনশ্চ— রবীন্দ্ররচনাবলী-৩ প.ব.সরকার ১৯৬১
১১। লিপিকা— রবীন্দ্ররচনাবলী-৭ প.ব.সরকার ১৯৬১
১২। শেষ সপ্তক— রবীন্দ্ররচনাবলী-৩ প.ব.সরকার ১৯৬১

সমাপক

'আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।' (জীবন স্মৃতি)। 'গীতবিতান'-এর গানগুলির নেপথ্যেও ওই একই ভাবনা। ওই একই পালা ওই গানগুলির মাধ্যমেও অভিনীত হয়েছে। এক সামগ্রিক অদ্বয় সম্পর্ক।

শুধু পূজা-পর্যায়ের ঈশ্বর ভাবনামূলক গানগুলিই নয়— কবির মানব-সম্পর্কীয় প্রেমের গান বা প্রকৃতির গান, সমাজ-বা স্বদেশ পর্যায়ের গান বা আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের গান— সর্বত্রই পার্থিবতার মধ্যে স্বর্গীয়তা এসেছে। 'ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহত, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি— সীমার মধ্যেও সীমা নেই।' (জীবনস্মৃতি)। অসীমের স্পর্শ সব সীমাতেই আছে— সর্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম।

আমার গীতবিতান-সাধনা ওই পালাটিকে বুঝবার সাধনা— যা এ জীবনে শেষ হবার নয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর পালা শেষ করতে চান নি। তাই ভারতীয় চিন্তার অনুসরণে 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়'— তিনি 'পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে/মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে'— এই সংশয় ত্যাগ করে— 'খসে যাবার ভেসে যাবার' আনন্দে জীবন মরণের অন্তহীন তরঙ্গলীলাকে বরণ করে নিয়েছেন।

'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে?'.......
'পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে
জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে।' (পূজা-৬০৬) তাই জীবন কখনো শেষে পৌছয় না।

ইহকে, এই বর্তমান জীবনকে জানা তো শেষ হয় নি। ঈশ্বর কী উদ্দেশ্যে কবিকে সৃষ্টি করেছেন— তা তো এখনো অজানা।

'.......তোমার কাছে আমায় এ মিনতি—
যাবার আগে জানি যেন আমার ডেকেছিল কেন
আকাশ পানে নয়ন তুলে শ্যামল বসুমতী।....' (পূজা ৫৯৪)।

এই প্রশ্নেরই উত্তর সন্ধান আছে—'গীতবিতান'-এর গানগুলিতে।—

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। খণ্ড তো পূর্ণেরই প্রকাশ। এই ইহ তো চির-কালেরই প্রকাশিত অংশ। তাই লীলাময়ের উপরে কবির আস্থা আছে— জন্মের পরে জন্ম, জন্মের পরে জন্ম— তাঁরই অনন্ত লীলায় থাকবেন কবিও।

'.......নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধুপারে,—
তবু তুমি সেই তো আমার তুমি—
আবার তোমায় চিনব নূতন করে।।' (পূজা ও প্রাথনা-৭৪)।

আমাদের গীতবিতান-সাধনাও এই 'নূতন সিন্ধুপারের আশ্বাসকেই বরণ করে নেয়।

পরিশিষ্ট

(১)

আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশবিদেশে (আমি) বেড়াই ঘুরে॥
লাগি সেই হৃদয়শশী সদা মন হয় উদাসী—
পেলে মন হত খুশি দিবা নিশি দেখতেম নয়ন ভরে—
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে নিভাই কেমন করে (মরি হায়রে)
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে দেখ না আমার ওরে হৃদয় চিরে॥
দিব তার তুলনা কী,— যার প্রেমে জগৎ সুখী
হেরিলে জুড়ায় আঁখি সামান্যে কি দেখতে পারে তারে?
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে (মরি হায়রে)
ও সে না জানি কী কুহক জানে অলক্ষ্যে মন চুরি করে,
কটাক্ষে মন চুরি করে॥
কুলমান সব গেল রে, তবু না পেলাম তারে—
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে তাইতো মোরে দেয়না দেখা যেরে।
ও তার বসত কোথা না জেনে তায় গগন ভেবে মরে (মরি হায় রে)
ও সেই মান্‌ষের উদ্দেশ জানিস যদি কৃপা করে বলে দেরে
আমার সুহৃদ হয়ে বলে দেরে
ব্যথার ব্যথিক হয়ে বলে দেরে॥

— গগন হরকরা।

(২)

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার পাড়ার ভিতর আরশীনগর
সেথা এক পড়োশী বসত করে॥
গেরাম বেড়ে অগাধ পানি
তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে রে,—
মনে বাঞ্ছা করি দেখবো তারে কেমনে সেথায় যাই রে।
আমি কী কবো সেই পড়শীর কথা
তার হস্ত, পদ, স্কন্ধ, মাথা, — নাইরে;
সে ক্ষণেক ভাসে শূন্য পরে
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে রে॥

সেই পড়্শী যদি আমায় ছুঁতো
ভবের যমযাতনা সকল যেতো দূরে রে,
সে আর লালন একখানে রয়
আবার লক্ষ যোজন দূরে রে॥

—লালন ফকির

(৩)

কথা কয়রে দেখা যায় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে খুঁজলে জনমভর মেলে না। (আহা মরি)
খুঁজি তার আশ্‌মান জমি
আমারে চিনিনে আমি,
এও বিষম ভুলে ভ্রমি—
আমি কোন্‌জন সে কোন্ জনা। (আহা মরি)॥
রাম রহিম বলছে যে জন
ক্ষিতি জল কি বায়ুহুতাশন—
শুধালে তার অন্বেষণ
মুখ্যু দেখে কেউ বলে না। (আহা মরি)॥
হাতের কাছে হয় না খবর
কী দেখতে যাই দিল্লীনগর—
সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর
সদাই মনের ভ্রম যায় না। (আহা মরি)॥
(রূপান্তরে 'কথা কয় কাছে— দেখা যায় না'।)

— লালন ফকির

(৪)

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়!
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়॥
আটকুঠুরি নয় দরোজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা,
তার উপরে সদর কোঠা আয়না মহল তায়॥
কপালের ফের, নইলে কি আর
পাখিটির এমন ব্যবহার!
খাঁচা ভেঙে পাখি আমার কোন্ বনে পালায়॥
মন তুই রইলি খাঁচার আশে।
খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশের,
কোন্‌দিন খাঁচা পড়বে খসে, লালন কেঁদে কয়॥

— লালন ফকির।